ডায়লেক্‌টিক

ডায়লেক্‌টিক

"সম্বুদ্ধ"

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—পৌষ ১৩৪৭
দ্বিতীয় সংস্করণ—মাঘ ১৩৫৩

মূল্য আড়াই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—৭. ২. ৪৭

সজনীদাকে দিলাম

২২ পৌষ ১৩৪৭

ডায়লেকটিক

সারাটা দিন দারুণ গরম পড়িয়াছে, বিকালের দিকে নীলমণি চক্রবর্তী বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন।

গ্রামের প্রান্তে বড় সাঁকো পর্যন্ত গিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। এই সময়টাতে এখানকার হাওয়াটা বেশ লাগে। ঘাসের উপরেই একটু ভাল জায়গা দেখিয়া বসিতে যাইবেন, এমন সময় তাঁহার চোখে পড়িল, সাঁকো পার হইয়া কে একজন এই দিকে আসিতেছে। আগন্তুক অপরিচিত যুবক, মাথা ও মুখ পরিষ্কার করিয়া কামানো, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের পরিচ্ছদ।

পাড়াগাঁ, অচেনা মুখ কালেভদ্রে একটা চোখে পড়ে। নীলমণির আর বসা হইল না। আগন্তুক এপারে আসিয়া নামিতেই তিনি আগাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিলেন, মশায়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

উত্তরে সে ব্যক্তি এক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল, চক্রবর্তী-খুড়ো না?

নীলমণি আমতা আমতা করিয়া কহিলেন, আমি তো ঠিক চিনতে পারলাম না বাবা।

আগন্তুক নত হইয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া কহিল, আমি বিশু—বিশ্বেশ্বর।

বিশু! কই, দেখি দেখি!

নীলমণি তাহার দিকে একটু ঝুঁকিয়া দেখিয়া তাহাকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন,—আবার যে তোকে দেখতে পাব, সে আশাও যে করি নি রে! আঃ, বাপ তোর যে কি ক'রেই বেঁচে আছে! কি করছিলি এতকাল? কোথায় গিয়েছিলি?

বিশ্বেশ্বর কহিল, বাবা ভাল আছেন?

ভাল কি আর থাকে রে বাবা, এই শেল বুকে নিয়ে! তবু যা হোক শেষ কটা দিন তোর মুখখানা দেখবার পুণ্যিটুকু ছিল, সেও ভাগ্যি। আর এখন চোখেও ভাল দেখতে পান না। মা তোর তো কেঁদে কেঁদেই—

বিশ্বেশ্বর কহিল, চলুন।

নীলমণি কহিলেন, চল্‌। তারপর উত্তরীয়ের প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, তুই তো অনেক বদলে গেছিস। কত বড়টি হয়েছিস, দেখে আর চেনাই যায় না! আর বাবা, চোখেরও সে নজর নেই—

আপনিও তো খুব বুড়ো হয়ে গেছেন।

বুড়ো হবার আর দোষ কি বল্‌, বয়স তো কম হ'ল না।

বাস্তবিক, এইটুকু পথ চলিয়াই বৃদ্ধ হাঁপাইতেছিলেন। বিশ্বেশ্বর কহিল, অত তাড়াতাড়ি করবার দরকার কি? আস্তে চলুন না। আপনার কষ্ট হবে।

কিচ্ছু হবে না রে, কিচ্ছু হবে না। শিগগির শিগগির বাড়ি গিয়ে হাতে মুখে একটু জল দিবি তো। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে আজ? মুখ তো শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। কদ্দুর থেকে আসছিস এখন?

অনেক দূর। খাওয়া হয়েছে দুপুরবেলা।

বৃদ্ধ সোৎসাহে পদক্ষেপ করিতে করিতে কহিলেন, তারপর, কি করছিলি এতকাল?

বিশ্বেশ্বর কহিল, এই—একটু লেখাপড়া যাতে হয়, তারই চেষ্টা করছিলাম।

বেশ বেশ। কোথায় ছিলি?

নদেয়, শিরোমণি মশায়ের ওখানে। তারপর—

বেশ বেশ, এই তো চাই। চল্ বাবা, একটু পা চালিয়ে চল্। বাড়ি তো এখনও আধ ক্রোশ।

উনিশ বছরের ছেলে বিশ্বেশ্বর চিঠির মাথায় পাঠ লিখিয়াছিল, শ্রীহরির্শরণম্। বৈয়াকরণ পিতা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, এ কি লিখেছিস? এ কি ক'রে হয়?

বিশ্বেশ্বর গুম খাইয়া কহিল, নামিপরো রম্।

পিতা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, এমন না হ'লে আর বাপ-পিতামর নাম ডোবাবে কেমন ক'রে! মাথায় এদিকে ঝুঁটির বাহার তো হচ্ছে খুব, ওর সিকিও যদি ভেতরে থাকত! যাও, আমার সামনে থেকে চ'লে যাও, গণ্ডমূর্খ কোথাকার।

বিশ্বেশ্বর নীরবে বাহির হইয়া আসিল, এবং ঠিক তখনই ওদিক দিয়া তাহার ত্রয়োদশী স্ত্রী সরস্বতী আসিয়া শ্বশুরকে ডাকিল, বাবা, ঠাঁই হয়েছে।

বৃদ্ধ তখনও ক্রোধে ফুলিতেছিলেন, কাগজখানা তাহার সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়া কহিলেন, এই দেখ মা।

সরস্বতী কহিল, বা, এ কি ক'রে হবে

বৃদ্ধ সস্নেহে হাসিয়া কহিলেন, কেন হবে না তাই বল ?

সরস্বতী কহিল, ন বিসর্জনীয়সন্ধিঃ কখপফশষসেষু।

বৃদ্ধের বুক আনন্দে ভরিয়া গেল। বড় সাধ করিয়া প্রতিবেশী-কন্যা এই তীক্ষ্ণধী মেয়েটিকে তিনি ঘরে আনিয়াছিলেন, এবং তাহার শিক্ষার ভার নিজের হাতে লইয়াছিলেন। পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, বলি শুনলি ? ঢুকল কিছু কানে ? ওরে ও বামুনের ঘরের ষাঁড়, লজ্জা হয় না তোর ?

ষাঁড় বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিল, উত্তর করিল না।

সরস্বতী সরিয়া পড়িল। বৃদ্ধ কহিলেন, অতটুকু মেয়ে যা জানে— বলি নিজের বউ ভুল ধ'রে দেয় তোর, এতেও যদি লজ্জা না হয়, হবে আর কিসে ?

বিশ্বেশ্বর ধীরে ধীরে বারান্দা হইতে নামিয়া আসিল। পিতার শেষ কথাটি মনে মনে একবার আবৃত্তি করিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

খাওয়ার সময় বিশ্বেশ্বরের দেখা মিলিল না। সরস্বতী গিয়া শাশুড়ীকে কহিল, মা, ক্ষিদে পেয়েছে।

সে পাশের বাড়িরই মেয়ে, তাহাতে নয় বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছে, বেশি লজ্জার ধার সে ধারিত না ; স্নেহবশ শ্বশুর-শাশুড়ীও তাহাতে আনন্দিতই ছিলেন।

শাশুড়ী কহিলেন, ক্ষিদে পেয়েছে, তা আমায় বলা কেন ? তারপরই কথার অর্থ বুঝিলেন, কহিলেন, আচ্ছা, তুমি খাওগে। আমি ব'লে দিলাম, কোন দোষ হবে না।

সরস্বতী কিন্তু নড়িল না। অতএব বিশ্বেশ্বরকে খুঁজিয়া আনিতে লোক পাঠাইতে হইল।

রাত্রে শুইয়া বিশ্বেশ্বর কহিল, তোমার বিদ্যের বোঝা খুব বেড়েছে, না

সরস্বতী উদাস সুরে কহিল, তা কারু কারু চাইতে যে একটু বেশি আছে, সে তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে।

ইহার পর আর দুই-চারিটা কথা, তারপরই কোপনস্বভাব বিশ্বেশ্বর উঠিয়া বসিয়া চুলের মুঠি ধরিয়া হ্যাঁচড়াইয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল, তারপর পাখার বাঁটের ঘা কতক তাহার পিঠে বসাইয়া দিয়া, ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এবং গেল তো গেলই, খুঁজিয়া আর তাহার কোনও উদ্দেশ মিলিল না। সে আজ ছয় বছরের কথা।

পথ চলিতে চলিতে নীলমণি তাহার কাছে কিছু কিছু সংবাদ জানিয়া লইলেন। বিশ্বেশ্বর নবদ্বীপের টোলে পড়িয়াছে, ন্যায়রত্ন ব্যাকরণাম্বুধি উপাধি লইয়া তবে বাড়ি আসিতেছে। আরও একটা কাজ সে করিয়াছিল, শখের বশে কিছু কিছু বৌদ্ধদর্শনও এক নাস্তিক পণ্ডিতের কাছে পড়িয়াছিল। কিন্তু নীলমণি অত প্রশ্ন করিলেন না, সেও আর তাহার উল্লেখ করিল না।

অন্ধকার হইয়া আসিল। এবং সেই আবছায়া অন্ধকারের মধ্যেই যথাসাধ্য দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া বিশ্বেশ্বর তাহার বহুদিনের সঞ্চিত তৃষ্ণা লইয়া এই চিরপরিচিত চিরপ্রিয় গ্রামটিকে দেখিয়া লইতে লাগিল।

বারোয়ারিতলার পুরানো আটচালাটাকে ভাঙিয়া পূবে সরাইয়া ঠানো হইয়াছে। বাঁধানো ঘাটের উপরে বটগাছটা বড় বড় ঝুরি মলিয়া একেবারে দীঘির জলের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। শাঁখারি-াড়ি যেখানে ছিল, সেখানে কাঁটাবনের জঙ্গল ;—ওলাউঠায় তিন দিনের ধ্যে তাহারা সকলে মরিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

নীলমণি অনর্গল বকিয়া তাহাকে গ্রামের যাবতীয় সঞ্চিত সংবাদ নাইতে লাগিলেন, অন্যমনা বিশ্বেশ্বরের কানে কিছু বা প্রবেশ করিল,

কিছু বা করিল না। নীলমণির বৃদ্ধা মাতা বছর দুই হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যম পুত্রটির বিবাহ হইয়াছে। জনার্দন শিরোমণির কন্যা বিধবা হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরদের বাড়ির দরজায় তাহার নিজের হাতে লাগানো আম-চারাটিতে গত বৎসর আম ধরিয়াছিল, কিন্তু অতি সুন্দর ও সুগন্ধ আম হওয়া সত্ত্বেও তাহার কথা স্মরণ করিয়া সে আম কেহ মুখে তুলিতে পারে নাই।

বিশ্বেশ্বরের সকলই যেন কেমন নূতন, কেমন অভিনব ঠেকিতেছিল। মনে মনে সে বলিতেছিল, এমনই হয়। জগৎ গতিশীল, বেগবতী নদীর মত অনুক্ষণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই সে চলে, প্রতি মুহূর্তের অবয়ব পরমুহূর্তে বদলাইয়া যায়, আজিকার বস্তু কাল পুরাপুরি ভিন্ন বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। চক্রবর্তী-খুড়া দেশের মধ্যে অটুট স্বাস্থ্য ও অনিন্দ্য দেহ-সৌষ্ঠবের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, এই ছয় বৎসরে তিনি অপ্রত্যাশিতরূপে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। গ্রামের যাহাদের সে চিনিত, তাহাদের মধ্যে বহু লোক নাই; যাহারা আছে, তাহাদের হয়তো সে চিনিবেই না। যাহাদের ছোট দেখিয়া গিয়াছে, তাহারা বড় হইয়াছে; যাহারা এখন ছোট, তাহারা তখন জন্মায় নাই।

জনবিরল পথে বড় একটা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না, নীলমণির অশ্রান্ত উচ্ছ্বাসের মধ্যে দুইজনে পথ চলিতে লাগিলেন।

হাতের প্রদীপটি মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া বধূ তুলসী-প্রণাম করিতেছিল। নীলমণি উঠানে পা দিয়াই উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, দাদা বাড়ি আছেন বউমা?

সরস্বতী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাঁহার সঙ্গে অন্য লোক

দেখিয়া ত্রস্তে অবগুণ্ঠন টানিয়া মাথা হেলাইয়া জানাইল, আছেন। তারপর প্রদীপ তুলিয়া লইয়া শ্বশুরকে সংবাদ দিতে গেল।

প্রণামরতা বধূর দীপালোকিত মুখের খানিকটা সেই এক নিমেষেই বিশ্বেশ্বরের চোখে পড়িয়াছিল, সে একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। পিতার সে এক পুত্র, অন্য কেহ বউমা এ বাড়িতে থাকিতে পারে না। সেই সরস্বতী এমন হইয়াছে!

ঘরের মধ্য হইতে তাহার বৃদ্ধ পিতার স্বর কানে আসিল, কে? নীলু?

নীলমণি তাঁহার বাহিরে আসার অপেক্ষা করিলেন না, বিশ্বেশ্বরকে টানিয়া কহিলেন, এস। দেখলে তো, এমন লক্ষ্মী-প্রতিমাকে ছেড়ে কোন্ প্রাণেই যে বিদেশে গিয়ে ছিলে! আহা, মা আমার আজ ছটি বচ্ছর হেসে কথা কয় নি।

তারপর বাড়িতে একটা মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। নীলমণি হাঁকডাক করিয়া পাড়ার লোক জড়ো করিলেন, পরিচিত অপরিচিত সকলে তাহাকে নূতন করিয়া দেখিতে আসিলেন, এবং বৃদ্ধা মাতার গণ্ডে অনর্গলধার অশ্রুর রেখা ক্ষণে ক্ষণে অকারণ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

গৃহের কাজকর্ম শেষ করিয়া বধূ যখন শুইতে আসিল, তখন রাত্রি অনেক। বিশ্বেশ্বর তন্দ্রামগ্ন হইয়াছিল, খাটে নাড়া লাগিতেই জাগিয়া উঠিল।

প্রথমটা মামুলি কুশলপ্রশ্ন দিয়া এতদিন পরে আবার নূতন করিয়া পরিচয় শুরু হইল, এবং তারপর অলক্ষিতেই রাজ্যের বিষয় লইয়া দুইজনে কথা আরম্ভ হইয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরের বাধবাধ ঠেকিতেছিল। ছয় বছর সে বাহিরে কাটাইয়া আসিয়াছে। তা ছাড়া ত্রয়োদশবর্ষীয়া যে চঞ্চলা বালিকাকে সে চিনিত, এই মৃদুভাষিণী পূর্ণযৌবনার মধ্যে তাহার কোনও চিহ্নই আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ওদিকে সরস্বতী এমনই উচ্ছ্বসিত আনন্দে কথা বলিয়া চলিয়াছে, বিশ্বেশ্বর আর কূল পায় না।

ছয় বছর ধরিয়া সরস্বতী নিজের কাছেই নিজে অপরাধী হইয়া ছিল। স্বামীর গৃহত্যাগের সে-ই যে পরোক্ষ হইলেও প্রধান হেতু—হিতাকাঙ্ক্ষিণী প্রতিবেশিনীদের প্রসাদে এ সংবাদ জানিতে তাহার দেরি হয় নাই। এতদিন পরে হঠাৎ আজ তাহার সেই দীর্ঘ মৌনের বাঁধ ভাঙিয়া উচ্ছ্বাসের জোয়ার আসিয়াছে, ইহাকে সংবরণ করা তাহার সাধ্য নয়। তাহার এই নিঃসঙ্কোচ উচ্ছলতায় বিশ্বেশ্বর হাঁপাইয়া উঠিল।

তবুও ক্রমে কথাবার্তার আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়া আসিল। বিশ্বেশ্বর কহিল, তারপর, লেখাপড়া কদ্দূর শিখলে?

সরস্বতী কহিল, একটুও না।

কেন?

পুত্রকে হারানোর দুঃখ পিতা বধূকে লইয়া ভুলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যয়নের প্রস্তাবে সরস্বতী মৃদুস্বরে শুধু বলিয়াছিল, থাক্। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শ্বশুর কোনদিন উত্তর পান নাই, বিশ্বেশ্বরও আজ পাইল না। সরস্বতী কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া কহিল, এবারে তোমার কাছে পড়ব, কেমন? তারপর একটু থামিয়া কহিল, তুমি কিন্তু ভারি বদলে গেছ।

বিশ্বেশ্বর অন্যমনে কহিল, হুঁ।

বা, নিজে বুঝতে পার না? এমনিই তো চেহারা বদলেছে, তার ওপর আবার গোঁফ চুল সব কামিয়ে ফেলেছ, পোশাক বদলেছ, রঙ

কাত্মো হয়ে গেছে, গলা বদলে গেছে। সত্যি, আমি কিন্তু প্রথম দেখে চিনতেই পারি নি। ভাবলাম, কে না কে!—সরস্বতী হাসিল,—তাড়াতাড়ি এসে ঘরে ঢুকলাম। আচ্ছা, অমন সুন্দর চুলগুলো ফেলে দিলে কি ব'লে বল তো? আবার বুড়ো ভট্‌চাজ্জির মত—। চুল কিন্তু তোমায় রাখতেই হবে, তা ব'লে দিচ্ছি।

শেষের দিকে তাহার গলাটা কেমন যেন হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বরের বড় যত্নের বস্তু ছিল তাহার ঝাঁকড়া চুলের রাশ, ইহা সে ভুলে নাই।

বিশ্বেশ্বরের শেষ পর্যন্ত কথা কানেই গেল না। সহসা স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া সে কহিল, সত্যি নাকি? প্রথম দেখে চিনতেই পার নি?

তা নয় তো কি! ছিল কেমন চেহারা, এল যেন চণ্ডীপুঁথি নিয়ে ভট্‌চাজ্জি মশাই!—বলিয়া সরস্বতী মুখ টিপিয়া হাসিল।

বিশ্বেশ্বর কহিল, তারপর? চিনলে কি ক'রে? আড়াল থেকে দেখে?

ম্যাগোঃ! আমি আড়াল থেকে দেখতে যাই, আর সবাই এসে চেপে ধরুক আমাকে, না? আর নিজের কাজকম্ম নিয়েই তো রইলাম সারাক্ষণ, তোমাকে দেখতে বসবার সময় কই আমার?

তবে চিনলে কি ক'রে? আমার চেহারা বদলেছে, রঙ বদলেছে, গলা বদলেছে—কি দেখে আমায় চিনলে?

জানি না, যাও!—বলিয়া সরস্বতী পরম নিশ্চিন্তমনে চোখ বুজিল। তাহার চোখের পাতায় চাপা হাসির মৃদু স্পন্দন বিশ্বেশ্বরের চোখে পড়িল না, তখন তাহার মধ্যে ছয় বছরের নৈয়ায়িক তার্কিক জাগিয়া উঠিয়াছে। উত্তেজিত স্বরে সে কহিল, বলতেই হবে। সবই যদি আমার বদলে গেছে, কি দেখে আমায় চিনলে, কি ব'লে এমন নিঃসঙ্কোচে আমার ঘরে শুতে এলে?

সরস্বতী চোখ চাহিল, কহিল, বা রে, সে আবার কারও ব'লে দিতে হয় নাকি? ও অমনি চেনা যায়।

বিশ্বেশ্বর ক্রমেই আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল, কহিল, না, যায় না। প্রমাণের ওপর নির্ভর ক'রে তবে তো সিদ্ধান্ত হবে। আমার সম্বন্ধে কি প্রমাণ তুমি পেয়েছ?

সরস্বতী বিপন্ন হইয়া কহিল, একা আমি তো নই, সবাই-ই তো তোমাকে চিনতে পারলেন। তাঁরা কি দিয়ে তোমাকে চিনে নিলেন?

তাঁরা চিনে নেন নি। জান তুমি, চক্রবর্তী-খুড়ো প্রথমে আমাকে চিনতেই পারেন নি? আমার নাম শুনে চিনলেন।

তবেই তো হ'ল। শেষ চিনলেন তো!

ওকে চেনা বলে না, বলে—ধ'রে নেওয়া। তা ছাড়া তাঁরা যদিই বা চিনে থাকেন, তোমার কাছে সে তো শুধু শোনা কথা, পরোক্ষ প্রমাণ। নিজে চিনতে না পেরেও কোন্ কথায় তুমি—

কিন্তু সরস্বতী ততক্ষণে আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বিশ্বেশ্বর এবার তাহার বাহু ধরিয়া ঝাঁকানি দিল, কহিল, এর উত্তর দাও। আমিই যে সত্যি তোমার স্বামী, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো তুমি পাও নি।

বা, তুমি নিজেই নিজের পরিচয় দিলে না?

সে তো মিথ্যেও হতে পারে। ধর, যদি অন্য কেউ আমার নাম ক'রে এসে উঠত?

সরস্বতী শিহরিয়া কহিল, ছি, তাও আবার হয় নাকি?

খুব হয়। ছ বছর আগে যে বিশ্বেশ্বর ছিল, আর আমি, এরা কি এক? তুমিই তো বললে, আমার গলা চেহারা পোশাক সবই বদলে

গেছে। তার মানে, দৃষ্ট সাদৃশ্য প্রমাণ যা কিছু ছিল, তার কিছুই আর নেই। সে বিশ্বেশ্বর আর আমি তোমার চোখে পুরোপুরি আলাদা—দুজন। তুমি ছিলে তার স্ত্রী, আমাকে তুমি চিনতে না, আমাকে দেখেও সে ব'লে চেন নি।

এ কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িতেছে! এক মুহূর্তের জন্ম সরস্বতী কাঁপিয়া উঠিল, তারপর নিজেকে সংবরণ করিয়া মাথা তুলিয়া গম্ভীরস্বরে কহিল, আচ্ছা, চাও তো আমার দিকে! হ্যাঁ, আমার চোখের দিকে। চাও ভাল ক'রে।

বিশ্বেশ্বর অবাক হইয়া কহিল, কেন?

সরস্বতী কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, নাঃ, ভয় নেই। তুমি ভূত হও নি, ঠিকই আছ। অন্য লোক হ'লে কি আর আমার চোখে চোখে চাইতে পারতে!—বলিয়া সে পরম নির্ভরে স্বামীর একেবারে গা ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িল।

বিশ্বেশ্বর তড়িৎবেগে সরিয়া গেল, তিক্তকণ্ঠে কহিল, আমি বলছি, সে বিশ্বেশ্বর আর আমি এক নই, তবুও—

সরস্বতী মিষ্ট কণ্ঠে কহিল, আঃ, আমি জানি, সেই লোকটি আর তুমি এক, তবুও—

সেই জানলে কি ক'রে, তাই তো জিজ্ঞেস করছি। আমি যদি বলি, আমি সে বিশ্বেশ্বর নই, তুমিও এ সম্বন্ধে এমন কোনও প্রমাণ পাও নি,

সরস্বতী দুই আয়ত চক্ষু তাহার মুখের উপরে স্থাপন করিয়া কহিল, হ্যাঁ, তবুও। আমি জানি, তুমিই সেই, আমার মনে আমি জেনেছি। তবু যদি তুমি বল তোমরা দুই, আমি মানি না। তারপর একটু হাসিয়া কহিল, নবদ্বীপের টোলে বুঝি এমনি ক'রে ঝগড়া করতে শেখায়?

বিশ্বেশ্বর আরও চটিয়া কহিল, মান না মানে? আমি সে নই, তবু কী নির্ভয়ে তুমি এত সহজে আমাকে তোমার স্বামী ব'লে মেনে নিলে—আমার সঙ্গে শুতে আসতে একটু দ্বিধা তোমার হ'ল না?

সরস্বতী ধ্রুব বুঝিয়াছিল, স্বামী আগাগোড়াই রহস্য করিতেছেন। হাসিয়া কহিল, অত লেখাপড়া কি আমি জানি? বেশ তো, তুই তুইই সই, এখন আমাকে ঘুমুতে দাও।—বলিয়া বিশ্বেশ্বরের বাঁ হাতটা নিজের দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সে আর এক দফা চোখ বুজিল।

এই নিঃসঙ্কোচ লাস্যে বিশ্বশ্বরের মাথায় আগুন ধরিয়া গেল। লাফাইয়া সে খাট হইতে নামিয়া দাঁড়াইল, কহিল, তাই বল। তার মানে, সেই হোক আর যেই হোক, একজন কাউকে পেলেই তোমার হ'ল, এই তো?

রাগে তাহার আর কথা বাহির হইল না। নারীকে বিশ্বাস করিতে নাই—এই মর্মের যাবতীয় ভাল ভাল সাধুবাক্য তাহার গলার কাছে ভিড় করিয়া অনুষ্টুভ ছন্দে ঠেলাঠেলি জুড়িয়া দিল।

কিন্তু ওদিকে সরস্বতী এই অতর্কিত আঘাতে একেবারে কাঠ হইয়া গেল। এ তো রহস্য নয়! হাস্য-পরিহাসের আবরণে এ কী কুৎসিত কথা অকস্মাৎ তাহার উপর আসিয়া পড়িল!

তড়িৎস্পৃষ্টের মত সে উঠিয়া বসিল, কঠিন সাদা তাহার মুখ হইতে অস্ফুটস্বরে শুধু বাহির হইল, কি?

বিশ্বেশ্বর দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিল, দুশ্চারিণী!

সরস্বতী তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, চুপ। তারপর দ্রুতবেগে যাইয়া দরজার খিলে হাত দিতেই, ক্রোধোন্মত্ত বিশ্বেশ্বর পিছন হইতে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া এক হ্যাঁচকা টানে তাহাকে ছিনাইয়া আনিল, ডান হাতে পাখাটা

তুলিয়া লইয়া তাহার গায়ে পিঠে পটাপট কয়েক ঘা বসাইয়া দিয়া কহিল, হ'ল? হ'ল?

ওদিকের বারান্দায় খড়মের শব্দ হইল।

সরস্বতীর মুখে সহসা স্বচ্ছ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, কহিল, হ্যাঁ, প্রমাণ পেলাম।

বিশ্বেশ্বর তাহার এই অদ্ভুত স্থৈর্যে বিস্মিত হইল, চুলের মুঠি ছাড়িয়া দিয়া বলিল, কি?

সরস্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, তোমার ঠেঙাবার ধরনটা বদলায় নি। সেদিনও ঠিক এমনি ক'রেই আমাকে ঠেঙিয়েছিলে, মনে পড়ে?

তারপর বিস্রস্ত অঞ্চলটা টানিয়া লইয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রগল্‌ভপ্রেতিনী-জাতক

একদা জেতবনে সমাগত ভিক্ষুগণ অনাথপিণ্ডদের নিকটে গিয়া বলিলেন, হে সত্তম, এই মনোরম বাদল-সন্ধ্যায় আমাদিগকে একটি ভাল দেখিয়া ভূতের গল্প বলুন। তদনুসারে অনাথপিণ্ডদ তাঁহাদিগকে এই আখ্যানটি বলেন।—

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বীতন্ত্রী নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিল। তাহার সতৃষ্ণানাম্নী তরুণী পত্নী ছিল। একদা প্রবল ভূমিকম্পে ব্রাহ্মণের গৃহ পতিত হইল। ব্রাহ্মণপত্নী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারিয়া তন্মধ্যে চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিতা হইল এবং প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া গ্রামসীমান্তে এক পুষ্করিণীতীরস্থ বিল্ববৃক্ষে বাস করিতে লাগিল।

ওই বিল্ববৃক্ষের অনতিদূরে এক তরুণবয়স্ক গোপালক বাস করিত। একদিন গোপালকবধূ স্নানার্থ পুষ্করিণীতে আগমন করিলে প্রেতিনী তাহার স্কন্ধে ভর করিল। গোপালক পত্নীর ভাববৈলক্ষণ্য দর্শনে অতীব চিন্তিত হইল এবং তাহার চিকিৎসা করিবার জন্য বিচক্ষণ চিকিৎসকদিগকে আহ্বান করিল।

চিকিৎসকগণ বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও রোগের উপশম করিতে না পারিয়া বলিলেন, এই রোগ ঔষধসাধ্য নহে, ইহা কোন প্রকার প্রেতযোনির কার্য। অতএব ইহার প্রশমনার্থে রোজাগণকে আহ্বান কর।

অনন্তর গোপালক অতি গুণী কতিপয় রোজাকে আনয়ন করিল। রোজা দেখিবামাত্র গোপালকবধূ অতীব ভয়ঙ্করী রুদ্রমূর্তি ধারণ করিল

তখন তাহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ও ঘূর্ণ্যমান হইল, দন্তে দন্তে ঘর্ষণফলে কড়মড়ধ্বনি উত্থিত হইল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, এবং মুখ হইতে নিষ্ঠীবনবৃষ্টির সহিত নানাবিধ অশ্রাব্য অশ্লীল বাক্য ও 'তোরা কেন এই স্থানে মরিতে আসিয়াছিস, অবিলম্বে এই স্থান পরিত্যাগ না করিলে তোদের গ্রীবা ভগ্ন করিব' ইত্যাদি আস্ফালন নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রোজাগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, নিশ্চয় কোন ম্লেচ্ছভূত ইহার স্কন্ধে আরূঢ় হইয়াছে, ইহাকে বিতাড়িত করা আমাদের সাধ্য নহে। বিশেষতঃ এই ভূত যেরূপ অশিষ্ট আচরণ ও ভীতিপ্রদর্শন করিতেছে, তাহাতে ইহাকে ঘাঁটানো সমীচীন নহে। অতএব এক্ষণে এ স্থান হইতে সরিয়া পড়াই শ্রেয়ঃ।

তাহাদের কথা শুনিয়া এক বৃদ্ধ রোজা ক্রুদ্ধ হইয়া কবিতা করিয়া কহিল,

এ হেন অদ্ভুত কথা কি বলি আনিলে তোমরা মনে !
রোজা যদি ভূতেরে ডরায় তবে চলিবে কেমনে ?
অতএব সবে এসে দেখ একটু দূরে দাঁড়াইয়া,
গুরুর কৃপায় আশু ভূত আমি দিব তাড়াইয়া।

তারপর সেই রোজা মন্ত্রপূত সর্ষপমুষ্টি লইয়া গোপালকপত্নীর নিকটবর্তী হইবামাত্র ওই রমণী 'তোর নিতান্তই মরণদশা উপস্থিত হইয়াছে দেখিতেছি, আচ্ছা তবে দেখ্' বলিয়া ব্যাঘ্রীর ন্যায় বলবিক্রম প্রকাশ করতঃ এক লম্ফে তাহার উপর পতিত হইল এবং তাহার উভয় স্কন্ধে দৃঢ়ভাবে নখর প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার নাসিকাগ্রে প্রচণ্ড দংশন করিয়া ধরিল। রোজা অনেক কষ্টে নিজেকে মুক্ত করিয়া, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পলায়ন করিল, তাহার পশ্চাতে অন্যান্য রোজাগণও কুক্কুরতাড়িত শশকপালবৎ বেগে যে যেদিকে পারিল দৌড় প্রদান করিল। আর

কেহ সাহস করিয়া ভূতবিদ্রাবণমানসে তথায় পদার্পণ করিতে চাহিল না। গোপালকও আন্তরিক উদ্বেগজনিত মনকষ্টে কাল কাটাইতে লাগিল। ক্রমে এই কাহিনী বহুদূর পর্যন্ত রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

তৎকালে ভগবান্ বোধিসত্ত্ব জিতধী নাম গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূয়িষ্ঠ অধ্যয়ন ও জ্ঞানচর্চার ফলে তাঁহার সর্ববিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি জন্মিয়াছিল। জ্ঞানী বলিয়া তাঁহার যশ দেশবিদেশে খ্যাত ছিল। তিনি কার্যব্যপদেশে ওই প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছেন জানিয়া গোপালক তাঁহার নিকটে গিয়া পড়িল এবং কাতর নির্বন্ধ-সহকারে তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অনুনয় করিল। তদনুসারে শাস্তা সঙ্গী শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে গোপালকের গৃহে চলিলেন।

গোপালকের গৃহপ্রাঙ্গণে পদার্পণ করিয়াই দেখিলেন, এক স্ফুরিতাধরা তরুণী বাতায়ন হইতে তাঁহাকে নির্নিমেষনেত্রে দেখিতেছে। শাস্তা পূর্বেই শুনিয়াছিলেন, গোপালকের গৃহে রোগিণী ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোক নাই, অতএব ইহাকে গোপালকপত্নী বলিয়া চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি অন্যের অলক্ষ্যে মৃদু হাস্য করিয়া ঈষৎ মস্তকসঞ্চালন করিলেন, তরুণী বাতায়ন হইতে অন্তর্হিতা হইল।

শাস্তা শিষ্যগণকে বলিলেন, তোমরা এ স্থান ত্যাগ কর। গ্রামের বহির্দেশে যে পান্থনিবাস আছে, তথায় যাইয়া ভোজনাদি করিয়া অপেক্ষা কর, আমি যথাসময়ে তোমাদিগের সহিত মিলিত হইব।

তাহারা প্রস্থান করিলে তিনি গোপালককে বলিলেন, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।

গোপালক বলিল, আদেশ করুন।

শাস্তা কহিলেন, এই রোগের ইতিহাস আমি শুনিয়াছি। আমার

মনে হইতেছে, তোমার পত্নীর সাধারণ আচার-ব্যবহার পূর্বের মতই আছে। এই রোগের সহিত যদি কোন ভাববৈলক্ষণ্য তুমি লক্ষ্য করিয়া থাক, তাহা আমাকে বল।

গোপালক কহিল, আপনি সর্বজ্ঞ, ঠিকই বলিয়াছেন, সাধারণ কার্যকলাপে বিশেষ কোনই পরিবর্তন হয় নাই। এক, পূর্বাপেক্ষা সে কিছু অধিক পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়া ও আচারপরায়ণা হইয়াছে। গৃহকর্ম প্রভৃতি যথারীতি সুচারুরূপেই সম্পন্ন করে, শুধু রোজা গৃহে পদার্পণ করিলেই উত্তেজিতা হইয়া উঠে; যতক্ষণ রোজা উপস্থিত থাকে, ততক্ষণ কিছুতেই তাহাকে সংযত রাখা যায় না। আর—

আর কি?

গোপালক অধোবদনে কহিল, দেব, অপরাধ লইবেন না। আমার পত্নী অতীব সুশীলা ও নবোঢ়াসুলভ ব্রীড়াময়ী ছিল; এই রোগোৎপত্তির পর হইতেই সে উত্তরোত্তর প্রগল্‌ভা ও কামুকা হইয়া উঠিতেছে। সর্বদা সাজিয়া-গুজিয়া থাকিতে ভালবাসে, নিরন্তর আমার সাহচর্য যাচ্ঞা করে, গুরুজনসমক্ষেও আমার সহিত একাসনে বসিয়া পড়িতে কুণ্ঠিতা হয় না।

শাস্তা কহিলেন, বুঝিলাম। আমি ব্যাধি আরোগ্য করিব, কিন্তু তোমাকে আমার কথামত চলিতে হইবে।

গোপালক কহিল, আপনি যাহা আদেশ করিবেন—

শাস্তা কহিলেন, আমি চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি, ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। আমি এইখানে দাঁড়াইতেছি। তুমি গৃহে যাইয়া সকলকে বল, আমি একজন পথশ্রান্ত বণিক, তোমার গৃহে অতিথি হইয়াছি। আমি তোমার আতিথ্য গ্রহণ করিব। গৃহের একটি কক্ষ তুমি আমাকে ছাড়িয়া দিবে। মধ্যাহ্নভোজনান্তে তোমার পত্নীকে

আদেশ করিবে, সে যেন আমাকে তাম্বূল দিয়া যায়। তুমি পার্শ্ববর্তী কক্ষে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিবে।

এইরূপ স্থিরীকৃত হইলে শাস্তা অতিথিরূপে গোপালকের গৃহে সমাসীন হইলেন।

ভোজনান্তে শাস্তা বিশ্রামার্থে শয়নপরিগ্রহ করিলে, গোপালকপত্নী তাঁহার জন্য তাম্বূল লইয়া আসিল। শাস্তা তাম্বূল লইয়া দেখিলেন, তাহা অতি যত্নে সুগন্ধি মসলা সহযোগে প্রস্তুত হইয়াছে। তাম্বূলটি কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্ষণ করিবেন বলিয়া বামহস্তে রাখিয়া তিনি বলিলেন, ভদ্রে, কিঞ্চিৎ শীতল পানীয় জল পাইলে আমার বড় সুবিধা হইত।

গোপালকপত্নী ঝটিতি সুশীতল জল সিতোপলাখণ্ড[১] ও সুগন্ধি লেবু লইয়া আসিল এবং গৃহতলে বসিয়া পানীয় প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। শাস্তা লক্ষ্য করিলেন, সে অতি ধীরগতিতে, যেন ইচ্ছাপূর্বকই দেরি করিয়া, পানীয় প্রস্তুত করিতেছে; তাহার হস্ত কার্যে ন্যস্ত থাকিলেও অনিমেষ চক্ষুর্দ্বয় তাঁহার মুখের উপরেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। শাস্তা স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন, গোপবধূও তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, এবং ক্রমে তদীয় সম্মোহনশক্তিবলে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হইয়া পড়িল।

শাস্তা কহিলেন, তুমি এক্ষণে আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়িয়াছ। আমি যে শক্তিদ্বারা তোমাকে আবদ্ধ করিয়াছি, তোমার সাধ্য নাই তাহাকে জয় কর। এখন আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর দাও। তোমাকে আমি সহজ স্বচ্ছন্দভাবে বাক্যালাপ করিবার স্বাধীনতা দিলাম।

গোপবধূ সংজ্ঞাহীনা; যন্ত্রচালিতের মত কহিল, আদেশ করুন।

---

১ মিছরি

তখন শাস্তা পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে প্রতীক্ষমান গোপালককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যে প্রেতিনী তোমার পত্নীকে ভর করিয়াছে, আমি তাহাকে আমার ইচ্ছাশক্তির অধীন করিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে ইহাকে বিতাড়িত করিতে আমার বিলম্ব হইবে না। কিন্তু আমি বহুদিন ধরিয়া যে সুযোগের অন্বেষণ করিতেছিলাম, অদ্য তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই প্রেতিনীকে আমি এই অবসরে কয়েকটি প্রশ্ন করিতে চাহি। তুমি এই প্রশ্নোত্তর শুনিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইও না, কারণ আমার বাক্যালাপের পাত্রী আপাতদৃষ্টিতে তোমার পত্নী হইলেও, বস্তুতঃ আমার সহিত কথা বলিবে তাহার দেহস্থিতা প্রেতিনী। তুমি এই স্থলে অবস্থান কর, তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার পত্নীর সহিত আমার দীর্ঘ সান্নিধ্য লোকচক্ষে শোভন নহে।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব প্রেতিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমার পূর্ব ইতিহাস সমস্তই আমার জ্ঞাত আছে। তুমি বিল্ববৃক্ষে বাস করিতে, এই গোপবধূ স্নানার্থ তথায় গমন করিলে তুমি ইহাকে আশ্রয় করিয়াছ। কিন্তু কেন তুমি ইহাকে আশ্রয় করিয়া কষ্ট দিতেছ? ইহার প্রতি তোমার এরূপ আক্রোশ জন্মিবার কারণ কি?

গোপবধূ অর্থাৎ প্রেতিনী মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, এই যদি আপনার জ্ঞানের পরিচয় হয়, তবে আপনার অধ্যাপকদিগের প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধা জন্মিল না। সত্য বটে, আপনার মনোবলের প্রাবল্যে আমি অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু—

শাস্তা ধমক দিয়া কহিলেন, প্রগল্‌ভতা করিও না। যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর দাও। তুমি আচারপরায়ণা এবং পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়া। তদ্দর্শনে স্পষ্টই অনুমিত হয়, তুমি নীচজাতীয়া নহ, সম্ভবতঃ তুমি ব্রাহ্মণ-কুলজা ছিলে। এই গোপকন্যাকে তুমি কেন ভর করিলে?

প্রেতিনী পুনরায় হাসিল, কটাক্ষ বিচ্ছুরিত করিয়া কহিল, ঠিকই ধরিয়াছেন, আমি ব্রাহ্মণকন্যা। দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহে আমার জীবন কাটিয়াছে, কোনদিন দধিদুগ্ধঘৃতাদি আস্বাদন করিতে পাই নাই, এক্ষণে ইহাকে ভর করিয়া সেই অতৃপ্ত কামনা মিটাইতেছি। এই গোপবালার প্রতি আমার কিছুমাত্র আক্রোশ নাই, থাকিলে পরিচ্ছদপ্রিয়তা দ্বারা ইহার দেহকে শোভন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতাম না।

শান্তা দেখিলেন, ইহাতে হইবে না। তখন তিনি কহিলেন, অয়ি, নারীর মনের কথা প্রণিধিগণও[1] জানিতে পারেন না, আমি তো মানব মাত্র। ভাল, তোমার সহিত আমি একটা বন্দোবস্ত করিতেছি। তুমি এক্ষণে আমার ইচ্ছার অধীনা, এই গোপবালাকে তোমায় ত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু তোমাকে আমি প্রেতযোনি হইতে মুক্তি পাইবার উপায় বলিতে পারি। তুমি তাহা চাহ কি না?

প্রেতিনী বহুক্ষণ নীরব রহিল, অবশেষে কহিল, চাহি।

শান্তা কহিলেন, তবে তাহার বিনিময়ে তোমাকে একটি কার্য করিতে হইবে। আমি বহু অধ্যয়ন বহু চিন্তা করিয়াও, প্রেতগণ কেন মনুষ্যকে আশ্রয় করে—এই প্রশ্নের সমাধান সম্যক নির্ণয় করিতে পারি নাই। তুমি আমাকে এই বিষয়ে উপদেশ দাও, আমি যে সকল প্রশ্ন করি, তাহার উত্তর দাও। তাহা হইলে আমি তোমাকে মুক্তির উপায় বলিয়া দিব।

প্রেতিনী কহিল, উত্তম, আপনি প্রশ্ন করুন।

শান্তা কহিলেন, শ্রবণ কর। তুমি যে বলিলে দধিদুগ্ধ ভোজনের অতৃপ্ত বাসনা মিটাইবার জন্য তুমি ইহাকে ভর করিয়াছ, তোমার এই

---

১ গুপ্তচর

কথার মধ্যে কিছুটা সত্যের ইঙ্গিত আছে বলিয়া আমিও মনে করি। কিন্তু ইহার সবটা সত্য নহে, কেমন ?

প্রেতিনী নীরব।

শাস্তা বলিতে লাগিলেন, কোন অতৃপ্ত বাসনা লইয়া মরিলে আত্মার মুক্তির বিঘ্ন ঘটে, এবং সেই অতৃপ্ত বাসনা পূরণের জন্য সেই প্রেত জীবন্ত মনুষ্যকে আশ্রয় করিতে পারে, ইহা আমারও মনে বহুবার উদিত হইয়াছে। মৃত্যুদণ্ডের পূর্বে দণ্ডিতকে তাহার শেষ ইচ্ছা পূরণের সুযোগ দেওয়ার যে বিধি শাস্ত্রে আছে, বোধ হয় তাহারও মূলে এই যুক্তি বিরাজমান। তোমার কোন অতৃপ্তি থাকিতে পারে, আমি স্বীকার করিলাম। কিন্তু তুমি যে দধিদুগ্ধ ভোজনের বাসনার কথা বলিলে, আমার উহা সত্য বলিয়া প্রতীতি হইল না। সম্রাট ব্রহ্মদত্তের রাজ্যে এমন অকিঞ্চন কেহ নাই, যাহার মোটেই দধিদুগ্ধ জুটে না। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের, যাহারা অনুক্ষণ সর্বজাতির নিকট হইতে নানা ছলে দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হয়। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তোমার অতৃপ্তি দধিদুগ্ধসম্বন্ধীয়া নহে।

প্রেতিনী ঈষৎ উসখুস করিয়া উঠিল, কিন্তু এবারেও সে কোন কথা কহিল না।

শাস্তা পুনরায় কহিলেন, তাহা ছাড়া, যে কামনা পূরণ করিবার মোহে দেহমুক্ত আত্মা পুনরায় নরদেহে বন্দী হইতে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হয়, তাহার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। সামান্য রাসনবাসনার এত জোর হইতে পারে না। একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করিয়াছি। সর্বদাই দেখা যায়, প্রেতগণ পুরুষকে ও প্রেতিনীগণ স্ত্রীলোককে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহার নিশ্চয়ই কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে। তাহা কি ? আমার এই প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতে হইবে।

প্রেতিনী চঞ্চলা হইল, আশেপাশে কে আছে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল, পরে মৃদুস্বরে কহিল, দেব, প্রেতিনী হইলেও আমি নারী, সকল কথা আপনার মত লোকের সমক্ষে উচ্চারণ করিতে পারি না।

শাস্তা কহিলেন, আমি যখন তোমার নিকট জ্ঞানবিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করিতেছি, তৎকালে তোমার সহিত আমার গুরুশিষ্য সম্বন্ধ। অতএব তোমার কোন কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করা উচিত নহে। ভাল, তুমি আকারে ইঙ্গিতেই বল।

প্রেতিনী কহিল, দেব, প্রেতিনী যখন কোন নারীকে আশ্রয় করে, সর্বদাই অনতিবয়স্কা সমর্থদেহা ও যুবকপতি-সনাথা নারী দেখিয়া করে। ইহা হইতে আপনার প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়া লউন।

শাস্তা কহিলেন, বুঝিলাম। কিন্তু সে ক্ষেত্রে, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, কোন ব্রাহ্মণবধূকে ভর করাই তো তোমার পক্ষে রুচিসঙ্গত। তুমি কি বলিয়া গোপালকবধূকে আশ্রয় করিলে? ইহা তোমার সুরুচিজ্ঞান ও বর্ণ বৈশিষ্ট্যচেতনার পরিচায়ক নহে।

প্রেতিনী নয়ন নত করিয়া কহিল, দেব, প্রেতলোকে জাতিভেদ নাই। এখানে আসিলে সকলেই সমান।

শাস্তা কহিলেন, তুমি পুনরায় ডেঁপোমি করিতেছ। আমি প্রেত না হইতে পারি, কিন্তু প্রেতলোকের রীতিনীতি সম্বন্ধে বহু কথা আমার জানা আছে। পার্থিব বর্ণাশ্রমভেদ প্রেতলোকেও টিকিয়া থাকে, তথায়ও ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতি নামে বর্ণভেদে সমাজভেদ আছে। মানুষ সুদ্ধ প্রেতত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়াই স্বভাবগত সঙ্কীর্ণতা ছাড়িতে পারে না। আর সত্যই যদি তথায় জাতিভেদের কড়াকড়ি নাও থাকে, পৃথিবীতে তো আছে। মৃত গোপপ্রেত ও জীবন্ত গোপালক এক বস্তু নহে। সে কাণ্ডজ্ঞান তোমার থাকা উচিত ছিল।

প্রেতিনী নতমুখে কহিল, দেব, আমি মিথ্যা বলিয়াছি। অতি অকালে আমার মৃত্যু হইয়াছে। অতৃপ্ত বাসনার তাড়নায় আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিবার মত শক্তি আমার ছিল না। বহুদিন আমি আত্মতর্পণের সুযোগ পাই নাই। তাই এই নবোঢ়া গোপবধূকে হঠাৎ হাতের কাছে পাইয়া আর ইহাকে আশ্রয় করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই।

শাস্তা কহিলেন, তুমি আগাগোড়াই মিথ্যা বলিতেছ। তোমার পরিচয় আমি বহুক্ষণ পূর্বেই অনুমান করিয়াছি। অপঘাতজনিত প্রেতত্ব হইতে মুক্তি পাওয়া সহজ, কিন্তু তুমি যে পাপ করিয়াছ, তাহার ক্ষালন তত সহজ নহে। বিশেষতঃ তোমার অন্তরে এখনও অনুতাপের উদয় হয় নাই; তুমি যে পাপ করিয়াছ, তদপেক্ষাও বৃহত্তর পাপ করিতে উদ্যতা হইয়াছিলে। তদুপরি এখনও তুমি বারংবার মিথ্যা কহিতেছ।

প্রেতিনী কাঁদিয়া কহিল, আমাকে ক্ষমা করুন।

শাস্তা সময়োচিত গাম্ভীর্য অবলম্বনপূর্বক কহিলেন, ক্ষমা করিবার মালিক আমি নহি। তুমি সংযমহীনা পাপিষ্ঠা, মর্ত্যদেহে তোমার যে লালসা মেটে নাই, প্রেতদেহেও তাহার অন্বেষণে তুমি ব্যভিচারিণী হইয়াছ, ভিন্নজাতীয় পরপুরুষে উপগতা হইয়াছ। এই পাপাচরণের অবলম্বনরূপে যাহাকে তুমি আশ্রয় করিয়াছ, তাহারও চরম সর্বনাশ করিতে উদ্যতা তুমি হইয়াছিলে, অথচ এই নিষ্পাপ বালিকার কোনই দোষ নাই।

প্রেতিনী কহিল, দেব, আমাকে গালাগালি দিন, কিন্তু অযথা দোষারোপ আমার উপরে করা আপনার উচিত নহে। এই গোপবধূর কোন ক্ষতি আমি করি নাই। বরং ইহার দেহকে যথাসাধ্য সুসজ্জিত শোভন করিয়া তুলিতেই আমি চেষ্টা করিয়াছি।

শান্তা কহিলেন, তোমার নিজের স্বার্থে—গোপালককে আকৃষ্ট করিবার জন্য, ইহার হিতার্থে নহে। নিজের মোহে তুমি এতই অন্ধ যে, ইহার কি ক্ষতি করিতে যাইতেছিলে, তাহা বুঝিবার শক্তিও হারাইয়াছ।

প্রেতিনী জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিল।

শান্তা কহিলেন, হয়তো ইহার পূর্বে তুমি এই দেহে ইহার স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সন্নিহিতা হও নাই। কিন্তু অদ্য আমি প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিবামাত্র তোমার লক্ষ্য আমার তেজোদীপ্ত চেহারার দিকে আকৃষ্ট হইল। তোমার চক্ষে লালসার দৃষ্টি দেখিয়াই আমি ব্যাপার অনুমান করিয়া লইলাম। অথচ আমি কে, কোন্ বংশীয়, কিছুই তুমি জানিতে না। তারপর তাম্বূলপ্রদানচ্ছলে তুমি আমার সন্নিকটে যখন আসিলে, তখনও তোমার মনে লালসাই অতি প্রবল। এইরূপ হইবে জানিয়াই আমি তোমাকে ওইভাবে প্রেরণ করিতে গোপালককে উপদেশ দিয়াছিলাম।

প্রেতিনী রুদ্ধশ্বাসে কহিল, সে কি!

শান্তা কহিলেন, হাঁ, তুমি ভারি ঠকিয়া গিয়াছ। কিন্তু সেজন্য এখন আর অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই। এই দেখ, তোমার প্রদত্ত তাম্বূলপুট এখনও আমার হস্তেই রহিয়াছে, ইহার মধ্যে বশীকরণ ওষধি থাকিতে পারে সন্দেহ করিয়া আমি ইহা খাই নাই। পানীয় প্রস্তুত করিবার ছলে তুমি নিকটে বসিয়া নির্লজ্জার মত অনিমেষে আমার দিকে চাহিয়া রহিলে, এবং সেই অবসরে আমার মনোবলের নিকট অবনতা হইয়া পড়িলে। এ বিষয়ে তোমার মোহের অন্ধ উন্মত্ততা আমার সহায়তাই করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি আমি সত্যই অন্য প্রকৃতির লোক হইতাম, তোমার কামনার কবলে আত্ম-সমর্পণ করিতাম, তুমি নিজের লালসা মিটাইবার জন্য এই নিষ্পাপ

বালিকার দেহকে পরপুরুষের অঙ্কশায়ী করিতে। তোমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইত ?

গোপালকের মূর্তি ক্রমেই রুদ্র হইয়া উঠিতেছিল, শাস্তা ইঙ্গিতে তাহাকে শান্ত করিলেন।

প্রেতিনী ভূলুণ্ঠিতা হইয়া কহিল, প্রভু, আমি বড় দুঃখিনী। আমাকে ক্ষমা করুন, আপনার চরণে ধরিতেছি।

শাস্তা তড়িৎবেগে পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, এখনও এই দেহকে পরপুরুষস্পৃষ্ট করিবার প্রয়াস! ক্ষমা যদি চাও, যাহার পত্নীর প্রতি এই অন্যায় করিয়াছ, প্রথমে তাহার নিকটে ক্ষমা চাহ।

প্রেতিনী গোপালকের চরণে পতিত হইয়া অতি তীব্রবেগে ভূতলে মস্তক কুট্টিত করিতে লাগিল।

প্রিয়া জায়ার দেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত ও লাঞ্ছিত দেখিয়া গোপালক ব্যস্ত হইয়া তাহাকে বাহুবেষ্টনে তুলিয়া ধরিতে গেল। শাস্তা নিষেধ করিয়া কহিলেন, এই দেহ এক্ষণে প্রেতিনীর আশ্রয়, তুমি ইহাকে বাহুবদ্ধ করিলে সে আলিঙ্গন বস্তুতঃ প্রেতিনীকেই করা হইবে।

গোপালক বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, দেব, আমি মূর্খ মানুষ, অতশত বুঝি না। ইহার আত্মনির্যাতন আমি আর দেখিতে পারিতেছি না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রেতিনীকে সত্বর বিতাড়িত করুন, আমরা উভয়ে আজীবন আপনার নিকট বিক্রীত হইয়া থাকিব।

শাস্তা কহিলেন, কিন্তু এই প্রেতিনীর তো এখনও উপযুক্ত শাস্তি হয় নাই। তুমি একগাছা সুদৃঢ় নারিকেলশলাকা-নির্মিত সম্মার্জনী আনয়ন কর।

গোপালক কহিল, না না, সে আঘাত তো উহারই দেহে পতিত হইবে।

শাস্তা কহিলেন, তোমার পত্নীর এক্ষণে আত্মচেতনা নাই। আঘাত তাহাকে লাগিবে না, প্রেতিনীকে লাগিবে।

প্রেতিনী কহিল, প্রভু, তাহাই করুন।

গোপালক আর্তস্বরে কহিল, তাহা কখনও হইবে না। আপনার যুক্তিতর্ক আমি শুনিতে চাহি না, এই দেহে এক্ষণে কাহার আত্মা আছে বা নাই, তাহা জানিয়া আমার কি হইবে? আমি শুধু জানি, ওই পৃষ্ঠে আমি চিরকাল স্নেহভরে হস্ত বুলাইয়াই দিয়াছি, ওই বাহু সারারাত্রি স্বীয় কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াও তৃপ্ত হই নাই, ওই কেশরাশি—। বলিতে বলিতে তাহার উভয় গণ্ডই অশ্রুতে প্লাবিত হইল, চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিল, বরং আপনি প্রেতিনীকে আদেশ করুন, সে আসিয়া আমার দেহে ভর করুক, তারপর আমার দেহে আপনি যত ইচ্ছা প্রহার করিবেন, আমি আপত্তি করিব না।—এই বলিয়া সে শাস্তার সম্মুখে নতজানু হইয়া পত্নীর দেহকে আড়াল করিয়া বসিল।

শাস্তা তাহার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া কহিলেন, রে পাপিষ্ঠে, দেখ্‌, নিষ্ঠা কাহাকে বলে; ইহার সহিত তোর ব্যভিচারিণী প্রকৃতির তুলনা কর্‌। অথচ এ ব্যক্তি পুরুষ, আর তুই নারী, যাহারা নিষ্ঠা ও সতীত্বের ঠ্যাকারে চক্ষে দেখিতে পাস্‌ না।

প্রেতিনী পুনরায় ধূলিলুণ্ঠিতা হইয়া কহিল, প্রভু, ক্ষমা করুন।

শাস্তা কহিলেন, তোকে এত শীঘ্র নিষ্কৃতি দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এই গোপালকের নির্বন্ধাতিশয্যে ইহার পত্নীকে যত শীঘ্র সম্ভব সুস্থ করিয়া দিব। পুণ্যবতীর দেহ আশ্রয় করিয়াছিলি বলিয়াই তুই বড় সহজে বাঁচিয়া গেলি। তোকে মুক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আমি প্রতিশ্রুত আছি, তাহা দিয়াই তোকে ছাড়িয়া দিব।

প্রেতিনী ক্ষীণস্বরে কহিল, দয়া করিয়া উপদেশ করুন।

শাস্তা কহিলেন, যতদিন এই লালসা তোর মধ্যে জাগিয়া থাকিবে, ততদিন তোর মুক্তি নাই, ইহার আকর্ষণ বারংবার তোকে টানিয়া নামাইয়া আনিবে। অতএব মুক্তি পাইতে হইলে তোকে আত্মসংযম করিতে হইবে।

প্রেতিনী কহিল, প্রভু, দুঃখিনীর প্রগল্‌ভতা মার্জনা করিবেন। যাহা আমি পারিব না, তাহা আদেশ করিয়া লাভ নাই।

শাস্তা কহিলেন, পারিব না অর্থ? মানুষ রক্তমাংসের দেহ লইয়া চিত্তসংযম ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারে, আর তুই বায়ুময় শরীর লইয়া পারিবি না?

প্রেতিনী তর্জনী উত্তোলন করিয়া কহিল, কি বুঝিবেন আপনি সন্ন্যাসী! আপনার আমা-অপেক্ষা চিত্তবল অধিক, আমার মধ্যে যদি আপনার অপেক্ষা বাসনার প্রভাব অধিক থাকে, তাহার জন্য আমাকে আপনি দায়ী করিতে পারেন না। দেখুন, যাহার যাহা স্বভাব, মরিলেও তাহা যায় না। ঈশ্বর যখন জীবকে পুরুষ ও স্ত্রী দেহ দিয়াছেন, আসঙ্গ-লিপ্সাও সেই সঙ্গেই দিয়াছেন। স্পষ্টই বুঝা যায়, তাঁহার অভিপ্রায়, আমরা ইহার অনুশীলন করি, দোষের হইলে তিনিই ইহা দিতেন না। এই স্বাভাবিক লিপ্সার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কদাচ কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে; যে ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সে হয় স্বভাবের ব্যতিক্রম, না হয় ভণ্ড। দেব, এই লিপ্সা রক্তমাংসের দেহের বা বাস্তব সম্ভাব্যতার অপেক্ষা রাখে না। পণ্ডিতেরা বলেন, মানবের দৈহিক সামর্থ্য আসিবার বহু পূর্বেই তাহার চিত্তে ইহার উদ্গম হয়, নৃপতি অধিপাশের বৃত্তান্ত তাহার প্রমাণ। মৃত্যুর পরেও যে ইহা টিকিয়া থাকে, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত আমিই আপনার সম্মুখে রহিয়াছি। বস্তুতঃ এই লিপ্সার উদ্ভব ও অবস্থান মনে, দেহ ইহার আধার নহে, উপকরণ মাত্র। ইহা দুর্জয়,

সর্বব্যাপী, অবিনশ্বর। ইহার মোহে জনপদবধূ সান্ধ্যপ্রসাধনান্তে রাজপথাবলোকী বাতায়নে বসিয়া থাকে, প্রেতিনী মোহিনী ভর্তৃহীনা নারীর বেশে অন্ধকার রাত্রে নির্জন স্থানে নিঃসঙ্গ পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বুধগণের মতে মুক্তিতৃষ্ণা অপেক্ষাও এই তৃষ্ণা বলবতী, ইহাই আত্মার প্রথমা প্রবৃত্তি। আর মৃত্যুর পরেও যখন প্রেত-প্রেতিনীভেদ টিকিয়া থাকে, তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে—

তোমাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। বক্তৃতা রাখিয়া দাও, কাজের কথা বল। তুমি কি করিতে চাহ?

প্রেতিনী করজোড়ে কহিল, দেব, শুনিয়াছি, ভোগ হইতে নিবৃত্তি আসে, তৃপ্তিতেই তৃষ্ণার বিলয়।

শাস্তার মুখে করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, হায় দগ্ধভালে, এততেও তোর চৈতন্য হইল না! আমি আর কি করিব!

প্রেতিনী কহিল, প্রভু, বলুন, কি উপায়ে কখন আমার মুক্তি হইবে?

শাস্তা কহিলেন, বলিতে পারিলাম না। আমার শঙ্কা হইতেছে, তৃপ্তিদ্বারা তৃষ্ণার বিলয় করিতে গিয়া তোমরা আর কিছু কর না কর, সৃষ্টির বিলয়ে অনেকখানি সহায়তা করিবে। যাহাই হউক, আমি যখন প্রতিশ্রুত, বলিতে আমাকে হইবেই।

প্রেতিনী কহিল, বলুন।

শাস্তা ক্ষণকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া কহিলেন, শ্রবণ কর। উত্তরকালে বঙ্গদেশে 'তৃপ্তিতে তৃষ্ণার বিলয়' এই মতবাদের বহুল প্রতিষ্ঠা হইবে। তোমরাও তখনই তৃপ্তি খুঁজিবার সুযোগ পাইবে।

কিরূপে?

বঙ্গদেশীয় তরুণ রসস্রষ্টাদিগের মস্তকে তোমরা ভর করিবে।

পুরুষ!

হাঁ। পুরুষস্পর্শ তো তোমাদিগের নিকট পরম উপাদেয়, অত ন্যাকামিপ্রকাশের কি হইয়াছে! অবশ্য যা দিনকাল আসিতেছে, নারীও খুঁজিয়া পাইতে পার। তাহাদের মস্তকে স্থানলাভ করিয়া তোমরা ক্রমে তাহাদের মানসকন্যারূপে বাস্তব-উপন্যাসের নায়িকা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। মুদ্রাযন্ত্রচালনরত প্রেতের দল তোমাদের সহায় হইবে। সেই অবস্থায় তোমরা যথেচ্ছ তৃপ্তি অন্বেষণের সুযোগ পাইবে, এবং পুস্তক ছিন্ন বা অগ্নিদগ্ধ হইয়া সংস্করণ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও বিলয় ঘটিবে। সেই তোমাদের মুক্তি।

প্রেতিনী কহিল, সে যে অনেক দেরি!

শাস্তা কহিলেন, উৎকণ্ঠা তোমার কিসের জন্য? সত্যই মুক্তির তাড়ায়, না তৃপ্তি-অন্বেষণের সেই শুভ সুযোগ আসিবার বিলম্ব ভাবিয়া?

প্রেতিনী কহিল, প্রভু, আমি তবে যাই?

শাস্তা কহিলেন, হাঁ। আর একটি কথা—জগতের যত প্রেতিনীকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া এ কথা বলিয়া দিবার অবসর আমার নাই, তুমিই সেটা করিয়া দিও। যাও।

প্রাঙ্গণস্থ আম্রবৃক্ষের এক বিরাট শাখা ঘোররবে ভাঙিয়া পড়িল। গোপালকবধূ মূর্ছিতা হইল।

শাস্তা গোপালককে কহিলেন, এ মূর্ছা অচিরেই ভাঙিবে, কিন্তু রোগিণী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িবে।

এই বলিয়া তাহার শুশ্রূষা সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ দিতে দিতেই বধূর মূর্ছা ভাঙিল; চকিতে জিহ্বা দংশন করিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া সে ত্রস্তে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

শাস্তা গোপালককে কহিলেন, আর চিন্তার কারণ নাই। আমার

সঙ্গিগণ পান্থনিবাসে অপেক্ষা করিতেছে, তুমি কোন লোক দ্বারা তাহাদিগকে সংবাদ প্রেরণ কর।

অচিরে তাঁহার সঙ্গিগণ তৎস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন শাস্তা গৃহস্থ ও পল্লীস্থ যাবতীয় লোককে তথায় আহ্বান করিলেন, এবং সকলের প্রত্যয়ার্থ প্রেতিনীসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সর্বসমক্ষে বলিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়সংযম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। পরিশেষে কহিলেন, সন্ধ্যা আগতপ্রায়, আমি এক্ষণে চলিলাম। আর হে গোপালক, তুমি তো অসংযমের ফল স্বয়ংই প্রত্যক্ষ করিলে, তোমাকে আর নূতন করিয়া কি বলিব? কদাচ প্রবৃত্তির দাস হইও না। দেখ, প্রেতিনীর সম্মুখে আমি তোমার নিষ্ঠার প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু তাহা শুধুই প্রেতিনীকে চাপ দিবার জন্য। আমি সত্যই তোমার আচরণের সমর্থন করিয়াছি মনে করিয়া তুমি উল্লসিত হইও না; বস্তুতঃ তুমি তখন যেরূপ স্ত্রৈণবৎ নাচানাচি করিয়াছ, তাহাও স্বাভাবিক বুদ্ধির পরিচায়ক নহে, পত্নীর দেহের প্রতি অত্যধিক বাৎসল্য কামপ্রবৃত্তিরই এক প্রকার বহিঃপ্রকাশ।

এবংবিধ বহুতর অমূল্য উপদেশাবলী প্রদান করিয়া শাস্তা তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

গোপালক নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, বাঁচিলাম।

☞ অতৃপ্তিতে মুক্তির বিঘ্ন অতি প্রাচীন প্রবাদ। বহু প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ আছে। জাতক দেখুন।

কামপ্রবৃত্তির তাড়না ও প্রাবল্য সম্বন্ধে আধুনিককালেও বহু গবেষণা হইতেছে।

অধিপাশ—প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত রাজপুত্র। শৈশবে ইনি স্বীয়

মাতার প্রতি কামভাবে আকৃষ্ট হইয়া অপস্মাররোগে আক্রান্ত হন। মহামতি জীবককে চিকিৎসার্থ আনয়ন করা হইলে তিনি রোগীর বসন মুক্ত করিয়া পশ্চাৎদেশে পঞ্চাশৎ সংখ্যক বেত্রাঘাত ব্যবস্থা করেন। ওই ব্যবস্থায়ই রোগ সারিয়া যায়। (নিতম্বস্থ শিরা ও উপশিরাসমূহের সহিত কামোৎসারপন্থের নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান যুগেও বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেন।) ইউরোপীয় গ্রন্থেও King Ædipus সম্বন্ধে অনেকটা এইরূপ কথা পাওয়া যায়। কিন্তু ইউরোপীয় গ্রন্থে জীবকের চিকিৎসার উল্লেখ নাই। সহজেই বোঝা যায়, Ædipus অধিপাশেরই বিকৃত উচ্চারণ মাত্র।

Exhibitionism সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষিগণের গ্রন্থ দেখুন। পুরুষ যখনই ভূত দেখে, দেখে, যেন শ্বেতবসনা অবগুণ্ঠিতা নারী হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। যে কেহ ভূত দেখিয়াছেন, তিনিই ইহা জানেন।

প্রেতিনীগণ নবোঢ়া নারীকেই সাধারণতঃ আশ্রয় করিয়া থাকে এ তথ্য বঙ্গদেশের যে কোনও পল্লীবৃদ্ধাই জ্ঞাত আছেন। এইজন্যই তাহাদের ভরসন্ধ্যায় গৃহের বাহির হওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

পরিশেষে বক্তব্য, অনেকের ধারণা—ফ্রয়েড এলিস প্রমুখ মনীষিগণের পুস্তক প্রণয়নের পূর্ব্বে বড় একটা যৌনপ্রবৃত্তিবিষয়ক চর্চা হয় নাই। এ সম্বন্ধে আমার বরাবরই সংশয় ছিল, এবং প্রাচীন ভারতের অমিত রত্নভাণ্ডারের মধ্যে কোথাও এ সম্বন্ধে কিছু পাই কি না, বহুদিন ধরিয়া তাহার খোঁজ করিয়াছি। অবশেষে বহু অন্বেষণে বহু ক্লেশের ফলে এই আখ্যায়িকাটি আবিষ্কার করিতে পারিয়া সমস্ত শ্রম সার্থক মনে করিতেছি।

৺ঈশানচন্দ্র ঘোষের সঙ্কলিত জাতক-নিবন্ধাবলীর মধ্যে এই আখ্যায়িকাটি নাই। বোধ হয় তাহার এক কারণ, এটির অস্তিত্ব তাঁহার

সময়ে, আমি যতদূর জানি, বস্তুতঃ অজ্ঞাত ছিল। আর এক কথা—৺ঈশানচন্দ্র সাধারণতঃ পালিগ্রন্থে যে সকল জাতক পাওয়া যায়, তাহারই অনুবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই জাতকটির মূল পালিতে নয়, অন্যত্র। এই অনুবাদে আমি যথাসাধ্য মূলকে অবিকৃত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি, যেমনটি পাইয়াছি, ঠিক তেমনই রাখিয়া দিয়াছি। কেবল শেষ ছত্রটি আমার নিজের যোজিত।

তরুণায়ন

আমার সব-চাইতে ইন্টারেস্টিং কেস ঘটেছিল, ডাক্তার অর্ধেন্দু বোস বললেন, এই কলকাতাতেই।

বড় ছেলে অনুপমের দশম জন্মতিথি। রাত দশটার পরে নিমন্ত্রিতেরা সবাই চ'লে গেলেন; বাকি রইলেন যাঁরা, তাঁরা আজ যাবেন না। বাড়ির সামনেকার লনে ঈজি-চেয়ার বার ক'রে আড্ডা বসল; অর্ধেন্দু, তাঁর স্ত্রী সুনীতি, সুনীতির বোন সুরুচি, সুরুচির স্বামী প্রভাত—পাটনার ব্যারিস্টার, আর বোনেদের ভাই তপেন—মেডিক্যালে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র।

সুরুচি বললেন, অর্ধেন্দুবাবু, একটা গল্প বলুন। শুনেছি, আপনি খুব ভাল গল্প বলেন।

অর্ধেন্দু বললেন, বলি না। তোমাকে যে বলেছে, সে লোক ভাল নয়।

সুরুচি বললেন, দিদি বলেছে।

অর্ধেন্দু খাড়া হয়ে উঠে বসলেন। চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, বিশ্বাস ক'রো না।

সুনীতি বললেন, তার মানে? তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী বলছ?

অর্ধেন্দু। না, অত্যুক্তিকারিণী বলছি।

সুরুচি। ছি ছি।

অর্ধেন্দু। ছি-ছির কিছুই নয়। পতিব্রতা নারীমাত্রেই স্বামীর গুণপনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অত্যুক্তি ক'রে থাকেন। সেটা সদ্‌গুণ। কিন্তু তার সবটা বিশ্বাস করলে ঠকতে হয়।

প্রভাত। আপনি তা হ'লে স্বীকার করছেন যে, গল্প ওঁকে আপনি বলেন। শুধ্‌ সেগুলো উনি যতটা ভাল বলছেন, আপনার মতে ততটা ভাল হয় না। এই তো?

অর্ধেন্দু। রাইট। গল্প বলি—বলি বললে ঠিক বলা হ'ল না, বলতাম। তবে সেগুলো ভাল হয় না।

সুরুচি। তা হোক, ভালমন্দ আমরা বুঝব। আপনি বলুন।

অর্ধেন্দু। ওই যে বললাম, গল্প আর আজকাল বলি না।

সুরুচি। আচ্ছা, সেই পুরোনো গল্পই বলুন।

অর্ধেন্দু। বলব না। কারণ, প্রথমত, সুনীতিকে যে সব গল্প তখনকার দিনে শোনাতুম, সে তোমাকে শোনাতে গেলে প্রভাতের চটবার কথা। দ্বিতীয়ত, যে বয়সে সে গল্প বলা যায় ও শোনা চলে, সে বয়স আমার আর নেই, তোমারও সে বয়সটা বোধ করি পেরিয়ে—

প্রভাত। ফোর নাইন্টিনাইন।

অর্ধেন্দু। যাওয়া বারণ। তৃতীয়ত, সে সব এখন ভুলেও গেছি। রুগী আর মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে, কাব্য কলা ওগায়রহ যত রকমের রসের ছিটেফোঁটা প্রাণে এককালে ছিল, তার সবটুকু নিঃশেষে উবে গেছে। এখন শয়নে স্বপনে একমাত্র চিন্তা—কেস। তার বাইরে আর কিছু ভাবতেই সময় পাই না তো গল্প বলা। চতুর্থত, সংসারে যে সব বস্তু নিয়ে গল্প বলা যেতে পারে, ভূত, অ্যাড্‌ভেঞ্চার বা প্রেম, এর কোনটারই স্টক আমার নেই। ভূত দেখি নি, অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মধ্যে হয়েছিল বিলেত যাবার সময় সী-সিক্‌নেস, আর প্রেমের কথা বইয়েই পড়েছি।

সুরুচি। দিদি, সত্যি?

অর্ধেন্দু। দিদি? কিন্তু সে নিয়ে গল্প হয় না: ওটা রিজার্ভ্‌ড্‌ সাব্‌জেক্ট, অপরের অশ্রাব্য ও অপরের সাক্ষাতে অকথ্য, অনুচ্চার্য।

সুরুচি। সে শুনতেও চাই না। বেশ তো, কেসের গল্পই বলুন না হয়।

অর্ধেন্দু। কেসের গল্প বলতে নেই। ডাক্তারের ডায়েরি গোপনীয় বস্তু। ব্যারিস্টারের নোট-বইয়ের মত প্রকাশ্য আদালতে ও খবরের কাগজে সালঙ্কারে প্রচারণীয় নয়।

সুরুচি। বাজে কথা। বলা যায় না এমন কিছু নেই—এ হতেই পারে না।

অর্ধেন্দু। ডাক্তারের গল্পের মজাই তো ওই। যেটা বলা যায়, সেটা শোনবার মত হয় না। আর যেটা শোনবার মত হয়, সেটা বললে প্রফেশনাল সিক্রেসি ভাঙা হয়।

সুরুচি। ধুত্তোর সিক্রেসি। এত বছর পরে এলাম আমরা কত দূর থেকে, আর উনি খালি সিক্রেসি করছেন .

প্রভাত। ব'লে যান না, কেসে পড়েন আমি সামলাব। আর আইনে বলে, নিকট-আত্মীয়দের বললে সিক্রেসি-ভাঙার অপরাধ হয় না।

অর্ধেন্দু। বিশেষত যখন সেই আত্মীয়দের মধ্যে একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি থাকেন এবং যখন সেই সিক্রেসি-ভাঙার দিকে বড় উৎসাহ থাকে তাঁরই স্ত্রীর এবং যখন সেই স্ত্রী আবার হন নিজের স্ত্রীর আদুরে বোন এবং যখন মনুর আইন অনুসারে নিজের স্ত্রী নিজেরই অঙ্গের সামিল—দেহে আত্মায় ও ডায়েরির অন্তরঙ্গতায়—

সুনীতি চোখ তুলে চাইলেন,—কবে আমি তোমার ডায়েরি পড়েছি, শুনি ?

অর্ধেন্দু। পড়েছ বলি নি, জান বলেছি। লেখবার আগে শুনলেও জানা হয়।

প্রভাত। May I remind my learned friend that he is digressing from the original issue?

অর্ধেন্দু। এই সেরেছে। একটু ডাইগ্রেসও করতে পাব না, তাও আবার নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কথা কইতে?

সুরুচি। না। অতিথিকে অনাদর ক'রে নিজের স্ত্রীকে সম্ভাষণ করতে ব্যস্ত থাকাটা রুচিবহির্ভূত।

সুনীতি। এবং অতিথির অনুরোধ রক্ষা না করাটা গার্হস্থ্যাশ্রমের নীতিবহির্ভূত। গল্প বলাই তোমার উচিত।

অর্ধেন্দু। বাপ, কে বলে প্রপার-নেমরা নন্‌কনোটেটিভ! কিন্তু তা হ'লে তো দেখা যাচ্ছে, গল্প বলতেই হয়।

সুরুচি। এবং কেসের গল্প। খুব ইণ্টারেষ্টিং দেখে।

তপেন। এবং খুব ইন্‌স্ট্রাক্‌টিভ দেখে, যেন শুনে আমার লাভ হয়।

প্রভাত। এবং আইন বাঁচাবার খাতিরে গল্পের রসভঙ্গ না ক'রে।

অর্ধেন্দু। মাভৈঃ, আমার গল্পে রস থাকবেই না, সে ভঙ্গ আর হবে কি ক'রে!

সুরুচি তপেন প্রভাত। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি শুরু করুন তো এবার।

শোন তবে।—অর্ধেন্দু কেসে গলা সাফ করলেন, চুরুটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে ঈজি-চেয়ারে চিত হয়ে এলিয়ে প'ড়ে মিনিটখানেক চোখ বুজে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন।—

আমার সব-চাইতে ইণ্টারেষ্টিং কেস ঘটেছিল এই কলকাতাতেই। ইউরোপ থেকে ফিরেছি বছর দুই হবে। প্র্যাক্‌টিস তখনও বেশি নয়, মেডিক্যালের চাকরিটি ভরসা। বকুলবাগানে ভাড়াটে বাড়িতে

তখন থাকি, কলেজে ক্লাস নিই, কাটাছেঁড়া করি, আর বাকি দিনটার বেশির ভাগই শুয়ে শুয়ে চুরুট টেনে কাটাই। সংসারের দায়িত্ব তখন কম ছিল। পুত্রকন্যারা তখনও আসতে শুরু করেন নি, শুধু অনু আসবে ব'লে নোটিস দিয়েছে। সুনীতি সারাদিন ব'সে ব'সে লাল উলের জামা বুনতে ব্যস্ত। আর আমি ব্যস্ত সাংসারিক চিন্তায়।

প্রভাত। May I be permitted to point out যে, আপনি এইমাত্র বলেছেন, দায়িত্ব কম ছিল। তবে আবার চিন্তা এল কিসের?

অর্ধেন্দু। জোর ক'রে গল্প বলাবে, তার ওপর আবার জেরা? পুলিসকোর্টের সাক্ষী পেয়েছ নাকি আমাকে? গল্প শুনবে তো চুপ ক'রে ব'সে যা বলি শোন এবং মেনে নিতে থাক। মনে রেখো, বিশ্বাসে মিলয়ে গল্প, তর্কে বহুদূর। আর কথায় কথায় জেরা করবে তো আমিও এই চুপ করলাম। স্কেপ্‌টিকদের আমি গল্প বলি না।

সুরুচি। না না, আপনি বলুন। তুমি চুপ কর তো। যত ব্যারিস্টারি বিদ্যে এইখানে! আর সেবার যখন সেই ইয়ে ঘোল খাইয়ে দিয়েছিল—

অর্ধেন্দু। সিভিল-কলহেও নালম্‌। প্রভাতের কথার জবাব আমি দিচ্ছি। দায়িত্ব তখনই ছিল না বটে, কিন্তু দায়িত্ব আসন্ন ছিল। অনু নোটিস দিয়েছে, তখনও এসে পৌঁছতে ছ মাস দেরি। অ্যারাইভ করবার আগে তিনি অনুপম হবেন কি অনুপমা হবেন জানা ছিল না। সেই এক চিন্তা—হাঁ ক'রে এলেই কন্যাদায়। তারপর ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, দুধ-পেরাম্বুলেটারের দাম আছে। ওদিকে চুরুটের দাম চ'ড়ে গেছে, শুয়ে শুয়ে চুরুট টানতে টানতে যে চিন্তা করব, সেই বা আর কদ্দিন করা চলবে কে জানে! মাস অন্তে কুড়িয়ে বাড়িয়ে জোর শ পাঁচেক টাকা তো আয়। এও চিন্তা। কাজেই প্রভাত, দেখতে

পাচ্ছ, দায়িত্ব না থাকলেও চিন্তা থাকবার পক্ষে কোন বিঘ্ন ঘটে নি। আর একটা কথা তোমরা ইয়ংম্যানরা প্রায়ই ভুল কর, সেটাও এই সঙ্গেই ব'লে দিই। তোমরা মনে কর, দায়িত্ব না থাকলে লোকের চিন্তা থাকতে পারে না। কিন্তু কথাটা ভুল। বরং দায়িত্ব আসবার আগেই লোকের চিন্তা থাকে, মানে চিন্তা করবার মত ফুরসৎ থাকে। চিন্তা করাটা অবসর-সময়ের ব্যাপার, এক রকমের লাক্‌সারি। দায়িত্ব যখন সত্যি এসে ঘাড়ে পড়ে, তখন আর লোকে চিন্তা করবার সময় পায় না, উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কাজেই দায়িত্ব ছিল না কিন্তু চিন্তা ছিল বললে ভুল বলা তো হয়ই না, বরং দায়িত্ব ছিল না ব'লেই চিন্তা ছিল বললে আরও সায়ান্টিফিকালি সত্যি কথা বলা হয়।

এই সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ জ্ঞানগর্ভ কথা তোমাদের শোনাতে পারতুম, তোমাদের জীবনে কাজে লাগত। কিন্তু সুরুচি এরই মধ্যে ভ্রূকুটি করছে এবং তপেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অতএব গল্প বলাই চলুক।

সেদিনটা রবিবার এবং আমার তখন প্রায় রোজই রবিবার। স্টেট্‌স্‌ম্যানের বিজ্ঞাপনটা পন্নের উইক থেকে তুলে দোব ভাবছি। রাত তখন নটা হবে, হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরতে ওদিক থেকে আওয়াজ এল, হ্যালো, ডক্টর বোস আছেন?

বললাম, কে আপনি?

আমি xyz-এর রাজা বাহাদুরের বাড়ি থেকে বলছি।

রাজ বাহাদুরের নামটা শোনা ছিল না। বললাম, কি দরকার?

একটা কেসের জন্যে। আপনি যদি কাল সকালে ফ্রী থাকেন—

ফ্রী আমি সারাক্ষণই। কিন্তু সে কথা স্বীকার ক'রে নিজেকে খেলো

করতে নেই। অতএব স্টাইলসে বললাম, সকালে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে।

ওদিক থেকে জবাব এল, তাই হবে। আমরা ওর ভেতরেই আপনার ওখানে যাব।

সেই রাত্তিরেই স্থির হয়ে গেল, কম ক'রেও অন্তত এক ছড়া চন্দ্রহার আর একটা হীরে-বসানো নথের অর্ডার কালই দিয়ে দিতে হবে, নইলে গৃহের শান্তি আর থাকছে না।

পরদিন সকালবেলা চান ক'রে সবে বেরিয়েছি, বেয়ারা এসে কার্ড দিয়ে বললে, বাবু ব্যয়ঠে হেঁয়। কার্ডে দেখলাম, নাম লেখা—P. C. Ghosh, Private Secretary to the Raja Bahadur of xyz.

ধীরে-সুস্থে ড্রেস ক'রে নিয়ে ড্রইং-রুমে এসে গুডমনিঙের অর্ধেকটা ব'লে থেমে গিয়ে দেখলাম, পি. সি. আমাদের প্রফুল্ল। আমাদের সঙ্গেই বি. এস-সি. পাস ক'রে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছিল, থার্ড ইয়ারের মাঝামাঝি হঠাৎ দেশে চ'লে যায়। তারপর আর দেখা হয় নি; যদিও কলেজে সে আমার ভয়ানক বন্ধু ছিল। এবং আরও একটি দরকারী কথা হচ্ছে, তার নাম আদপেই প্রফুল্ল নয়। বুঝতেই পারছ, প্রফেশনাল সিক্রেসির খাতিরে আমি সমস্ত নাম-টাম বদলে বলব। প্রফুল্ল আমাকে দেখে প্রফুল্লতর হয়ে উঠল। বোঝা গেল, আমার সঙ্গে দেখা হবে বা ডক্টর এ. এস. বোস যে তাদেরই দলের অর্ধেন্দু, এটা সে কল্পনা করে নি। তারপর ব'সে দুজনে খুব খানিক আড্ডা দেওয়া গেল, চা সার্ভ করবার অজুহাতে সুনীতিও যোগ দিলে। তার কেসও শুনলাম। রাজা বাহাদুর কোনখানের রাজা নন, নর্থ-বেঙ্গলের এক জমিদার মাত্র। রাজা খেতাবটা লব্ধ। বাহাদুর বৃদ্ধবয়সে কেঁচে বিয়ে করছেন, অতএব যৌবন ফিরে পাবার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মেডিক্যাল কলেজে

খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, আমি ইউরোপ থেকে ভরোনফ্‌স অপারেশনের স্পেশালিস্ট হয়ে এসেছি। অথ প্রফুল্লর আগমন। সংবাদের শেষে প্রফুল্ল একটু প্রাইভেট হিণ্টও দিলে, বুড়োর ঢের টাকা এবং ছেলেপুলে নেই, অতএব বুড়ো জোয়ান হবার জন্যে বেজায় ক্ষেপে গেছে। অপারেশনটা যদি ঠিক ক'রে দিতে পারি, বেশ মোটা হাতে টাকা মিলবে। এই থেকে বুড়োর সার্কলেও রেকমেণ্ডেড হয়ে যেতে পারি, পারলে পয়সা আছে।

নগদ টাকা আয়ের ফাঁক পেলে ছাড়ব, এমন সাত্ত্বিক অবস্থা তখন আমার নয়। প্রফুল্লর সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লাম। পথে যেতে যেতে প্রফুল্লর ইতিহাস শুনলাম। সেই যে সে বাড়ি চ'লে গিয়েছিল তার বাবার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে, তারপর তিনি মারা গেলেন, ওরও আর পড়া-শোনা করবার মত সংস্থান রইল না। কিছুদিন এদিক সেদিক ঘুরে শেষে এই চাকরিটি পেয়ে গেছে। এখন ভালই আছে।

রাজা বাহাদুরের বাড়ি পৌঁছতে বেশি দেরি লাগল না। প্রফুল্লই সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল। প্রথমেই একটি জিনিস দেখে আশ্বস্ত হলাম, রাজা বাহাদুর নামে রাজা হ'লেও আসলে বেশ ভদ্রলোক। মোটাসোটা নধর চেহারা, টুকটুকে রঙ, এক সময়ে সুপুরুষ ছিলেন তার পরিচয় এখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায় নি। ঈজি-চেয়ারে বিরাট দেহভার রেখে চোখ বুজে প'ড়ে ছিলেন, যেতেই শশব্যস্তে উঠে অভ্যর্থনা করলেন। একটু দূরে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি ছোকরা, অবিশ্যি তখনকার হিসেবে লোক, ব'সে ছিল। সেও এগিয়ে কাছে এসে বসল। কথাবার্তা বেশির ভাগই হ'ল আমাতে আর রাজা বাহাদুরে, প্রফুল্ল দরকারমত যোগ দিচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে সে ব্যক্তিটি ফোড়ন দিচ্ছিল। লোকটাকে প্রথমে তত লক্ষ্য করি নি, কিন্তু দু-চার বার

অযাচিত ও অহেতুক ফোড়ন দেবার পর তাকে চেয়ে দেখতেই হ'ল। ছিপছিপে চেহারা, এক সময়ে সুন্দর ছিল, কিন্তু অকালে কাঠ হয়ে গিয়ে সবসুদ্ধ এমন একটা আকৃতি দাঁড়িয়েছে, যা দেখলেই অশ্রদ্ধা হয়। সাজ-সজ্জায় বাহারের অভাব নেই, কিন্তু তার টেস্ট এত খারাপ যে, চারপাশের স্মার্ট সারাউণ্ডিঙের সঙ্গে মোটেই মানাচ্ছে না। আর সব-চাইতে বিশ্রী হচ্ছে তার কথাবার্তা, যেমন অমার্জিত তেমনই ইম্‌পুডেণ্ট।

রাজা বাহাদুরকে বললাম, আপনার শরীরটা একবার আমি এগ্‌জামিন করব।

তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, এখানে যদি সুবিধে না হয়, বরং ও ঘরটাতে চলুন।

বললাম, ব্যস্ত হবেন না, এখানেই হতে পারবে। তবে তার সঙ্গে সঙ্গে আমি কিছু কিছু কোশ্চেনও আপনাকে করব তো। একা হ'লেই ভাল হ'ত।

কোশ্চেন করব ছাই, আসলে আমার মতলব হচ্ছে সে লোকটাকে সরিয়ে দেওয়া। সে কিন্তু তার ধার দিয়েও গেল না, বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে রইল। প্রফুল্ল বেরিয়ে গেল। আমি বললাম, আপনিও একটু কাইণ্ড্‌লি—

সে বেশ অমায়িকভাবে বললে, আমি থাকলে কিছু ক্ষতি হবে না।

আমার গা জ্ব'লে গেল। রাজা বাহাদুর সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, ও থাকলে আমার কোন অসুবিধে হবে না।

আমার রাগ চ'ড়ে গেল। বললাম, আমার হবে। এসব ব্যাপারে আমাদের কতকগুলো প্রফেশনাল কন্‌ভেন্‌শন থাকে।

রাজা বাহাদুর তার দিকে চেয়ে বললেন, তা হ'লে তুমি না হয়—

বলতে তিনি যেন ভারি সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন মনে হ'ল। ছোকরা

উঠে গটগট ক'রে বেরিয়ে গেল। এবং তারপরই শুনলাম, পাশের ঘরে সে প্রফুল্লকে বলছে, এসব হাম্‌বাগ জুটিয়ে আনেন কোথা থেকে? ওঃ, আমরাই যেন আর কখনও বড় ডাক্তার দেখি নি!

রাজা বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দেখলাম, ভদ্রলোক বিব্রত হচ্ছেন। তাই কথাটা যেন আমি শুনতে পাই নি, এমনি ভাব দেখিয়ে তাঁকে এগ্‌জামিন করতে লাগলাম। শেষ হ'লে দু-চারটে প্রশ্ন ক'রে বললাম, আপাতত আর কিছু আমার দরকার নেই। রাজা বাহাদুর ডেকে বললেন, প্রফুল্ল, এঁর হাতটা ধুইয়ে দাও। চাকর জল সাবান আর গামলা নিয়ে এল। ডাক্তারের প্রফেশনাল কন্‌ভেন্‌শন, রুগীকে ফোন ক'রে কথা বললেও হাত ধুতে হয়। হাত ধুয়ে বসলে রাজা বাহাদুর বললেন, বলুন এবারে আপনার মতামত।

বললাম, দেখুন, আমার অনেস্ট ওপিনিয়ন যদি চান, আপনার বিয়ে করা উচিত হয় নি।

রাজা বাহাদুরের মুখটা কেমন একটু মলিন হয়ে গেল। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, দেখুন, আপনি সব জানেন না, নেহাৎ দায়ে প'ড়েই আমাকে এই বয়সে আবার বিয়ে করতে হয়েছে। এ কথা সব বুড়োই বলে। আমি চুপ ক'রে রইলাম। রাজা বাহাদুর আবার একটু চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, শুনতে চান তো আপনাকে বলতে আমার বাধা নেই। আমার প্রথম স্ত্রী ছিলেন প্যারালিটিক। ছেলেপুলে তাঁর হবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তিনি বেঁচে থাকতে আবার বিয়ে করতেও আমি পারি নি। কাজেই এই বয়সে আমাকে বিয়ে করতে হয়েছে।

বুঝলাম, লোকটা নেহাৎ অপদার্থ নয়। একটু লজ্জাও পেলাম। বললাম, মাপ করবেন রাজা বাহাদুর, আমার কথাটা হয়তো একটু রূঢ়

হয়ে পড়েছে। কিন্তু কথাটা সত্যি। আপনার শরীর বাইরে সুস্থ হ'লেও তার কাঠামো শক্ত নয়।

রাজা বাহাদুর বললেন, অপারেশন তা হ'লে করা যাবে না?

বললাম, অপারেশনের কথা ব'লেই নয়। অপারেশন মেজর কেস হ'লেও খুব রিস্কি নয়, তার ধাক্কা সামলাতে হয়তো পারবেন, তাতে ফলও হবার কথা। কিন্তু আপনার জেনারেল হেল্‌থ যা, তাকে শুধু অপারেশন ক'রে সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়। সেইজন্যেই বলেছিলাম, আপনার এই বয়সে আবার বিয়ে করা উচিত হয় নি। অবশ্য অন্য কারণ যা আছে আপনি বললেন, সে আলাদা কথা।

রাজা বাহাদুর কিছু বলবার আগেই দোরের কাছ থেকে সেই ছেলেটা ব'লে উঠল, আচ্ছা, আপনার কাজ তো আপনি ক'রে যান, বিয়ের উচিত-অনুচিত সম্বন্ধে আপনার ওপিনিয়ন যখন চাওয়া হবে—

আমি বললাম, মাপ করবেন রাজা বাহাদুর, এর পরে আর আমি এখানে থাকতে পারি না।—ব'লে ঘর থেকে সোজা বেরিয়ে এলাম। প্রফুল্লও সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল। বাইরে গাড়ি তখনও দাঁড়িয়ে। আমাদের সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখেই সোফার গাড়ি স্টার্ট দিলে, কিন্তু আমি গাড়িতে না উঠে পাশ কাটিয়ে চ'লে আসতেই প্রফুল্ল আমার হাত ধ'রে বললে, ছি অর্ধেন্দু, সে হয় না। গাড়ি ক'রে না গেলে রাজা বাহাদুর ভয়ানক দুঃখ পাবেন।

আমি বললাম, Let him। তোমার তিনি মনিব হতে পারেন, কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর এমন কোনও অব্‌লিগেশনের সম্পর্ক নেই, যার জন্যে এর পরেও আমায় তাঁকে খুশি করবার জন্যে তাঁর গাড়িতে চড়তে হবে।

প্রফুল্ল বললে, সে কথা নয়। ও যাই বলুক, তুমিও বেশ জান,

কথাটা রাজা বাহাদুরের নয়। তিনি নিজে অতি ভদ্রলোক, সে তুমি নিজেই দেখেছ। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হবেন ব'লেই বলছি, তাঁকে খুশি করবার কথা আমি বলি নি। তা ছাড়া তুমি এমন ক'রে হেঁটে বেরিয়ে গেলে সোফার দরোয়ান পর্যন্ত একটা স্ক্যাণ্ডালের গন্ধ পাবে। আমার নিজের অনুরোধ রাখ, চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ভেবে দেখলাম, তার কথাটা মিথ্যে নয়। অগত্যা গাড়িতে উঠলাম। গাড়িতে দুজনেই চুপ ক'রে ব'সে রইলাম, সারাটা পথ আমাদের একটা কথাও হ'ল না। বাড়ির সামনে এসে নামতে প্রফুল্ল আমার পেছন পেছন নেমে পড়ল। বললে, অর্ধেন্দু, কিছু মনে ক'রো না ভাই, আমি জানতুম না এমন হবে। তোমাকে আমিই টেনে নিয়ে গিয়েছিলাম, তার জন্যে তোমার কাছে মাফ চাইছি।

আমারও তখন রাগের ঝোঁকটা ক'মে এসেছে, তার কথায় লজ্জা পেলাম। বললাম, চল একটু ব'সে যাবে। ঘরে এসে বললাম, ছেলেটা কে হে?

প্রফুল্ল বললে, আর ব'লো না ভাই। উনি হচ্ছেন রাজা বাহাদুরের এ পক্ষের শালা, রাণীজীর দাদা। গরিবের ছেলে হঠাৎ বড়লোকের বাড়িতে এসে জেঁকে বসেছে, ঝাঁজে আমরা অস্থির।

দেখলাম, প্রফুল্ল তার ওপর মোটেই প্রসন্ন নয়। বললে, বাড়িতে এক ঝাঁক পোষ্য, আর রাজা বাহাদুরের নিজের স্বভাবটি অতি চমৎকার। চাকর ব'লে কখনও মনে করেন না, নিজের খুড়ো-জ্যাঠার কাছে এর চাইতে বেশি স্নেহ পেতাম না। তাই স'য়ে যায়।

শুনলাম, শালাটি সব দিকেতেই চৌকস। বিদ্যে ম্যাট্রিকের এধারে পৌঁছয় নি, যত রাজ্যের বখামি ইয়ার্কি ক'রেই কাটত। এখন হঠাৎ বোনের কল্যাণে জবরদস্ত হয়ে বসেছে, তার তাড়ায় আর বেয়াড়ামিতে

বাড়িসুদ্ধ লোক অস্থির। কিছুদিন আগে এরই একটা কথায় অপমানিত হয়ে রাজা বাহাদুরের বহুকালের বিশ্বাসী ম্যানেজার পর্যন্ত চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চ'লে গেছেন।

বললাম, রাজা বাহাদুর বরদাস্ত করেন কেন?

প্রফুল্ল বললে, বোঝ না, তাঁর হয়েছে সাপের ছুঁচো ধরা, গিলতেও পারেন না, ওগরাতেও পারেন না। বৃদ্ধস্য তরুণীর সোদর ভাই, তাকে কিছু বললে ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি রাণীর কণ্ঠে উঠতে কতক্ষণ!

বললাম, তা হ'লে তো ভদ্রলোকের চটপট ম'রে যাওয়াই উচিত। আবার অপারেশন ক'রে কেঁচে তাজা হবার শখ কেন? দু ভাই-বোনে মিলে তাঁর দশা নিশ্চয়ই যা ক'রে তুলেছে, বাঁদরের থাইরয়েড কেন, কচ্ছপের হার্ট জুড়ে দিলেও ও জান টিকবার নয়।

প্রফুল্ল বললে, এবার ভুল করলে। রাণীজীর ভাইয়ের ওপর টান খুবই সত্যি, কিন্তু এমনিতে তাঁর মত মিষ্টি স্বভাব দেখা যায় না। ভাইয়ের দরুন তিনি যে কি লজ্জায় থাকেন, সে না দেখলে বুঝবে না।

বললাম, কি হে, কাব্য করছ যে!

বললে, কাব্য নয়। ম্যানেজারবাবু যেদিন চ'লে যান, রাণীজী নিজে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন, তার হয়ে আমি আপনার পায়ে ধ'রে মাপ চাইছি, আপনি যাবেন না। আমি যদি আপনার নিজের মেয়ে হয়ে জন্মাতুম, আপনি কক্ষনো এমন ক'রে পরের অপরাধে আমাকে শাস্তি দিতে পারতেন না। ম্যানেজারবাবু যাবার সময় কাঁদতে লাগলেন, বললেন, এর পরে আমার যাওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু আমি তিন সত্যি ক'রে ফেলেছি। তাঁকে কাঁদিয়ে গেলাম, এ দুঃখ আমি মরলেও ভুলতে পারব না। তোমরা আমার হয়ে তাঁকে ব'লো, আমি মনে কোনও

ক্ষোভ নিয়ে যাচ্ছি না। বুড়ো হয়েছি, এখন আমার কাশীবাসের সময়, তাই যাচ্ছি। সত্যি, তার দিন দুই পরেই তিনি কাশী চ'লে গেলেন।

প্রফুল্লর চোখ ছলছল ক'রে উঠল। বুঝলাম, এই ম্যানেজারবাবুকে সে সত্যিই ভালবাসে। রাণীজী নেহাৎ পরস্ত্রী, নইলে তাঁর ওপরেও ওর যা টান, ওকে ভাল ক'রে না জানলে, তার একটা সহজিয়া মতের ব্যাখ্যাও দিতে পারতাম, শুনতে মন্দ হ'ত না।

সুরুচি। আচ্ছা, আপনার কি চোখের পাতা ব'লে কিছু নেই? এমন সুন্দর সিচুয়েশনটার অমন ব্যাখ্যা করতে একটু বাধল না?

অর্ধেন্দু। উঁহু, বাধবে কিসের জন্যে? প্রথমত ডাক্তারদের চক্ষু-লজ্জা আর সেন্টিমেণ্ট দুটোরই দারুণ অভাব। দ্বিতীয়ত—

সুরুচি। চুপ। আপনার বক্তৃতা আমরা শুনতে চাই না। গল্প বলুন।

অর্ধেন্দু। আচ্ছা, গল্পই হোক। কিন্তু ব্যারিস্টার, দেখে রাখ, আমাকে ন্যায্য ডিফেন্স নিতে দিলে না।

প্রভাত। নেভার মাইণ্ড। মনুজ অ্যাক্ট অব হিন্দু ম্যারেজ অনুসারে ওর পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আমার ওপর ন্যস্ত আছে। তার জোরে আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি, আপনার বিরুদ্ধে এই অ্যালিগেশন নিয়ে আর বেশি নাড়াচাড়া করা হবে না, যদি আপনি আর তর্ক না ক'রে গল্পটা কণ্টিনিউ করেন।

অর্ধেন্দু। অগত্যা। প্রফুল্লকে বললাম, এতই যদি সবাই তাকে নিয়ে অস্থির, তাকে দেশে পাঠিয়ে দিলেই হয়।

প্রফুল্ল বললে, হয় না। হ'লে পাঠানো হ'ত। কিন্তু এক তো সোজাসুজি তাকে চ'লে যেতে বললে একটা যা চেঁচামেচি কোলাহলের সৃষ্টি হবে, সে দস্তুরমত স্ক্যাণ্ডাল। রাজ বাহাদুরের ওপরেও বাড়িতে ঘুঘুরা রয়েছেন না, যাঁদের নাম জ্ঞাতি-শরিক। তাঁদের ভয়

করতে হয়। আমাদের এমন রাণীজী, যাঁকে মা ছাড়া আর কিছু ব'লে ডাকতে কারও ইচ্ছেই হয় না, তাঁরও উইক স্পট আছে, তিনি ছোট ঘরের, মানে এদের তুলনায় গরিবের ঘরের মেয়ে। এর ওপর একটা স্ক্যাণ্ডাল হ'লে ঘরে বাইরে বহু জিব চঞ্চল হয়ে উঠবে। কাজেই বুঝতে পারছ, ছুঁচোটাকে রাজা বাহাদুর আর রাণীজী দুজনে মিলেই গিলেছেন। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, শ্রীযুত এখানে তবু সবার চোখের ওপর যা আছেন আছেন, এক রকম মানিয়ে যাচ্ছে। দেশের বাড়িতে তিনি হবেন একেশ্বর, এবং যা কেলেঙ্কারি ক'রে বেড়াবেন সে অনির্বচনীয়।

বললাম, তার মানে?

প্রফুল্ল বললে, মানে সরল। তিনি নিজেকে বলেন নবযুগের তরুণ, এবং তারুণ্যের লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর মতামত অতি আপ-টু-ডেট। পরকীয়ায় তাঁর অরুচি নেই এবং কার্যক্ষেত্রে জাঁত-বেজাতের সঙ্কীর্ণতাও তিনি মানেন না। জ্ঞাতিরা তার খোঁজ রাখছিলেন ব'লেই এঁকে এখানে এনে রাখা হয়েছে, এক কথায় নজরবন্দী।

বললাম, তা হ'লে সেই বন্দীটা আরও ভাল ক'রে রাখা উচিত, শেকল দিয়ে।

প্রফুল্ল বললে, আমাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু সেখানেও ওই ভূতের ভয়—স্ক্যাণ্ডাল। জ্ঞাতিদের কান তো ধামার মত পাতাই রয়েছে কিনা। যাক, এবারে উঠে পড়ি, অনেক ঘরোয়া কথা ফাঁস ক'রে গেলাম। কিন্তু ওই কথাটি মনে রেখো ভাই, আমাদের ওপর রাগ ক'রো না। আর যদি কিছু মনে না কর, আজকের ভিজিটের টাকাটা—

বললাম, বাড়াবাড়ি করেছ কি ঘুষি মেরে দোব। আমি গরিব মানি, কিন্তু আজকের টাকা আমি নোব না।

প্রফুল্ল সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, জোর করবার মত মুখ নেই, কিন্তু তাঁরা শুনে কতটা দুঃখ পাবেন, তুমি জান না।

বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে শুনলাম, প্রফুল্ল দু-তিন বার ফোনে আমার খোঁজ করেছে, এবং ব'লে রেখেছে, আমি ফিরলেই যেন তাকে খবর দেওয়া হয়, খুব জরুরি দরকার। জরুরি এমন কি থাকতে পারে ভেবে পেলাম না। ফোনে তাকে ডাকতেই সে সাড়া দিলে, সেই দুপুর থেকে তোমার ডাকের ভরসায় ব'সে আছি ভাই। তুমি এখন আবার বেরুচ্ছ না তো ?

বললাম, অন্তত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নয়। কেন ?

সে বললে, খানিক পরে বলছি, ধর মিনিট পনরো।

ব্যাপারটা বুঝলাম না। কিন্তু বুঝতে দেরিও হ'ল না, যখন মিনিট দশ-বারোর মধ্যেই প্রফুল্ল সশরীরে এসে আমার ড্রইং-রুমের দোরে হাজির হ'ল এবং আমি কোন কথা বলবার আগেই ব'লে বসল, একটু রাস্তার ওপর আসতে হচ্ছে ভাই, ওঁরা গাড়িতে ব'সে।

ওঁরা কারা ?

রাজা বাহাদুর আর রাণীজী।

সে কি ! তাড়াতাড়ি নেমে গাড়ির কাছে এগিয়ে যেতেই, রাজা বাহাদুর রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়ে ছিলেন, দু হাত জোড় ক'রে বললেন, সকালবেলার ব্যাপারের জন্যে আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে রয়েছি; আপনার কাছে মাফ চাইতে এলাম।

বললাম, ছি ছি, ও কি করছেন, আপনি আমার গুরুজনের সমান !

রাজা বাহাদুর বললেন, তা হোক, তখন আপনি আমার বাড়িতে অভ্যাগত ছিলেন। বলুন, মাফ করলেন ?

বললাম, মাফ করা-করির কি আছে এতে ? তবু বিশ্বাস করুন,

আমার কোন নালিশ আর নেই। সকালবেলাই প্রফুল্লর কাছে আমি সব শুনেছি।

রাজা বাহাদুর বললেন, প্রফুল্লর! আপনাদের আগেকার জানা-শোনা ছিল নাকি?

প্রফুল্ল বললে, আমরা কলেজে একসঙ্গে পড়েছি।

রাজা বাহাদুর বললেন, আর সে কথা তুমি এই সারাদিনের ভেতর আমাকে বল নি! যাক, ডাক্তার যখন প্রফুল্লর বন্ধু, তখন তো—

বললাম, স্বচ্ছন্দে নাম ধ'রে ডাকতে পারেন, আমি একটুও রাগ করব না। তবে আমারও কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে, কষ্ট স'য়ে এতদূর যখন এসেছেন, তখন একবার গরিবের দোরে—

রাজা বাহাদুর বললেন, হাতীর পা? নিশ্চয় পড়বে, চার পা এক-সঙ্গেই পড়বে, চিন্তা ক'রো না। তা হ'লে হস্তিনীটিকেও তো ডেকে নিতে হয়।—ব'লে তিনি গাড়ির দিকে একটু এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির দোর খুলে রাণীজী নেমে পড়লেন। বছর একুশ-বাইশ হবে বয়স, পাতলা ছিপছিপে চেহারা। সৌন্দর্য-বর্ণনায় আমি দক্ষ নই, কিন্তু এঁর চেহারাটা কবির ভাষায় বর্ণনা করবার মত। সুনীতি তাঁকে দেখেছে; প্রভাত, তাঁকে দেখে যদি অনেস্ট্‌লি বর্ণনা করতে, তা হ'লে সুরুচির চ'টে যাবার কথা হ'ত। সুন্দর শান্ত মুখে ভাসা ভাসা বড় দুটি চোখ, কপালের ওপর একটুখানি ঘোমটা টানা। গাড়ি থেকে নামতে নামতে চকিতে রাজা বাহাদুরের দিকে চেয়ে, অতি সুন্দর একটু ভ্রূভঙ্গী ক'রে ফিসফিস ক'রে বললেন, আঃ, যত বুড়ো হচ্ছ—! তারপর কোনও সঙ্কোচ না ক'রে সামনে এসে নমস্কার ক'রে বললেন, আমাকেও মাফ করলেন তো?

আমি ঠিক কি জবাব দিলাম বলতে পারব না, এ কথাটা সত্যের

খাতিরে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ সেই মুহূর্তটির জন্যে আমার কথা বলবার শক্তি যেন হারিয়ে গেল। আমার সমস্ত অন্তর ভ'রে তখন যার সাড়া পাচ্ছিলাম, সে হচ্ছে একটি অতি অকৃত্রিম ও বিপুল দীর্ঘশ্বাস। মনে মনে বললাম, হায় রে, সুনীতি যদি আমাকে অমন ক'রে ভুরু কুঁচকে বুড়ো বলতে জানত!

সুনীতি। তুমি বুড়ো হও, তখন দেখো বলতে জানব।

অর্ধেন্দু। তেমন ক'রে বলতে পারবে না। এই তো আধ-বুড়ো হয়েছি, ও বেয়াল্লিশও যা পঞ্চান্নও তাই। কই, বল তো তার অর্ধেকও মিষ্টি ক'রে, কেমন পার একটা টেস্ট হয়ে যাক।

প্রভাত। আঃ, digressing again।

অর্ধেন্দু। অস্থির হ'য়ো না হে আইনজ্ঞ। শুকনো রেলের ওপর কলের গাড়ি চলতে পারে, গল্প চলে না। রস জমাতে হ'লে তার জন্যে অবসরের ইণ্টারস্পেস চাই। তুমি কোর্টে স্পীচ দিতে দিতে বার বার চশমা মোছ না?

সুরুচি। আঃ, একটু ফুরসৎ মিলেছে কি অমনি—

অর্ধেন্দু। মেয়েদের মত খচখচি বাধিয়ে দিয়েছে। যাক, শোন। গরিবের দোরে হাতীর পা বেশ গভীর ক'রেই পড়ল। রাণীজী সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে গিয়ে সুনীতিকে আক্রমণ ও দখল করলেন। এদিকে রাজা বাহাদুর অনেক বার অনেক রকম ক'রে প্রশ্ন ক'রে আমি যে তাঁদের ওপর রাগ ক'রে নেই, তার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে নিলেন; এবং তারপর আর একবার ধ'রে পড়লেন, তাঁর অপারেশন আমাকেই করতে হবে, নইলে তাঁর বিশ্বাস হবে না যে, আমার রাগ সত্যিই ভেঙেছে। শেষ পর্যন্ত আমাকেও স্বীকার করতেই হ'ল।

তাঁরা চ'লে যাবার পর সুনীতি মতপ্রকাশ করলে, তার বিবেচনায়

অপারেশনটা আমার অবিলম্বে এবং বিনা অবহেলায় ক'রে দেওয়া উচিত। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার হঠাৎ এত উৎসাহ? সুনীতি বললে, রাণীটিকে দেখলে তো কি চমৎকার মেয়ে! কপালদোষে বুড়োর হাতে পড়েছে, বুড়ো তো যেদিন খুশি ম'রে যাবে, ওর দশাটা কি হবে বুঝতে পারছ? একটা ছেলে যদি থাকে, তবু তাকে নিয়ে বাঁচবে। কোলে একটা ছেলে না থাকলে মেয়েমানুষের—। সুনীতি হঠাৎ চুপ ক'রে গেল। উপস্থিত কারও যদি মনে না থাকে, আমি লাঙ্গুলহীনা শৃগালিনীর গল্পটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এবং এই সঙ্গে সাইকো-ফিলজফির কিঞ্চিৎ কোটেশন দিয়ে প্রমাণ ক'রে দিতে রাজি আছি যে, সুনীতির চোখ ঈষৎ কটমট করিয়া উঠিতেছে বিধায় এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইল।

গেল সেদিন। পরদিন প্রফুল্ল আবার ফোন করলে, কাল একবার আসতে হবে। পরদিন ওদিকে আমার নিজেরও একটু কাজ ছিল। ভোরে বেরিয়ে সেখান হয়ে সাড়ে আটটা আন্দাজ রাজবাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। কার্ড পেয়ে প্রফুল্লকে নিয়ে রাজা বাহাদুর মহা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন, বললেন, তুমি কার্ড পাঠালে, বঙ্কু কই?

বঙ্কু তাঁর সেই প্রাইজ শালাটির নাম। বললাম, তার মানে?

তিনি বললেন, সে তোমার সঙ্গে আসে নি?

আমি আরও আশ্চর্য হয়ে বললাম, আমার সঙ্গে আসবেন মানে?

প্রফুল্ল বললে, তুমি এলে কিসে?

বললাম, আমার গাড়িতে।

সে বললে, ও, তা হ'লে তোমাকে তিনি মিস করেছেন। আমি হঠাৎ কাজে আটকা পড়েছিলাম ব'লে তাঁকে গাড়ি দিয়ে পাঠানো হয়েছে তোমাকে নিয়ে আসবার জন্যে। তুমি এখানে আসবে, সে কথা বাড়িতে ব'লে এসেছ?

বললাম, ঠিক ব'লে আসি নি, তবে তারা আন্দাজে বলতে পারবে হয়তো।

রাজা বাহাদুর বললেন, তা হ'লে হয়তো ব'সে ওয়েট করছে। প্রফুল্ল একবার ফোন ক'রে দেখ, ওখানে যদি থাকে তো চ'লে আসতে ব'লে দাও। তারপর আমাকে বললেন, আজ যে জন্যে ডেকেছি, অপারেশনটার সম্বন্ধে কথাবার্তা শেষ ক'রে ফেলা যাক। আমি ওটা যত শিগগির সম্ভব করাতে চাই। মাস দুয়েকের মধ্যে আমাকে একবার দেশে যেতে হবে, কদ্দিন থাকতে হবে কিছু ঠিক নেই। যাবার আগেই ওটা করিয়ে ফেলা আমার ইচ্ছে।

বললাম, দেরি তো আর কিছুর জন্যে নয়, কথা হচ্ছে গ্ল্যাণ্ডটা যোগাড় করা। মানে অ্যানথ্রোপয়েড এপের সংখ্যা খুব বেশি নয়, তাই গ্ল্যাণ্ড যোগাড় করাটা পয়সাসাপেক্ষ তো বটেই, অনেক সময় দেরিসাপেক্ষও। তা আমি আজই জার্মানির দু-একটা ফার্মে চিঠি লিখে দিচ্ছি।

রাজা বাহাদুর বললেন, চিঠি নয়, কেব্‌ল কর, পয়সার তো আর টানাটানি নেই। কেব্‌ল করলে কবেতক জবাব পাওয়া যাবে?

বললাম, দিন তিনেক। আর জিনিস যদি মজুত থাকে, তবে এসে পৌঁছতে ধরুন দেড় কি দু হপ্তা।

রাজা বাহাদুর বললেন, অপারেশন এখানেই হবে তো?

বললাম, হ'তে পারে, তবে মেডিক্যাল কলেজে যদি আসেন, তবেই ভাল হয়। একটা মেজর অপারেশন, তার ওপর আপনার বয়স হয়েছে। ওখানে যা কিছু দরকার সব হাতের কাছে পাওয়া যাবে।

তিনি বললেন, বেশ, তাই হবে।

তারপর অপারেশন সম্বন্ধে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা ব'লে বললাম, তা হ'লে এবার আমি উঠি।

প্রফুল্ল বললে, চল, তোমাকে এগিয়ে দিই।

রাজা বাহাদুর বললেন, বঙ্কু ফিরেছে? তাকে ডাক।

বঙ্কু আসতেই রাজা বাহাদুর বললেন, এঁর কাছে মাফ চাও।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না না, সে কি!

রাজা বাহাদুর বললেন, সে কি নয়। চাইতেই হবে। চাও বলছি মাফ।

বঙ্কু ঘাড় গোঁজ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। মাফ সে মুখ ফুটে চাইবে না, জানা কথা। অথচ তখন না চাইবার মানে আমার মাথাটা আরও ভাল ক'রে কাটা যাওয়া। কাজেই খুব সাত্ত্বিকভাবে সার্মন দিয়ে বললাম, আপনি মিথ্যে একটা সীন ক্রিয়েট করছেন রাজা বাহাদুর। আমি রাগ ক'রে নেই, আপনাকে বলেছি। তার ওপর, উনি বয়সে আমার চাইতে ঢের ছোট। যদিই কিছু অন্যায় ক'রে ফেলে থাকেন, সে যা হবার হয়ে চুকে-বুকে গেছে, তাকে খুঁচিয়ে তোলবার দরকার নেই।—ব'লে চট ক'রে বেরিয়ে এলাম।

বাড়ি ফিরে দেখি—অগ্নিকাণ্ড। সুনীতি রেগে ফুলে যা হয়ে রয়েছে, একেবারে পাকা টম্যাটো। কি বার্তা? নিশ্চয়ই সেই নথের অর্ডার দিতে ভুলে গেছি ব'লে। নিজে থেকেই ঘাট স্বীকার ক'রে বললাম, দেবি, প্রসীদ, এক্ষুনি অক্ষয় নন্দীকে ফোন করছি। সুনীতি বললে, নথ-টথ নয়, আরও গুরুতর ব্যাপার। বললাম, তবে নিশ্চয়ই চন্দ্রহার। কিন্তু তার অর্ডার তো দেওয়া হয়েই যাচ্ছিল, শুধু যদি না—। সুনীতি চ'টে বললে, চুলোয় যাক চন্দ্রহার। এদিকে মানসম্ভ্রম নিয়ে টানাটানি, আর তুমি করছ ইয়াকি।—ব'লে চোখে আঁচল দিলে।

অর্ধেন্দু নিবে-যাওয়া চুরুটটা ফের ধরিয়ে নিয়ে চিত হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে খুব দম ভ'রে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

সুরুচি বললেন, তারপরে?

অর্ধেন্দু চুরুটে আরেকটা জোর টান দিয়ে বললেন, দাঁড়াও, আগে মন ঠাণ্ডা হোক।

প্রভাত বললেন, হয়েছে, বলুন।

অর্ধেন্দু। বাপ রে বাপ, বউয়ের সঙ্গে কথা কইতে দেবে না, চুরুট খেতে দেবে না, এ তো আচ্ছা মাস্টার-মাস্টারনীর পাল্লায় পড়লাম দেখছি। এমন জানলে আমি গল্প বলতেই বসতাম না।

প্রভাত। 'If যদি be হয়' থাক্। এখন বাকিটা না বললে ব্রীচ অব কণ্ট্রাক্ট।

অর্ধেন্দু। আর এদিকে যে ব্রীচ অব কণ্ট্যাক্ট হয়ে যাচ্ছিল। শালীর চাইতে চুরুটের সঙ্গে খাতির বজায় রাখবার তাড়া তুমি কম মনে কর? বিশেষত যখন সেই শালীর বয়স পঁচিশ পেরিয়ে—

সুরুচি। ফের!

অর্ধেন্দু। আইগা না। যাক, কান্না-টান্না থামতে সুনীতিকে জিজ্ঞেস করলাম—

সুনীতি। হ্যাঁ, কেঁদেছিল বইকি!

অর্ধেন্দু। আচ্ছা, না কেঁদে থাক, নেই নেই। তারপর কান্না না থামতে সুনীতিকে—। দেখলে গো, সেরে নিয়েছি কিন্তু। হ্যাঁ, সুনীতিকে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে? সুনীতি বললে, সেই কে একটা লোক এসেছিল, মানে বঙ্কু, তাকে ভয়ানক অপমান ক'রে গেছে। তার যদি অবিলম্বে তীব্র প্রতিকার না করি, তবে তার সঙ্গে আমার এই জন্মের মত বিচ্ছেদ, জীবনে আর কক্ষনো সে আমার রুমালে ফুল তুলে দেবে না। কি ব্যাপার? না, বঙ্কু যখন আসে, সুনীতি তখন ড্রইং-রুমে ব'সে খুব নিবিষ্টচিত্তে ক্যাটালগ খুলে পেরাম্বুলেটারের মডেল পছন্দ

করছে—না না, চ'টো না, আই মীন লাল উলের ছোট্ট সোয়েটার বোনবার জন্যে উলের ডিজাইন পছন্দ করছে। বন্ধু বোধ হয় বাইরে দরোয়ান বরকন্দাজ কারও সাড়া পায় নি, সে এসে সোজা ঘরে ঢুকেছে এবং তারপর হাঁ ক'রে সুনীতির দিকে কি রকম ক'রে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কি রকম ক'রে সে তাকিয়েছিল, অবিশ্যি খুব ভাল বুঝলাম না, কারণ আমার দিকে কেউ কখনও কি রকম ক'রে তাকিয়েছে ব'লে মনে পড়ে না। তবে সুনীতির কথা থেকে বোঝা গেল, সে তাকানোর রকমটা ভাল নয়, মানে সুনীতির পছন্দ হয় নি। তারপর যখন সুনীতি পেছন ফিরে তাকে দেখতে পেয়েছে, তখনও সে একটুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নি; যতক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলেছে, সারাক্ষণই তার মুখের ওপর, গলার ওপর এট্‌সেট্‌রা চোখ ফিক্স ক'রে বলেছে। সুনীতির মতে সেটা তার আত্মার ভালত্বের পরিচায়ক নয়। অতএব অবিলম্বে সেই দুরাত্মার শাস্তিবিধান করা চাই।

জ্বালিয়ে তুললে। এদিকে আমার পয়সার অভাব, ওদিকে টাকা আয়ের পথে এই হতভাগাটা বার বার ক'রে জঞ্জাল সৃষ্টি করেছে। সুনীতি তো যা কান্না শুরু ক'রে দিয়েছে, ঘরে প্লাবন হয় আর কি! প্রভাত, সেই যে গেলবারে সঙ্গে টাকা নেই ব'লে বড় হীরে বসানো ব্রোচটা নিতে পারলে না, একটু ছোট সাইজের একটা ব্রোচ কিনে নিয়ে গেলে, তখনও সুরুচি অত কাঁদতে পারে নি।

সুরুচি বললে, কবে আবার আমি—

অর্ধেন্দু অন্যমনস্কভাবে বাঁ হাতটা একটু তুলে বললেন, আঃ, তর্ক ক'রে রসভঙ্গ ক'রো না, আমি এখন ক্রমেই উত্তেজিত হচ্ছি। হতে হতে শেষে একসময় আমি দস্তুরমত চ'টে গিয়ে স্থির ক'রে ফেললাম, এর একটা হেস্তনেস্ত করবই, তাতে যদি ক্লায়েন্ট হাতছাড়া হয়ে গিয়ে

নথটা এ যাত্রা কেনা নাও হয়, সো-ভী আচ্ছা। আমি গরম হয়ে উঠতেই তার আঁচে সুনীতির চোখের জল চট ক'রে বাষ্প হয়ে উবে গেল। বর্ষাণশ্রান্ত আষাঢ়-রাত্রির অবসানে সদ্য-ধোওয়া কচি ঘাসের ওপরে প্রথম রোদের ঝলকানির মত তার সমস্ত মুখ খুশিতে এমনই ঝকমক ক'রে উঠল যে, আমার তখনকার মত মনেই রইল না, নাক খাঁদা ব'লে তার দু-দুবার বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল।

সুনীতি। আঃ!

অর্ধেন্দু। গোল ক'রো না। আমি ইদানীং পরিশ্রান্ত, এক নিঃশ্বাসে অনেকখানি কাব্য ক'রে ফেলেছি। তারপর চ'টে গিয়ে দুম ক'রে ফোন তুলে নিলাম। লালবাজার নয়, প্রফুল্ল। তাকে বললাম, শিগগির এস।

প্রফুল্ল এলে তাকে বন্ধুর কীর্তি বললাম। সে বললে, আর ব'লো না ভাই। বুঝলে তো কি চীজ! আমরা চব্বিশ ঘণ্টা দেখছি। রাণীজী নিজে তার সামনে গায়ের চাদর খোলেন না।

বললাম, কিন্তু আমি এ স'য়ে যাচ্ছি না, ওর বাঁদরামো আমি ঘোচাব।

প্রফুল্ল বললে, সে যদি পার ভাই, তো আমরাও বেঁচে যাই—রাজা বাহাদুর রাণীজী সুদ্ধু। কিন্তু একটি কথা, মামলা করলে তাঁরা বড় লজ্জায় পড়বেন।

আমি বললাম, সে ইচ্ছে আমার নেই, থাকলে তোমাকে ডাকতাম না। ঘরের কেচ্ছা নিয়ে কোর্টে যাওয়া আমার পক্ষেও প্যালেটেব্‌ল নয়। দাঁড়াও, সুনীতিকে ডাকি।

তারপর তিনজনে মিলে আমাদের ঘোরতর ওআর-কাউন্সিল বসল। প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে অত্যন্ত গোপন পরামর্শের পরে স্থির হ'ল, বন্ধুকে

কেসে ফেলা চলবে না, রাজা বাহাদুরকেও বলা হবে না। গুণ্ডা লাগানো চলে কি না, তার আলোচনা শেষ হয়ে ভোটে 'না' খাড়া হতে সাড়ে দশটা বেজে গেল। তার পরের প্রস্তাব ছিল, তাকে নিজেই চাবকে দেওয়া। কিন্তু এগারোটায় আমার একটা এক্সপেরিমেণ্টের ফল জানতে যাবার কথা। প্রফুল্লকে বললাম, আপাতত তা হ'লে ও আলোচনাটা মুলতুবি থাক্, বেলা হয়ে গেল। সোফারকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, প্রফুল্লই আমাকে ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে নামিয়ে দিয়ে গেল।

সেদিনটা ছিল বুধবার। বিষ্যুৎ গেল, শুক্কুর গেল, শনিও যায়, চাবুক আর কেনা হয় না। সুনীতি ঝনঝন ক'রে হাতের চুড়িগুলো খুলে দিয়ে বললে, এই নাও, বিক্রি ক'রে যাও চাবুক নিয়ে এস। আমি বললাম, একটু র'স, আর একবার ভেবে দেখি, চাবুক আর্মস-অ্যাক্টে পড়ে কি না। সুনীতি রেগে বললে, আর্ম্ তো অমনিই দুটো দু পাশে ঝুলছে, ওগুলোকেও তা হ'লে কেটে ফেলে দিলেই তো হয়, জামা করতে কাপড়ও কম লাগত। যতই বুঝিয়ে বলি, কথাটা নেহাৎই মেয়েমানুষের মত বলা হ'ল, আর্ম্ কাটা গেলে তখন জানা যাবে তার সঙ্গে আরও কত কি গেল, এবং সে অভাব শুধু আমিই নয়, তিনিও আমার চাইতে কম ফীল করবেন না—কে সে কথা কানে তোলে! সে বলে, হাতে চাবুক না থাকলে পুরুষমানুষের হাত থাকবার কোন মানেই হয় না, ঠিক যেমন সোনার চুড়ি হাতে না থাকলে মেয়েদের হাত থাকা না-থাকারই সামিল। এর পরে বুঝতেই পার, আমার তরফ থেকে একমাত্র লজিকাল উত্তর হচ্ছে যে, তাই যদি তার ধারণা হয়, তবে সুনীতির উচিত অবিলম্বে আমাকে ডাইভোর্স করা এবং খুব ভাল দেখে একটি গাড়োয়ানকে বিয়ে করা। কিন্তু ততদূর এগোবার আগেই একটা ব্যাপার ঘ'টে গেল, যা আশ্চর্য এবং অভিনব।

অর্ধেন্দু আর একটা চুরুট ধরালেন। ধীরে ধীরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, সোমবার খুব ভোরবেলা প্রফুল্ল এসে হাজির হ'ল। শেষ রাত্তির থেকে বঙ্কুর হঠাৎ গলা ফুলে উঠেছে, ভয়ানক পেন, আমাকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে। পুনশ্চ সংবাদ, বঙ্কু নিজে বার বার ক'রে ব'লে দিয়েছে, আমাকে যেতেই হবে, আমাকে না দেখতে পেলে সে আর কিছুতেই বাঁচবে না স্থির করেছে। তার কোনও অপরাধ যেন আমি মনে না রাখি।

চটপট ওভারকোট চড়িয়ে গাড়িতে চেপে বসলাম। শোবার ঘরে টেবিলে দেশলাই ছিল, সুনীতি তার ওপরকার কালীর ছবিটার দিকে খুব ভক্তিভরে খানিক চেয়ে থেকে, তারপর আশেপাশে কেউ কোথাও নেই দেখে নিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম জানিয়ে মনে মনে বললে, ভগবান, তুমি নিশ্চয় আছ।

সুনীতি বললে, হুঁ। তুমি জানলে কি ক'রে?

অর্ধেন্দু বললেন, মনে নেই, শালগ্রাম নুড়ি সামনে রেখে বলেছিলে, যদেতৎ মে হৃদয়ং?

সুনীতি রেগে বললেন, কক্ষনো বলি নি। আমার ব'লে তখন ঘুমে দু চোখ ভেঙে আসছে—

অর্ধেন্দু। আরে চুপ চুপ, রাগের মাথায় বেফাঁস কথা ব'লে ফেলতে নেই। ব্যারিস্টারকে জিজ্ঞেস কর, এক্ষুনি ব'লে দেবে, চীটিং কেস, বড় শক্ত মকদ্দমা।

প্রভাত। আঃ, কি শুরু করলেন দুজনে! ডক্টর, continue please, মানে ঝগড়া নয়—গল্পটা।

অর্ধেন্দু। বলি। রাজবাড়িতে গিয়ে দেখি, বঙ্কু শয়ান, গলায় কম্ফর্টার জড়ানো। কণ্ঠার দু পাশ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। ব্যথা

আছে, একটু জ্বরও হয়েছে। ব্যথাটা তখন পর্যন্ত খুব বেশি ব'লে মনে হ'ল না; কিন্তু যতটুকু হয়েছে এবং আরও যতখানি হবে ব'লে তার ধারণা হয়েছে, এই দুইয়ে মিলে বন্ধুকে একেবারে জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান বানিয়ে দিয়েছে। হাউমাউ ক'রে বললে, ডাক্তারবাবু, আমি ম'রে গেলাম।

ধমক দিয়ে বললাম, সে যখন মরবেন তখনকার কথা। এখন চুপ করুন, দেখতে দিন।

দেখা শেষ হ'লে রাজা বাহাদুর বললেন, কি দেখলেন?

বললাম, অ্যাকিউট টাইপের টিউমার হয়েছে। কাটাতে হবে।

রাজা বাহাদুর বললেন, টাইপটা কি রকম?

বললাম, খুব মাইল্ড হবার তো কথা নয়, এক রাত্রের মধ্যে যখন এতটা হয়েছে। কাল কিছু টের পান নি?

বন্ধু কেঁদে উঠল, কিচ্ছু না। আমাকে বাঁচান।

বললাম, এক্ষুনি মরবার আপনার কিছু হয় নি। উঠে রেডি হয়ে নিন। অপারেশন আজই করতে হবে, আরও বাড়বার আগে। প্রফুল্লকে বললাম, দেরি না ক'রে মেডিক্যাল কলেজে পাঠাবার বন্দোবস্ত ক'রে দাও। আমি তাদের ফোন করছি। বন্ধু আবার হাউমাউ ক'রে উঠল—ওরে বাবা রে, গলা কাটলে আমি ম'রে যাব। আমি ওখান থেকেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলাম।

এগারোটার মধ্যে অপারেশন হয়ে গেল। প্রফুল্লকে তার কাছে রেখে নার্স-টার্সের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে বারোটা আন্দাজ বাড়ি ফিরলাম। সুনীতিকে বললাম, বেচারী যা কান্নাকাটি করছিল, তার ওপর কেমন মায়া প'ড়ে গেল। তায় ডাক্তারের প্রফেশনাল কন্‌ভেন্‌শন আছে, রুগীর ওপর রাগ রাখতে নেই। তাকে একেবারে মাফ ক'রে

ফেলেছি। সুনীতির মুখটা ঠিক 'পরের দুঃখে দুঃখিত হও'-গোছের দেখতে হ'ল না।

বিকেলে গিয়ে দেখলাম, বন্ধু ভালই আছে। রাজা বাহাদুর আর রাণীজী তাকে তখন দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁরা খুব একচোট ধন্যবাদ জানালেন। আমি বললাম, আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ভালই হ'ল। খবর আছে।

রাজা বাহাদুর বললেন, কি, জবাব পেয়েছেন?

বললাম, শুধু জবাব নয়, একেবারে জিনিসই পেয়ে গেছি এখানে একজনের কাছে। আর এক ভদ্রলোক নিজের দরকারে আনিয়েছিলেন, তাঁর কাজে লাগবে না। তাঁরও সুরাহা হয়ে গেল, আমারও।

রাজা বাহাদুর বললেন, তা হ'লে অপারেশনটা কবে করতে চান?

বললাম, কালই। দেরি ক'রে লাভ নেই।

রাণীজীর মুখ মলিন হয়ে গেল। বললেন, একসঙ্গে দুজনই!

তাঁকে সাহস দিয়ে বললাম, তাতে আর কি হয়েছে? ওঁরা শিগগিরই সেরে উঠবেন তো। আর আপনি যখন খুশি এসে দেখে যাবেন, আমি বন্দোবস্ত ক'রে দোব।

তাই হ'ল। পরদিন রাজা বাহাদুরের অপারেশন করলাম। দিন দশেকের ভেতর দুজনে সেরে উঠে বাড়ি চ'লে গেলেন।

অর্ধেন্দু পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে চুরুট টানতে লাগলেন।

সুরুচি বললেন, তারপর?

অর্ধেন্দু বললেন, তারপর আর নেই। বছর দুই পরে সুনীতিকে সঙ্গে ক'রে গিয়ে অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি। And they

have been blessed with the brightest boy I have ever seen, মানে আমার ছেলেপিলে ছাড়া।

তপেন বললে, আর সেই বন্ধু?

অর্ধেন্দু বললেন, বর্তমান খবর জানি না, অন্নপ্রাশনের সময় শেষ দেখেছি। দারুণ মোটা হয়েছে, আর স্বভাবটা একদম বদলে গেছে। এখন সে অত্যন্ত শান্তশিষ্ট লোক। আমাকে যে ভক্তিশ্রদ্ধাটা দেখালে, সুনীতি পর্যন্ত ঈর্ষান্বিতা। প্রফুল্লকে বললাম, ভারি বাধ্য হয়ে পড়েছে তো হে! কত লোকেরই তো হাত পা গলা কাটি, এমন ভক্ত রুগী আর কখনও পাই নি।

প্রফুল্ল বললে, শুধু তুমি ব'লে নয়, ওর স্বভাবটাই এখন ওই রকম হয়ে গেছে। আগের আর কিছু বাকি নেই। রাণীজী কালীঘাটে জোড়া মোষ দিয়েছেন।

অর্ধেন্দু উঠে দাঁড়ালেন, আর নয়—রাত ঢের হ'ল।

সুরুচি বললেন, এটা একটা গল্প হ'ল? মিথ্যে খানিক বাজে বকুনি শোনালেন।

অর্ধেন্দু বললেন, কি করব। আমি তো বলেছিলাম, গল্প বলতে পারি না। আমার কাজ ছুরি ছোরা নিয়ে; আমি কি ব্যারিস্টার যে, অনর্গল সুসজ্জিত রোমাঞ্চকর মিথ্যে ব'লে যাব!

সুরুচি ঠোঁট ফুলিয়ে বললেন, যান যান, আর ইয়াকি করতে হবে না। যত সব বাজে কথা ব'লে রাত জাগালেন।

অর্ধেন্দু নিঃশব্দে চাদরটা তুলে কাঁধে ফেললেন।

সুরুচি আপীল করলেন, দেখ তো দিদি, এতে রাগ হয় না?

সুনীতি স্মিতমুখে বললেন, হয়, কিন্তু হওয়া উচিত নয়।

প্রভাত বললেন, আপনি তো ওঁর হয়ে বলবেনই। কেন উচিত নয়, শুনতে পাই ?

সুনীতি বললেন, পান। গল্পটার সবটা আপনারা শোনেন নি। একটুখানি বাকি আছে।

তপেন সুরুচি প্রভাত কোরাসে বললেন, কি ?

সুনীতি বললেন, অ্যান্‌থ্রোপয়েড গ্ল্যাণ্ড পাওয়া যায় নি। রাজা বাহাদুরের অপারেশন হয়েছিল বন্ধুর থাইরয়েড নিয়ে।

সুরুচি প্রভাত তপেন। তার মানে ?

অর্ধেন্দু। সুনীতি, তুমি ডায়েরি পড় না বলেছ।

সুনীতি। পড়ি না, তুমিই বলেছ। কিন্তু এও বলেছ যে, শুনি, এবং কাজেই ইচ্ছে করলে বলতেও পারি, কারণ আমার প্রফেশনাল ভাউ নেই।

তপেন সুরুচি। দিদি, বল।

প্রভাত। বলুন।

সুনীতি। ওঁর প্ল্যানমত প্রফুল্লবাবু বন্ধুকে একটা ব্যাক্‌টিরিয়া অ্যাড্‌মিনিস্টার ক'রে দেন। তাই তার থাইরয়েড ফুলে উঠেছিল। উনি অপারেশন ক'রে তার থাইরয়েড বার ক'রে নেন এবং সেইটাকেই পরিষ্কার ক'রে নিয়ে রাজা বাহাদুরের শরীরে বসিয়ে দেন।

সুরুচি উত্তেজিতভাবে বললেন, অর্ধেন্দুবাবু, সত্যি ?

অর্ধেন্দু উদারভাবে বললেন, নিজের মুখে কিছু স্বীকার করা প্রফেশনাল কন্‌ভেন্‌শনের বহির্ভূত। স্ত্রী যা খুশি বলুক, সেটা আদালতে গ্রাহ্য নয়, কারণ বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, মেয়েরা স্বামীর কীর্তিকাহিনী বাড়িয়ে বলতে গিয়ে এমন অনেক কিছু বলে, যা তাদের বোনরা বা ভগ্নীপতিরা বিশ্বাস করলেও অন্য লোকে করবে না।

সুরুচি। হেঁয়ালি নয়, সত্যি বলুন।

অর্ধেন্দু। ভদ্রে, ভ্রূকুটি করলেই তৎক্ষণাৎ ভড়কে গিয়ে একটা যা তা খারাপ কথা স্বীকার ক'রে ফেলব, সে বয়স আমার আর নেই।

প্রভাত। আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

অর্ধেন্দু। If it does not trap me.

প্রভাত। না, অতি অ্যাকাডেমিক প্রশ্ন। মানুষের গ্ল্যাণ্ড নিয়ে অপারেশন হয়?

অর্ধেন্দু। অ্যাকাডেমিকালি বলতে পারি, না হবার কোন কারণ নেই। বরং মানুষের গ্ল্যাণ্ডই মানুষের পক্ষে সব-চাইতে সুটেড। মানুষের পাওয়া যায় না ব'লেই বাঁদরের গ্ল্যাণ্ড নিতে হয়। আর সে বাঁদর জাতে মানুষের যত কাছকাছি হয় ততই ভাল।

তপেন। আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?

অর্ধেন্দু। Oh yes, you are a student.

তপেন। কি ব্যাক্টিরিয়া ব্যবহার করেছিলেন?

সুনীতি। Staphylococcus।

তপেন। কিন্তু তাকে না জানিয়ে ইন্‌জেক্ট করলেন কি ক'রে?

অর্ধেন্দু। তুমি কলেজ ছেড়ে দাও। এইটুকু জ্ঞান নেই যে ডিজীজ্‌ড গ্ল্যাণ্ড নিয়ে অপারেশন হয় না, তোমার কিচ্ছু হবে না।

তপেন। তবে?

অর্ধেন্দু। ইয়ংম্যান, আরও বয়স হোক, তখন জানবে, স্ত্রীকে প্রসন্ন করবার জন্যে মানুষ গণ্ডার মারে, তাজমহল বানায়, উপস্থিতমত দু-চারটে রুচিকর কথা ব'লে দেওয়া তো সামান্য কথা।

সুনীতি। তার মানে? তুমি আমাকে তখন ঠকিয়েছিলে?

অর্ধেন্দু। আহা, ছেলেমানুষকে শান্ত করতে কি বললাম, তুমি তাতে কান দিচ্ছ কেন? তোমায় আমায় কি সেই সম্পর্ক?

প্রভাত। উহুঁ, ব্যাপারটা বুঝে নিতে হচ্ছে—Where are we standing exactly?

অর্ধেন্দু। এই লনের ওপর।

প্রভাত। Hang it. এতক্ষণ ধ'রে আমরাই বোকা বনলাম, না উনিই এতদিন ধ'রে বোকা ব'নে ছিলেন?

অর্ধেন্দু। (ঈষৎ হেসে) ওহে, জগৎটা গোলমেলে জায়গা, এর কোথায় কে কখন কি ভাবে বোকা বনে, তার মীমাংসা করা কি সহজ কথা! রাত অনেক হয়েছে, সব শুতে যাও।

অলক্ষ্মী

যশোহরের মধ্য দিয়া ঈ. বি. আর.-এর যে লাইন খুলনা গিয়াছে, তাহার পাশে লাইনের গায়েই একটি গ্রাম আছে। গ্রামটি জনহীন। তাহার নামটা পর্যন্ত এখন দীর্ঘকাল অব্যবহারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। এখানে রেল-স্টেশন নাই।

কিন্তু এইটুকুই যদি তাহার সমস্ত পরিচয় হইত, তবে এ কাহিনী শুনাইতে বসিবার কোনও অর্থ থাকিত না। রেল-স্টেশন অনেক গ্রামেই থাকে না, এবং কেবল তাই বলিয়াই সেই নিঃস্টেশন গ্রামের নামও ইতিহাসের পাতায় উঠে না। কিন্তু এই গ্রামটির বিশেষত্ব এই, এখানে স্টেশন ছিল, পরে উঠিয়া গিয়াছে। কেন, তাহাই বলিতেছি।

বলিয়াছি, গ্রামটি জনহীন। কিন্তু চিরকাল এমন ছিল না। একদিন এই গ্রাম ধনে জনে সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। ইহার জমিদারদের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য, তাঁহাদের বিরাট কোঠাবাড়ির জাঁকজমক, গ্রামের মাঝখানে শিবমন্দির ও প্রকাণ্ড দীঘি, গ্রামের হাট, সবই ছিল বিস্ময়কর। দূরের গ্রাম হইতে ব্যাপারীরা এখানকার হাটে আসিত, পাশের গাঁয়ের লোক রোজ এই বাজারে আসিয়া মাছ কিনিত, ফড়িয়ারা এইখান হইতে মালপত্র কলিকাতায় চালান করিত, গাড়ি এখানে পাঁচ মিনিট দাঁড়াইত।

তারপর গ্রামে ম্যালেরিয়া লাগিল। প্রথমটা লোকে বড় একটা গ্রাহ্য করিল না; যশোহরে ম্যালেরিয়া একটা অতি সাধারণ বস্তু। আর অত বড় গ্রামে দুই-চারিটা লোক মরিলেও সহসা কাহারও চমক লাগিবার কথা নয়। এই ঔদাসীন্যের অন্তরালে কখন যে ম্যালেরিয়া

জাল বিস্তার করিতেছিল, কেহ লক্ষ্য করে নাই; তারপর যখন সে একেবারে ভীষণ সংহারমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল, তখন আর সাবধান হইবার অবসর রহিল না। ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া ডাক্তার ডাকিবারও সময় দেয় না, ঝাঁকে ঝাঁকে লোক মরিতে লাগিল; বিকট হরিধ্বনিতে গ্রামের আকাশ বাতাস অনুক্ষণ শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। তারপর ক্রমে হরিধ্বনি কমিয়া আসিল। ম্যালেরিয়া কমিয়াছে বলিয়া নয়, হরিধ্বনি করিবার মত গলার জোর আর অবশিষ্ট নাই বলিয়া। গ্রামে মহামারি লাগিয়া গেল। যাহারা পারিল, গ্রাম ছাড়িয়া পলাইল। যাহারা পারিল না, তাহারা মরিল। শ্মশানে যাইবার লোক ও সামর্থ্যের অভাবে মড়া ঘরে পড়িয়া পচিতে লাগিল। অনেকে চারিদিকে এই আতঙ্কের পরিবেষ্টনে রক্ত শুকাইয়া তিলে তিলে মরা অপেক্ষা একেবারে শেষ হইয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিল—মৃত পুত্রের শবের পাশে মাতার দেহ আড়ায় ঝুলিয়া রহিল, দীঘির জলে বহু পতিপুত্রহীনার দেহ ফুলিয়া ভাসিয়া পচিয়া গলিয়া গেল। দুই বৎসরের মধ্যে গ্রাম নির্জন হইয়া গেল।

টিকিয়া রহিল শুধু তাহার বিরাট প্রাণহীন জমিদার-বাড়ি, তাহার নির্জন পথঘাট শিবমন্দির, তাহার স্বচ্ছশীতল দীঘি, আর তাহার রেল-স্টেশন। গ্রামের বাতাসে একটা অলক্ষ্য অথচ স্পষ্ট-অনুভূত আতঙ্কের ছায়া মিশিয়া আছে, কেহ সহজে গ্রামের মধ্যে ঢুকিতে চায় না, ভিন-গ্রামে যাইতে হইলে এ পথে না যাইয়া বাহির দিয়া তিনটা গ্রাম ঘুরিয়া যায়।

কিন্তু রেল-স্টেশনকে এ ভাবে বর্জন করা সহজ নয়। তাহা ছাড়া স্টেশন গ্রামের এক প্রান্তে, গ্রামের বসতি হইতে অনেকটা দূরে, এবং স্টেশন হইতেই রাস্তা সোজা বাহিরের দিকে চলিয়া গিয়াছে, কাজেই স্টেশনে আসিতে ভয়ও কিছু কম। তাই স্টেশন একেবারে বন্ধ হইল না।

দিনের বেলা লোকজন আসে, গাড়িতে উঠে নামে, মাল তুলিয়া দেয়; শুধু রাত্রে কেহ প্রাণান্তেও এমুখো হয় না। বিপত্নীক স্টেশন-মাস্টার ছেলেটিকে আগেই কলিকাতায় বোর্ডিঙে পাঠাইয়া দিয়াছেন, রাত দশটার গাড়ি কোনমতে পাস করিয়া দিয়া তিনি সিগ্‌নাল-ম্যান বেয়ারা কুলি ইত্যাদি যতগুলিকে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাঁহার কোয়ার্টার্সে জড়ো করিয়া লইয়া কোনমতে রাতটা কাটাইয়া দেন।

এইরূপে ধীরে ধীরে এই গ্রামটা চতুষ্পার্শ্বের আবেষ্টন হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িল, এবং একদা যে মানব-সমাজের অঙ্গ বলিয়া ইহার পরিচয় ছিল, তাহার সহিত ইহার সমস্ত যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে এই মৃতপুরীর মধ্যেও নিয়তির রহস্যময় খেলা চলিতেছিল।

যাহারা মরিয়াছিল, তাহাদের সদ্গতি করার অবসর মেলে নাই; কাজেই মরিয়াও তাহারা গ্রামেই টিকিয়া রহিল। এবং গ্রামসুদ্ধ লোক একসঙ্গে মরার ফলে একটা সুবিধা হইল, পরস্পর সম্পর্কের কোন পরিবর্তন হইল না। মানুষ প্রেতলোকে যাইবার সময় তাহার পার্থিব দেহটাকেই শুধু পিছনে ফেলিয়া যায়, সত্তা বুদ্ধি চেতনা তাহার যেমন তেমনই থাকে। সুতরাং ইহাদের পরস্পর পরিচয় সম্বন্ধ আচার ব্যবহার কিছুরই বিশেষ ব্যত্যয় ঘটিল না। মানব-দেহে যেমন কাটিত, প্রেত-দেহেও প্রায় তেমনই করিয়া ইহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

কাটিতেই ছিল, কিন্তু বরাবর কাটিল না। এই শান্ত গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবন-প্রবাহের মধ্যে অতর্কিতে একটি ঢিল আসিয়া পড়িল, এবং যে ঢেউ তুলিল তাহার আঘাতে এই ক্ষুদ্র সমাজটির শান্তি তো ভাঙিলই, বাহার বাহিরেও তাহার কম্পন ছড়াইয়া পড়িল। এইখান হইতেই আসল গল্পের শুরু।

যে টিপটি পড়িল তাহার নাম প্রীতি। তাহার বয়স কম, এবং চেহারা ভাল। তাহার দেহে বিলাতি রক্ত ছিল কি না জানা যায় না, কিন্তু সে ছেলেবেলা হইতেই কন্‌ভেণ্টে মানুষ হইয়াছিল। সে বুক-কাটা জামা ও খাটো স্কার্ট পরিত, চুল বব করিত, মেমসাহেবের মত করিয়া ইংরেজী বলিত, এবং একা একা টিকিট কিনিয়া রেলগাড়িতে চড়িতে তাহার ভয় করিত না।

এবারেও সে বড়দিনের ছুটিতে একা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। ইচ্ছা ছিল, ট্রেনে খুলনা গিয়া সেখান হইতে ডেস্‌প্যাচ স্টীমারে চাপিয়া সুন্দরবন দেখিয়া আসা। কিন্তু অতদূর আর পৌঁছানো গেল না।

রাত্রের ট্রেন। কামরায় প্রীতি একাই ছিল। মধ্যপথে তাহার গাড়িতে ডাকাত ঢুকিল। প্রীতি বাঙালী মেয়ের মত চেঁচাইয়া উঠিয়া মেমসাহেবের মত চেন টানিতে গেল। ডাকাত অগত্যা তাহাকে গলা টিপিয়া খুন করিল, তাহার টাকাকড়ি সমস্ত পকেটে পুরিল, তারপর গাড়ির পা-দানির উপরে লাস শোয়াইয়া রাখিয়া পরের স্টেশনে নামিয়া গিয়া অন্য কামরায় উঠিল।

অদৃষ্টচক্রে সে স্টেশন আমাদের সেই গ্রামের। স্টেশনে গাড়ি থামিবার ঝাঁকুনিতে প্রীতির দেহ পা-দান হইতে গড়াইয়া অন্ধকারে লাইনের উপরে পড়িল। পরদিন সেই দেহ লোকের চোখে পড়িল, খুব খানিকটা কোলাহল হইল, এবং স্টেশন-মাস্টারের বুকের কাঁপুনি আর একটু বাড়িল; তিনি ছেলেকে লিখিয়া দিলেন, বড়দিনের ছুটিতে এখানে না আসিয়া মামার বাড়িতে বেড়াইয়া আসিতে।

ওদিকে প্রীতির আত্মা যতক্ষণ সম্ভব দেহের সঙ্গেই রহিল; তারপর যখন দেহটাকে লোকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া শহরের মড়িঘরে চালান করিয়া দিল, সে গিয়া ধীরে ধীরে গ্রামের মধ্যে ঢুকিল।

মাঘের মাঝামাঝি, কিন্তু কয়েকদিন ধরিয়া শীত কাটিয়া বেশ ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়াছে। বিকালবেলা বড়দীঘির পাড়ের উপর বটগাছের তলায় একটা অত্যন্ত জরুরি জটলা জমিয়াছিল। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইত, সভার প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর উত্তেজিত, এবং যিনি কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কাহারও বিশেষ মতানৈক্য নাই।

বক্তার নাম বিশ্বম্ভর চক্রবর্তী। গুরুগিরি করিয়া জীবিকানির্বাহ এবং প্রভূত ধনসংস্থান করিতেন। কৃষ্ণবর্ণ গোলগাল ভরপুর চেহারা, লোমশ দুইটি খাটো হাতে শক্তির ছাপ, মস্তকের সম্মুখে টাক। মৃত্যুকালে ইহার বয়স পঞ্চান্ন বছর হইয়াছিল। দীর্ঘ বক্তৃতার অন্তে মাটিতে দুই প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া তিনি কহিলেন, এ কিছুতেই চলবে না। বিশ্বম্ভর চক্কোত্তি গাঁয়ে থাকতে কক্ষনো এসব চলবে না ব'লে দিচ্ছি।

অনেকেই অস্ফুটগুঞ্জনে ইহার প্রতিধ্বনি করিল।

চক্রবর্তী পুনরায় কহিলেন, হিঁদুর গাঁ, ভদ্রলোকের পাড়া, এর মাঝখানে অমন হাঁটু-দেখানো ঢলানী মেয়ের জায়গা হবে না। ওকে তাড়ানোই চাই।

একজন প্রৌঢ়তম প্রেতাত্মা কহিলেন, কিন্তু তাড়ানো তো সত্যিই সম্ভব নয়।

সকলের দৃষ্টি সেই দিকে ফিরিল। চক্রবর্তী চক্ষু পাকাইয়া কহিলেন, তার মানে?

প্রৌঢ় প্রেতাত্মা কহিলেন, আমরা যেমন ইচ্ছে করলেও এই গাঁয়ের সীমানার বাইরে যেতে পারি না, ওরও তো তাই। যতক্ষণ না কেউ ওর পিণ্ডি দিচ্ছে, ততক্ষণ আমরা হাজার তাড়া করলেও তো ও ওর গণ্ডির বার হতে পারবে না।

চক্রবর্তী কহিলেন, বাজে ব'কো না। ওসব নষ্ট মেয়ের আবার পিণ্ডি হয় নাকি? না খেষ্টাননী ভূতের মুক্তি আছে?

প্রৌঢ় আঁতকাইয়া কহিলেন, খেষ্টাননী!

চক্রবর্তী কহিলেন, নয় তো কি তুমি ভেবেছিলে, ফুলের মুখুটি বিষ্ট ঠাকুরের সন্তান? হিঁদুর মেয়ে যতই বেয়াড়া হোক, অমন ক'রে হাঁটু দেখিয়ে বুক খুলে কক্ষনো বেড়াতে পারে না।

প্রৌঢ় আমতা আমতা করিয়া কহিলেন, তা বটে।

চক্রবর্তী স্পষ্টবক্তা লোক। কহিলেন, কি, কথাটা কি খুলে বল তো শুনি? তাকে তাড়াবার কথা বলতেই মুখখানা লম্বা হয়ে পড়ল, বলি কিছু জমিয়ে-টমিয়ে নিয়েছ নাকি ওদিকে?

প্রৌঢ় ত্রস্তে জিব কাটিয়া কহিলেন, ছি ছি, কি যে বলেন! আমি বলছিলাম, তাকে তাড়ানো যখন যাবেই না, তখন অন্য উপায়ে তাকে জব্দ রাখা দরকার। একঘরে ক'রে হোক, বা—

চক্রবর্তী কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু কথাটা চাপা দিচ্ছ কেন? বুড়ো হয়ে গেলে, এখনও সুন্দর মুখ দেখলেই কাৎ হয়ে পড়াটা আর মানায় না হে, বুঝলে? বেঁচে থাকতে যা করেছ করেছ, ওসব ছাড়। আর এ তোমার সেই ইয়ে নয়, হাল শহুরে আমদানি, ঘোল খাইয়ে তবে ছাড়বে।

প্রৌঢ় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, অদূরে দীঘির ঘাটে জল লইতে আগতা এক প্রবীণা প্রেতিনীকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া শঙ্কিত ক্ষীণস্বরে কহিলেন, দোহাই আপনার, চুপ করুন।

চক্রবর্তী লোককে বাগে পাইলে ছাড়িয়া দিবার পাত্রই নহেন, অট্টহাস্য করিয়া কহিলেন, আহা-হা, ঘাবড়াও কেন? সতী তো আর নন যে, পতিনিন্দা কানে গেলেই অমনি পতন ও মূর্চ্ছা হয়ে যাবেন!

প্রৌঢ় আর তিষ্ঠিতে সাহস করিলেন না। পাশের যুবক প্রেতাত্মাটিকে ঠেলিয়া কহিলেন, ওহে সত্য, তুমি তো বলেছিলে আজ পারঘাটায় জেলেদের ঠেঁয়ে মাছ আনতে যাবে, কই গেলে না?

সত্য এতক্ষণ চুপ করিয়াই বসিয়া ছিল, কোন কথায় যোগ দেয় নাই। মুখ তুলিয়া কহিল, হ্যাঁ, চলুন।

পথে আসিয়া প্রৌঢ় কহিলেন, দেখলে তো কাণ্ডখানা! ভাল ভেবে দুটো কথা বলতে গেলাম, তার ফল হ'ল বিপরীত। এইজন্যেই শাস্ত্রে বলেছে, বেনাবনে মুক্তো ছড়াতে নেই। আর এও বলি, তোদেরই বা এত ঢঙ কিসের রে বাপু? আছে সে বেচারী, কারুর কোন ক্ষেতি করেছে? কারু সঙ্গে আলাপটুকুও সে আজ পর্যন্ত করে নি, গাঁয়ের একটেরে একটা ভাঙা ঘরে একলা প'ড়ে রয়েছে; তোদের তাকে তাড়াবার জন্যে এত মাথাব্যথা কেন? কি জান, আসল কথা হচ্ছে, চক্কোত্তি গেছলেন ভাব জমাতে, তাড়া খেয়ে এসেছেন। তাই তাঁর এত তম্বি—তাড়িয়ে দাও, হ্যান কর, ত্যান কর। আমিও এই ব'লে রাখছি বাবা, বিপাকে প'ড়ে যা নাকাল আজ আমাকে হতে হ'ল, এর শোধ তুলব তুলব তুলব, তবে আমার নাম—হ্যাঁ।

সত্য নীরবে শুনিয়া গেল, মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে দুই-একটা 'হুঁ' 'হাঁ' করা ছাড়া বড় একটা সাড়াই দিল না। প্রৌঢ় নেহাৎ নিজের ক্ষোভ ও আস্ফালনের উচ্ছ্বাসে মগ্ন ছিলেন বলিয়াই তাহার এই অমনোযোগ লক্ষ্য করিলেন না।

বস্তুত সত্যের উন্মনা হইবার কারণ ছিল। এই সুন্দরী ও প্রগল্‌ভা তরুণী প্রেতিনী তাহারও মনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, এবং আর দশজনের মত সেও বহুদিন ধরিয়া অপরের অগোচরে ইহার সহিত ঘনিষ্ঠতা

করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। সুদীর্ঘকাল ঘোরাফেরা করিবার পর মাত্র কাল সন্ধ্যায় তাহার সহিত কয়েক মিনিটের জন্য নিভৃত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ফল আশাপ্রদ হয় নাই।

কাল বিকালে সত্য পারঘাটার দিকে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিতে সন্ধ্যা ঘোর হইয়া গেল। দীঘির পাড়ে বাঁধানো ঘাটের কাছে আসিয়া দেখিল, ঘাটের উপরে প্রীতি বসিয়া আছে। বটগাছের আড়াল হইতে শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ তখন সবে উঁকি মারিতেছে। সত্য চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, আশেপাশে কেহ নাই। ভাল ভাল বইয়ের লেখার সঙ্গে স্থান ও কাল ঠিকঠাক মিলিয়া যাইতেছে, অতএব সত্যর বুকের ভিতরটা দুড়দুড় করিয়া উঠিল। প্রাণপণ সাহসে ভর করিয়া সে কাছে আগাইয়া গেল। হাতের মাছটা নামাইয়া রাখিয়া প্রীতির পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল, গুড মর্নিং। হাউ ডু ইউ ডু?

সে সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছিল, এবং ইংরেজীতে বাক্যালাপ করিলে মেয়েরা চমৎকৃত হয়, ইহা সে জানিত।

প্রীতি ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে তাকাইল, কহিল, ইভ্‌নিং। আমি বাংলা জানি।

সত্য থতমত খাইয়া কহিল, ইয়ে—মানে—বেশ হাওয়াটা দিয়েছে, নয়?

প্রীতি সংক্ষেপে কহিল, স'রে বসুন, আমার গায়ে হাওয়া লাগছে না।

সত্য আর একটু আগাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আই অ্যাম ভেরি সরি। আমাদের দেশটা কি রকম লাগছে আপনার?

ভালই। থ্যাঙ্ক্‌স।

সত্যি, এ এক রকম বেশ নতুনমত, না? একবার একটা বইয়ে পড়েছিলাম, ভুশণ্ডীর মাঠ ব'লে নাকি এমনি একটা জায়গা আছে। আপনি 'ভুশণ্ডীর মাঠে' পড়েছেন?

প্রীতি স্কার্টটাকে লীলাভরে একটু টানিয়া নামাইবার ভঙ্গী করিয়া কহিল, না, কিন্তু আমি 'উদাসীর মাঠ' পড়েছি। অত কাছে ঘেঁষে আসবেন না বলছি, কামড়ে দোব।

তাহার পাতলা গোলাপী ঠোঁটের ফাঁকে সাদা ঝকঝকে সুগঠিত দাঁতের সারি সত্যর চোখে বিদ্যুৎ হানিয়া গেল।

বেচারী সত্য! উন্মুখ প্রণয়ের মুখর ভাষা তাহার মনের গহন তলেই মৌন রহিয়া গেল, এত সাধের টাটকা ইলিশের ছানা শানের উপর অনাদরে ধূলায় পড়িয়া রহিল; সত্য একটু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে ম্লানমুখে ও রিক্তহস্তে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

এখন পর্যন্ত তাহার সমস্ত চৈতন্য ব্যাপিয়া সেই ঈষৎ-স্ফীত পাতলা গোলাপী দুইটি ঠোঁট ও ঝকঝকে দুই পাটি দাঁত ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

জীবাত্মা ও প্রেতাত্মা সবারই জীবনে মাঝে মাঝে দুই-একটা দিন আসে, যখন সে নিঃসংশয়ে ও সানন্দে স্বীকার করে, ভগবান আছেন। সত্যর জীবনেও তেমনই একটি শুভদিন শীঘ্রই আসিয়া দেখা দিল।

সেদিনকার সাক্ষাতের ফলে সত্য কেমন একটু মুষড়াইয়া পড়িয়াছিল। কামড়ের ভয়ে নয়, প্রীতির মত ক্ষীণাঙ্গীর এক-আধটা কামড়ে সত্যর সবল পেশীপুষ্ট দেহে বিশেষ লাগিবার কথা নয়, এবং এলিস বলেন, প্রিয়ার কেবল কামড় কেন, খ্যাংরাও নাকি প্রেমিকের অঙ্গে মধুরই লাগে। ভয় তাহার ঠিক সেজন্য নয়, কিন্তু প্রীতি পাছে বিরক্ত হয়, এই আশঙ্কা ও তজ্জাত সঙ্কোচই সে কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তাহার উপর প্রীতিকে একঘরে করা হইয়াছে, এবং চক্রবর্তী-প্রমুখ সমাজপতিরা মিলিয়া ফতোয়া জারি করিয়াছেন, গ্রামের কেহ কোন উপলক্ষ্যে তাহার সহিত কোন সংস্রব রাখিতে পারিবে

না; কেহ তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে জানা গেলে, তাহাকে সমাজের বিধানানুযায়ী দণ্ড দেওয়া হইবে। দণ্ডটা বড় কথা নয়, কিন্তু তাহার সহিত যে কলরব ও কেলেঙ্কারিটা স্বতই জড়িত থাকিবে, তাহার কল্পনাও সত্যকে একটু পীড়া দিতেছিল।

কিন্তু 'পর্বত-গৃহ ছাড়ি বাহিরায় নদী যবে সিন্ধুর উদ্দেশে', তাহার গতি রুদ্ধ করা সত্যর মত নিরীহপ্রকৃতি ভাল মানুষ ভূতের কর্ম নয়। নিজের মনকে যতই সে টানিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, অশান্ত ঘোড়ার মত মন তাহার ততই উদ্দামবেগে চার পা তুলিয়া তাহাকে গ্রামান্তের সেই একখানি ছোট্ট ঘরের দিকে অহর্নিশি টানিতে থাকিল। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই সত্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, সমস্ত গ্রামের মধ্যে একটিমাত্র ঝোপে খুব ভাল দাঁতন করিবার উপযোগী আসশেওড়ার ডাল পাওয়া যায়। অযত্নে দাঁত খারাপ হয় এবং খারাপ দাঁত যাবতীয় রোগের মূল, অতএব সত্য প্রত্যহ খুব ভোরে উঠিয়া সেই ঝোপটিতে দাঁতন ভাঙিতে যাইতে আরম্ভ করিল। ঝোপটি তাহার নিজের বাড়ির খুব কাছে নয়, সুতরাং এই উপলক্ষ্যে বেশ একটু নিয়মিত প্রাতর্ভ্রমণও হইতে লাগিল। আরও এক কথা, ঝোপের অনতিদূরেই একটি ঝাঁকড়া তরুণ বকুলগাছ আছে, তাহার ডালে পা ঝুলাইয়া বসিয়া দাঁতন করিতে ভারি আরাম, এবং মৌতাতীমাত্রেই জানেন, আয়েশ করিয়া বেশ বহুক্ষণ ধরিয়া দাঁত ঘষিতে না পারিলে দাঁতন করার কোন মানেই হয় না। বকুলগাছের খুব কাছেই প্রীতির ঘর, এবং বকুলগাছের ঝুপ্‌সো পাতার মধ্যে বসিয়া দাঁতন করিতে থাকিলে ওই সঙ্গে সেই ঘর, উঠান ও তত্রস্থ লোকের চলাফেরা চোখে পড়ে; সেটা নিশ্চয়ই সত্যর অপরাধ নয়। যে দাঁতন করিতেছে, তাহার কারবার দাঁত ও কাঠি লইয়া। কে কোথায় বাস

করে, কে কখন সদ্য-ভাঙা ঘুমের মধুর জড়িমামাখা চক্ষু ডলিতে ডলিতে ঘরের বাহিরে আসিল, কে উঠানে সকালবেলার কাঁচা রৌদ্রে চুল মেলিয়া দিয়া কণ্ঠার নীচেকার ঘামাচি মারিতে বসিল, নিজের বাড়ির উঠান হইলেও জামাটা অতখানি নামাইয়া বসিবার অধিকার আইনত তাহার আছে কি না—এ সকল তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইতে গেলে তাহার চলে না।

ধর্মপথে থাকিবার পুরস্কার আছেই। চাই বা না চাই, সে নির্ঘাত আসিয়া ঘাড়ের উপর পড়িবে। আর শরীরমাদ্যং যে খলু ধর্মসাধনম্ এবং শরীরচর্চার প্রথম ও প্রধান পন্থা যে প্রাতভ্র্মণ ও নিয়মিত দন্তধাবন, ইহাও জানা কথা। অতএব বেশিদিন সত্যকে গাছে বসিয়া থাকিতে হইল না। অতর্কিতে একদিন সেই পরম ক্ষণটি আসিয়া দেখা দিল, যে ক্ষণ জীবনে ভাগ্যিস একবার মাত্র আসে, যাহার আবির্ভাবে যেন মায়াকাঠির স্পর্শে অকস্মাৎ চোখের সম্মুখে নিখিল ধরণী সদ্য-সোনা-বাঁধানো দাঁতের মত অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে ঝলমল করিয়া উঠে।

সেদিন দাঁতন করিতে করিতে সত্য গুনগুন করিয়া গাহিতেছিল—'কতদিন—আর কতদিন বহিব বিরহের ভার।' আহা, সে তো গান নয়, তাহার আকুল অন্তরের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত ব্যথার শোণিতক্ষরণ। গান ভাঁজিতে ভাঁজিতে সত্য একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, প্রীতি তখনও বাহিরে আসে নাই। সহসা সে চমকিয়া সোজা হইয়া বসিল, তাহার গানের তাল কাটিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই দাঁতন-কাঠিটা তাহার হস্তচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। অস্ফুট একটা শব্দ করিয়া

সে লাফাইয়া মাটিতে নামিয়া পড়িল। না, কাঠপিঁপড়ে নয়। ঘরের পিছন দিক হইতে একটা মিষ্ট গলার আর্ত-চীৎকার তাহার কানে আসিয়াছিল।

এক মুহূর্ত সত্য থমকিয়া রহিল, তারপর সেই দিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। এদিকে আসিয়া দেখিল, প্রীটি হাঁটুপ্রমাণ ঝোপের মধ্যে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত বিপন্নমুখে চারিদিকে চাহিতেছে এবং মাঝে মাঝে অর্ধস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙিয়া জানালা দিয়া বাহিরে চাহিতেই প্রীটির চোখে পড়িয়াছিল, ঘরের পিছনে ঝোপের মধ্যে অজস্র সুন্দর হলদে রঙের ফুল ফুটিয়াছে। মরিলেও তাহার মনের সবুজ রঙটি একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই; কোনও দিকে না চাহিয়া সে সোজা গিয়া সেই চকচকে সবুজ গাছের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সে শহুরে মেয়ে, শিয়ালকাঁটার গাছ চিনিত না। নিমিষে শতলক্ষ কাঁটা তাহাকে চতুর্দিক হইতে বেড়িয়া ধরিল। ফুল তোলা মাথায় উঠিল, কাঁটার জ্বালায় প্রীটি অস্থির হইয়া উঠিল। নড়িবার উপায় নাই, সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে রাশি রাশি ক্ষুদ্র কাঁটা পুটপুট করিয়া ফুটিতেছে—কাঁটা ছোট হইলেও তাহার জ্বলুনি কম নয়। হাতের কাছেও এমন কিছু নাই, যাহা দ্বারা পায়ের একটা আবরণ তৈরি করা যাইতে পারে। স্কার্টের শেষ-সীমা হাঁটুর দুই ইঞ্চি উপর পর্যন্ত পৌছায়, তাহার নীচে প্রীটি একান্ত অসহায়া অবলা রমণী। একবার সে ব্যাকুলনেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, সাহায্য করিবার মত কেহ কোথাও আছে কি না! কিন্তু সমাজের শাসন-ভয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে কেহ এ বাড়ির ধারে-কাছেও ঘেঁষে না। প্রীটি চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর আস্তে আস্তে পা তুলিতে যাইবে, এমন সময়

দেখিল, সত্য ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই সে আর্তস্বরে কহিল, আমাকে বাঁচান।

সত্য হুড়মুড় করিয়া ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। প্রীতির পাশে গিয়া কহিল, ভয় নেই।

তাহার পিঠের নীচে একটা হাত ও হাঁটুর তলায় একটা হাত দিয়া সত্য অনায়াসে তাহাকে তুলিয়া লইল, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া ঝোপের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রীতি তখন দুই বাহু দিয়া তাহার গলা আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের উপর মাথাটা এলাইয়া দিয়া পরম নির্ভরে চক্ষু বুজিয়া আছে, চাপা ফোঁপানির দমকে তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। সত্য এক মুহূর্ত তাহার মুখের পানে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তারপর কোথা দিয়া কি হইয়া গেল, সত্য সহসা মুখ নীচু করিয়া— আ ছি ছি ছি!

তারপরই তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি তাহাকে নামাইয়া দিয়া সে পিছন ফিরিয়া দ্রুতবেগে পা চালাইয়া দিল। প্রীতির দৃষ্টির অন্তরালে পলাইতে পারিলে সে তখন বাঁচে।

কিন্তু বাঁচা অত সহজ নয়। প্রীতি পিছু ডাকিয়া বসিল, যাবেন না, শুনুন।

সত্য সঙ্কুচিত হইয়া থামিয়া দাঁড়াইল, কহিল, ডাকলেন?

প্রীতি কহিল, হ্যাঁ। আমি হাঁটতে পারছি না। বড্ড জ্বলছে।

সত্য তাহার পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল, একখানা পা হাতে তুলিয়া লইয়া কহিল, ইস, একরাশ কাঁটা বিঁধে রয়েছে। বসুন, আমি তুলে দিচ্ছি।

সত্য কম্পিত হস্তে অসীম যত্নে একটি একটি করিয়া কাঁটা বাছিয়া তুলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরবে কাঁটা তুলিয়া সত্য কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, আমাকে মাফ করবেন।

প্রীতি কহিল, কিসের জন্যে ?

সত্য মুখ আরও হেঁট করিল, কথা কহিল না।

প্রীতি কহিল, বুঝেছি, কিন্তু এতে মাফ চাইবার কি আছে ? ইউ হ্যাভ ডান নাথিং আন্‌ন্যাচারাল।

সত্য মুখ তুলিয়া বিস্মিতদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল, প্রীতির মুখে চোখে ব্যঙ্গ বা শ্লেষের কোন আভাস তাহার চোখে পড়িল না। ভয়ে ভয়ে কহিল, তার মানে ?

প্রীতি কহিল, মানে আবার কি ! আপনি এমন কিছু করেন নি, যার জন্যে ঘটা ক'রে মাফ চাইতে হবে।

সত্যর সংশয় কাটিল না, কহিল, আপনি রাগ করেন নি ?

প্রীতি হাসিয়া কহিল, হাউ সিলি !

সত্য কহিল, তা আপনি বলতে পারেন, শুধু বোকা আহাম্মক কেন, গাধা গরুও বলতে পারেন ; কিন্তু বলুন, আপনি রাগ করেন নি ?

প্রীতি কহিল, না না না। ইউ কুড ডু ইট এগেন, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড।

এ বলে কি ! এই মেয়েই কি কয়দিন আগে তাহাকে অমন করিয়া দাঁত খিঁচাইয়া তাড়া দিয়াছিল ! সত্য সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই সহসা ঈষৎ তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, হাঁ করুন তো।

প্রীতি অবাক হইয়া কহিল, কেন ?

আগে করুন।

প্রীতি একবার মুখ খুলিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার বন্ধ করিল, সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্টস্বরে কহিল, ভুতুম।

সত্য কিন্তু উত্তেজনার বশে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখে পড়িয়াছিল, প্রীতির পাতলা গোলাপী ঠোঁটের পিছনে আজ আর

দাঁত দেখা যাইতেছে না। সেদিনকার অমন ঝকঝকে দাঁতের পাটি, সে কি একেবারেই ফাঁকি! ঝোঁকের মাথায় সে একেবারে ইংরেজী করিয়া বলিয়া ফেলিল, ইয়োর টীথ?

প্রীতি ভ্রূ বাঁকাইয়া কহিল, বা রে, দিব্যি দিচ্ছেন কেন মিছিমিছি?

সত্য বুঝিল না, কহিল, আপনার দাঁত কোথায় গেল?

প্রীতি হাত তুলিয়া মুখ স্পর্শ করিয়া দেখিয়াই মুখে হাত চাপা দিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

সত্য কহিল, কি হ'ল?

প্রীতি রুদ্ধস্বরে কহিল, প'ড়ে গেছে।

সত্য কহিল, কিন্তু কালও তো দেখলাম।

কাল কখন দেখিয়াছিল, সে প্রশ্ন প্রীতি করিল না; কাঁদকাঁদ হইয়া কাহল, খানিক আগেও তো ছিল।

এই শহরিণীদের সকলই কি অনাসৃষ্টি! সত্য কহিল, খানিক আগে ছিল, আর এর মধ্যে অতগুলো দাঁত কখন প'ড়ে গেল টের পেলেন না?

প্রীতি কহিল, একটু আলগা ছিল। তারপর সত্য বিমূঢ়ের মত চাহিয়া আছে দেখিয়া বুঝাইয়া কহিল, বাঁধানো দাঁত।

ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। সত্য কহিল, ওঃ। তা হ'লে নিশ্চয় ঝোপের ভেতর প'ড়ে গেছে, আমি এক্ষুনি খুঁজে নিয়ে আসছি।

সত্য পা বাড়াইতেই প্রীতি অপূর্ব মিনতিভরা কণ্ঠে কহিল, যাবেন না, যাবেন না আপনি ওর ভেতরে। চাই না আমার দাঁত।

মুহূর্তের জন্য সত্য থমকিয়া দাঁড়াইল। চকিতের মত তাহার মনে হইল, পাতলা কোমল ঠোঁটের পিছনে কঠিন হিংস্র দাঁত না থাকা এক হিসাবে খুবই বাঞ্ছনীয়। দাঁত ছিল না বলিয়াই তো আজ—। পরক্ষণেই আবার মনে হইল, ঈষদ্দৃষ্ট ঝকঝকে দাঁতের সারি পিছনে না থাকিলে

সেই পাতলা গোলাপী ঠোঁটে হাসির সৌন্দর্য খোলে না। এক দাঁত-খিঁচুনি, কিন্তু জগতে দুঃখ কোথায় নাই!

সত্য চট করিয়া নিজেকে সংবরণ করিয়া ফেলিল; ছি ছি, একি তাহার প্রবৃত্তি; নিজের সুবিধা করিবার মোহে সে প্রিয়ার দন্তহানি মুহূর্তের জন্যও কামনা করিতে পারিয়াছে, এই ধিক্কারে সারাটা অন্তর তাহার অবিলম্বে গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল। মনে মনে নিজেকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া সে হুড়মুড় করিয়া ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। দাঁত খুঁজিয়া পাইতে বেশিক্ষণ লাগিল না। বাহিরে আসিয়া কহিল, এই নিন।

প্রীটি দাঁত হাতে লইয়া কহিল, কেন গেলেন আপনি ওই সর্বনেশে কাঁটার মধ্যে ঢুকতে?

তাহার চোখের দীর্ঘচ্ছায় পল্লব এক অপরূপ লীলাভরে সিক্ত হইয়া উঠিল। সে চাহনিতে সত্যর সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হইল। মনে মনে সে কহিল, কি বুঝিবে তুমি কল্যাণি, কেন গিয়াছিলাম? তোমার ওই দৃষ্টিপ্রসাদ সর্বাঙ্গে আমার যে কি অমৃত লেপিয়া দিল, তুমি তাহার কি জান? তোমার ওই দৃষ্টি, ওই অশ্রুর অভিনন্দন যদি আমার পুরস্কার হয়, তবে দিনে লক্ষবার এমনই করিয়া তোমার দাঁত পড়িয়া যাক; খুঁজিয়া আনিতে যদি আমাকে অনলে-অনিলেও প্রবেশ করিতে হয়, সেই ক্লেশকে আমি স্বর্গসুখ হইতে সহস্রগুণে শ্রেয় মনে করিব। মুখে কহিল, এত বাড়িয়ে দেখেন কেন আপনি, বলুন তো? এই কাঁটাতে এত ভয়! ছেলেবেলায় আমরা কত বঁইচি পায়লা খেয়েছি ঝোপঝাড় ভেঙে, কত কেটে ছ'ড়ে গেছে। এতে আমার কি হবে! এই দেখুন।—বলিয়া সে ডান হাঁটুর ঠিক নীচেটায় একটা বড় ক্ষতের দাগ অনাবৃত করিয়া সগর্বে কহিল, দেখুন।

কিন্তু প্রীতি পুরুষের অনাবৃত হাঁটুর পানে চাহিয়া দেখিতে পারিল না, সহসা 'অ্যাক' বলিয়া একটা ধ্বনি করিয়া চক্ষু বুজিয়া ফেলিল।

আর সত্য? সেদিন সারাক্ষণ ধরিয়া তাহার কানের মধ্যে শত সহস্র মুরলীমৃদঙ্গমন্দিরা বাজিতে লাগিল, বুকের মধ্যে রক্তের প্রখর স্রোত তাহারই সহিত তাল দিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল, হাঁটিতে গিয়া কেবলই বোধ হইতে লাগিল, সমস্ত দেহ তাহার হঠাৎ অদ্ভুত রকম হাল্কা হইয়া গিয়াছে, চলিতে মাটি যেন পায়ের তলায় ঠেকিতেছে না। আড়াই শো গ্রেন কুইনিন খাইলেও এমনটি হইত না।

সত্য ডুবিল। প্রীতি একটু তোতলা, কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসে না।

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই দেখা গেল, এই দুইটি তরুণ হিয়া পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছে। ধরিবার কথাও। সত্যের কথা ছাড়িয়াই দিই, কিন্তু প্রীতির দিক হইতেও এই দুর্বলতা জন্মিবার কারণ ছিল।

সে এই গ্রামে আসা অবধি বহু লোকের প্রেম-নিবেদন তাহার হৃদয়-দুয়ারে আসিয়া মাথা ঠুকিয়াছে। অনেকের আপ্যায়নই সে অবহেলে গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু সবার মধ্যে বিশেষ করিয়া এই লাজুক যুবকটির দিকেই তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল বেশি। অন্যেরা যখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শিস দিয়া চোখ ঠারিত বা পাকা ওস্তাদ প্রেম-ব্যবসায়ীর ছাঁদে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করিত, এই লাজুক ছেলেটা তখন দূর হইতে শুধু ভীরু চকিত গোপন চাহনিতে তাহাকে দেখিয়াই ক্ষান্ত হইত। তাহার এই আনাড়ী ও সব্রীড় ভক্তটির জন্য কাজেই প্রীতির মনের নিভৃতে একটি কোমল কোণ গড়িয়া

উঠিতেছিল। এই আকর্ষণকে প্রেম বলিতে পারেন, নাও বলিতে পারেন, ইহা অপটু বিড়াল-শিশুর প্রতি খুকী-হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নিগ্ধতার সমধর্মী।

তারপর প্রীটির হতাশ প্রেমাকাঙ্ক্ষীরা তাহাকে একঘরে করিয়া শোধ তুলিল। প্রীটির দুঃখের আর অন্ত রহিল না। ধোপা নাপিত বন্ধ হইলে ভূতেদের ততটা আটকায় না, কিন্তু এই অমোঘ গ্রাম্য-শাসন অতর্কিতে যে নিবিড় নিসঃঙ্গতার অরণ্যে তাহাকে আনিয়া ফেলিল, তাহা যেমন দুঃসহ তেমনই ভয়াবহ। সুখে দুঃখে কাছে পাইতে একজন প্রতিবেশী নাই, কথা কহিবার একটা সাথী নাই, গ্রামের প্রান্তে নির্জন মাঠের পারে ভাঙা ঘরে একা বাস করিতে রাত্রে তাহার ভয়ে ঘুম হয় না। অন্ধকারে গাছের ডালে ঝরঝর করিয়া শব্দ হয়, ঘরের মধ্যে নিঃশঙ্ক ইঁদুরের দল খড়খড় করিয়া ছুটাছুটি করে, অকস্মাৎ শৃগালের তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকারে রাত্রির নিস্তব্ধ আকাশ চিরিয়া খান খান হইয়া যায়, অদূরে কোথায় একটা পেঁচা বিকট গম্ভীর স্বরে এই কোলাহলের প্রতিবাদ জানায়। প্রীটির বুক কাঁপিতে থাকে, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। বাপ মা ভাই বোন—মানব-জীবনের শত সঙ্গী-সাথীর কথা মনে পড়ে, তাহাদের ছাড়িয়া এ কোন্ নিষ্করুণ নিঃসঙ্গ মরুদেশে আসিয়া পড়িল ভাবিয়া দুই চক্ষু তাহার জলে পূর্ণ হইয়া যায়। নিজের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ নিজেরই কানে প্রবেশ করিয়া বার বার সে আতঙ্কে চমকিয়া উঠে। কতক্ষণে এই যন্ত্রণার অবসান হইবে, মুহূর্ত গনিয়া গনিয়া সময় আর কাটিতে চায় না। অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত তাহার চক্ষুর সম্মুখে ভোরের ক্ষীণ আভা জাগিয়া উঠে। প্রীটির স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে, আকুল আগ্রহে সে নিনিমেষে আকাশের পানে চাহিয়া থাকে—কতক্ষণে আলো হইবে! তারপর আলো হয়, ছুটিয়া সেই সুখস্পর্শ সোনালী কাঁচা রৌদ্রের প্লাবনে

দাঁপাইয়া পড়িয়া প্রীতি ভাবে, বাঁচিলাম। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য! মধ্যাহ্নের নিশ্চিন্ত অবসরে জাগরণক্লান্ত চক্ষু তাহার ঘুমে ভরিয়া আসে। ঘুম ভাঙিলে দেখে বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, তাহার মনের মধ্যেও আতঙ্কের ঘনকৃষ্ণ ছায়া দ্রুত ঘনাইয়া উঠিতে থাকে। তারপর আবার রাত্রি, আবার সেই একই দুঃখের পুনরাবৃত্তি। চোখের জলে শয্যা সিক্ত করিয়া প্রীতি কেবলই বলিতে থাকে, এ কি যন্ত্রণা! এই কি নরক? হয়তো নরকও এর চেয়ে ভাল, সেখানে হয়তো সঙ্গী মেলে, দিনের পর দিন এমন করিয়া ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গ রাত্রি যাপন করিতে হয় না। কখনও বা কল্পনায় সে সান্ত্বনার স্বর্গ গড়িয়া তুলিতে থাকে—হয়তো সবটাই একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন, হয়তো সত্যই সে মরে নাই, এখনই জাগিয়া দেখিবে, জনাকীর্ণ নগরীর বুকে আলোকোজ্জ্বল কক্ষে সে তাহার বিছানাতেই শুইয়া আছে। আঃ, সে কি মুক্তি! একবার যদি এই দুঃস্বপ্ন হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, জীবনে আর কখনও সে একা একা ট্রেনে চড়িবে না, ফ্রী পাস পাইলেও না। কিন্তু হায়! রাত্রি কাটিয়া ভোর হয়, আবার রাত্রি আসে, দুঃস্বপ্নের অবসানের কোনও আভাসই চোখে পড়ে না। অবসাদে হতাশায় প্রীতির মন ভাঙিয়া পড়ে। উঃ, আর কতদিন এই যন্ত্রণা সহিতে হইবে, কতদিন!

ঠিক এমনই সময়ে সত্য সহসা সমস্ত বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। চক্ষের পলকে বিড়ালশাবক সিংহ হইয়া দেখা দিল, কোন দ্বিধা না করিয়া সবল পুরুষকণ্ঠে তাহাকে অভয় দিল, আর কেহ তোমার না থাক্, আমি আছি। সে যেন সস্তা উপন্যাসের মহাবীর নাইট, অন্ধকারের রাজ্যের দুর্জয় প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছে, অন্ধ-কারায় বন্দিনী আলোকের কন্যাকে বুকে করিয়া সে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে আলোকের বাতাসের আনন্দের

দেশে। শিয়ালকাঁটার ঝোপে তাহারই সূচনা প্রীতি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিল।

প্রীতি এবার নিঃসংশয়ে বুঝিল, এইই তাহার যুগযুগান্তরের জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়তম ; অনন্ত কালস্রোতের পারে তিন্দুকতরুতলে বসিয়া এতদিন সে ইহারই প্রতীক্ষা করিয়া ছিল।

সংসারে একদল লোক আছে, যাহারা পরের সুখ সহিতে পারে না, পরের ব্যঞ্জন শুঁকিয়া শুঁকিয়া বেশি নুন ঢালিয়া বেড়ানোই যাহাদের স্বভাব। ইহাদের নিভৃত প্রেমের দিকে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু চক্রবর্তী ধরিয়া ফেলিলেন। সত্যকে ডাকিয়া খুব গম্ভীর হইয়া কহিলেন, এসব কি শুনছি ?

সত্য ব্যাপার আঁচ করিয়াছিল, কহিল, কি শুনছেন ?

চক্রবর্তী জ্বলিয়া কহিলেন, জান না, ন্যাকা! ওই মাগীটাকে নিয়ে এসব কি হচ্ছে ? তোমাদের জন্যে তো আর গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারি না।

আগে হইলে সত্য ইহার প্রত্যুত্তর করিতে সাহস পাইত না। কিন্তু প্রেম মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। সত্য আর সে সত্য নাই। প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত 'মাগীটা' কানে প্রবেশ করিতেই সে চটিয়া উঠিল, কহিল, আপনার মুখ না দেখাতে পারবার কি হ'ল ?

চক্রবর্তী কহিলেন, এই যে, এরই মধ্যে বেশ ডাকতে শিখেছ দেখছি। আমি তোমার বাপের বড়, তা জান ?

সত্য কহিল, আমি তো বলি নি, ছোট।

চক্রবর্তী কহিলেন, মুখে বল নি, কিন্তু কাজে যা মান্য আমাকে

দেখাচ্ছ, তাতে আমি তোমার জেঠামশাই কি শালা, সেটা বোঝা ভার হয়ে উঠেছে। হবারই কথা, আজকাল সাবালক হয়েছ তো।

সত্য জিব কাটিয়া কহিল, ছি ছি, হ'ল কি আপনার!

চক্রবর্তী কহিলেন, আর ঢঙ করতে হবে না। দেখ, লায়েকই হও আর যাই হও, জেনে রেখো, আমারও নাম বিশ্বম্ভর চক্কোত্তি। আমি গাঁয়ে যদ্দিন আছি, এসব অনাচার করা চলবে না।

সত্য কহিল, অনাচার মানে?

চক্রবর্তী দাঁত খিঁচাইয়া কহিলেন, অনাচার নয় তো কি বলব, ধর্মকর্ম করছ? কোথাকার কে একটা বেজাতের নষ্ট ছিনাল মাগীকে নিয়ে—

সত্য কহিল, চুপ। একজন ভদ্রমহিলাকে না-হক অপমান করবার কোনও অধিকার নেই আপনার।

চক্রবর্তী ফাটিয়া পড়িলেন, কি বললি বেল্লিক? অধিকার নেই? মেমসায়েবের টোলে প'ড়ে শুদ্ধ ভাষা শিখছেন ছেলে, আমাকে এসেছেন অধিকার দেখাতে! ওর বাপ কোনদিন আমার সামনে মুখ তুলে কথা কইতে পারে নি, আজ তার ছেলে আমার মুখের ওপর চোটপাট ক'রে যায়! এত বড় অপমান যদি আমি স'য়ে যাই তো আমার—

উত্তেজনায় চক্রবর্তীর কণ্ঠ বারংবার রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সত্য কহিল, আপনি মিথ্যে রাগ করছেন জেঠামশাই। আমি তো আপনাকে অপমান করতে চাই নি। আমি শুধু বলছিলাম—

চক্রবর্তী কহিলেন, থাক্ থাক্, ঢের হয়েছে। অপমান করতে চাই নি! উদ্ধার করেছেন! অপমান এতেও কর নি তো কি ক'রে আর করবে? মুখে জুতো মেরে? সে আক্ষেপটাই বা আর থাকে কেন? নাও, মার, মেরে যাও দু ঘা জুতো, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

সত্য কহিল, আপনি এমন ক'রে বুঝলে আর আমি কি করব বলুন ?

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, সে তো ঠিকই, তুমি আর কি করবে ! করতে আর বাকিই বা রেখেছ কি ? যাও, এবারে সেই ধিঙ্গি মাগীটাকে মাথায় ক'রে নাচগে, চোদ্দপুরুষ মহা খুশি হয়ে নরকে প'চে থাকবে 'খন।

সত্য প্রেমিক, এই অমার্জ্জিতরুচি ও অসংযতবাক অশিক্ষিত বৃদ্ধের সহিত অসভ্যের মত একটা ঝগড়া-চেঁচামেচির সৃষ্টি করাও আপাতত তাহার পক্ষে অশোভন। অতএব সে যথাসাধ্য সংযত হইয়া কহিল, মাথায় ক'রে নাচবার তো কথা হচ্ছে না।

চক্রবর্ত্তী চিবাইয়া চিবাইয়া কহিলেন, তবে কিসের কথা হচ্ছে ? রোজ একটু ক'রে মা-ঠাকরুণের চন্নামেত্ত খাওয়ার ?

সত্য শান্তভাবেই কহিল, তারও দরকার দেখছি না। আমি ওকে বিয়ে করব।

ঘরের মধ্যে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিল।

চক্রবর্ত্তী বিহ্বলের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন কথাটা বুঝিতে পারিতেছেন না। তারপর কহিলেন, কি ? কি করবে বললে ?

সত্য কহিল, বিয়ে।

সব করা অপেক্ষা বিয়ে করা ভাল। চক্রবর্ত্তী ঈষৎ প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হতচ্ছাড়া নচ্ছার ! এ নইলে আর বাপ ঠাকুদ্দা নরকে যাবে কি ক'রে ! ও কে, কি জাতের মেয়ে, কিছু জান ?

জানবার দরকার করে না। যে জাতেরই হোক, আজকাল নতুন আইন হয়েছে, বিয়েয় বাধবে না।

তুমি বামুনের ছেলে, সেটা খেয়াল আছে ? ওকে বিয়ে করলে

গাঁয়ে তোমাকে সুদ্ধ একঘরে হতে হবে, তোমার সব যজমানরা তোমাকে ছেড়ে দেবে, জান ?

সত্য অবিচলিত। কহিল, সেজন্যে আপনার দুশ্চিন্তার তো কোন হেতু দেখছি না। কারণ তারা আমাকে ছাড়লে, যাবে আপনার হাতেই।

চক্রবর্তী স্বর নামাইয়া কহিলেন, রাগের মাথায় যা তা ব'লো না সত্য, রাগ করবার এ কথা নয়। আমি তোমার ভাল ভেবেই বলছি। ভাল ক'রে সব দিক ভেবে দেখ।

সত্য কহিল, দেখেছি।

চক্রবর্তী কহিলেন, আচ্ছা, তাই যেন হ'ল। কিন্তু এটা শহর কলকাতা নয়, পাড়াগাঁ। আইনে এ বিয়ে না বাধতে পারে, সমাজে বাধবে। তোমার এ বিয়ের পুরুত হতে কেউ চাইবে না।

সত্য নিশ্চিন্তভাবে কহিল, আর কেউ না হয়, আপনি হবেন।

আমি! চক্রবর্তী স্থির বুঝিলেন, হয় সত্য, নয় তিনি—একজনের নিশ্চয় মাথা-খারাপ হইয়া গিয়াছে। কহিলেন, আমি যাব এই বিয়ের পুরুত হতে ?

সত্য শান্তস্বরে কহিল, হতেই হবে। নইলে আমি সবাইকে ব'লে দোব, আপনি সেদিন সন্ধ্যার পরে ও বাড়ির ছাঁচতলায় লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, জানলা দিয়ে তাকে ইশারা পর্যন্ত করেছিলেন।

চক্রবর্তী কহিলেন, কি! আমার মুখের ওপর এত বড় মিথ্যে কথা!

সত্য কহিল, মিথ্যে নয়। আমিই আপনাকে তিন-চার দিন দেখেছি। প্রায়ই আপনি রাত্রে একা একা ওই দিকে যান। কেন ?

চক্রবর্তী রোষকষায়িত নেত্রে কহিলেন, যাই তো যাই, আমার খুশি।

আমার যেখানে ইচ্ছে আমি যাব, তোমার কাছে তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি ?

সে নাই দিলেন। কিন্তু আপনাদের এই উৎপাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যেই আমি তাকে বিয়ে করব। আর পুরুতের কাজও আপনাকেই করতে হবে।

আমি কক্ষনো করব না।

তা হ'লে আমিও যা বলেছি, তাই করব।

কয়েক মুহূর্ত দুইজনের চক্ষু পরস্পরের দিকে উদ্যত হইয়া রহিল। দৃষ্টিতে দৃষ্টিতে একটা বিষম লড়াই হইয়া গেল। শেষে চক্রবর্তী কহিলেন, ভেবেছ, তুমি বললেই এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে ?

সত্য কহিল, সবাই বিশ্বাস না করলেও চলবে। জেঠাইমা করবেন।

চক্রবর্তী অনেকক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন। তারপর ক্ষীণস্বরে কহিলেন, কিন্তু আমাকে এর মধ্যে টানতে তুমি চাইছ কেন ? বরং আমি একজন'কাউকে ব'লে দিচ্ছি—

সত্য ঘাড় নাড়িয়া কহিল, উঁহু, তাতে চলবে না। আপনি গাঁয়ের মাথা। আপনি পুরুত হ'লে আর এ বিয়ে নিয়ে কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। এইজন্যেই আপনাকে কষ্ট দেওয়া।

চক্রবর্তী কহিলেন, আচ্ছা। কিন্তু দোহাই বাবা, দেখিস, তোর জেঠাইমার কানে যেন কিছু—

সত্য কহিল, যাবে না।

সেই দিন আসন্ন পূর্ণিমা-রাত্রির উচ্ছল চন্দ্রালোকে বকুলতলায় বসিয়া সত্য প্রীতিকে কহিল, আমাকে বিয়ে করবে ?

অবশ্য সত্যসত্যই আর কথাটা এইরূপ রূঢ় আকারে ও সোজাসুজি

সে বলে নাই, কেহই বলে না। কিন্তু ইহার সহিত যে বিরাট পরিমাণ অবান্তর ও কাব্য-কাব্য কথা মিশ্রিত ছিল, তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এবং উত্তরে প্রীতি চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত করিয়া সত্যর গায়ে হেলিয়া পড়িয়া দৃষ্টিতে দুষ্টামি ও ঠোঁটে চাপা হাসি খেলাইয়া যে কথা বলিল, তাহার ভাবার্থ—সত্য কি ভাবিয়াছিল, এতদিন ধরিয়া প্রীতি তাহার পিছনে ঘুরিতেছে, সে তাহার সহিত পিসীমা পাতাইবে বলিয়া? তারপর সেই চন্দ্রালোকিত বকুলতলায় বসিয়া দুইজনে বহুক্ষণ ধরিয়া আরও যে সকল প্রশ্নোত্তর হইল, তাহাও এ গল্পের দিক হইতে অপ্রাসঙ্গিক।

অধীত ও শ্রুত যাবতীয় বইয়ের সমস্ত বাছা বাছা কথাগুলি বহুবার করিয়া নিঃশেষে আবৃত্তি করা শেষ হইলে দুইজনে আবার এক সময়ে মর্ত্যের মৃত্তিকায় নামিয়া আসিল। এ কথার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, তাহারা ইতিমধ্যে বকুলগাছের ডালে চড়িয়া বসিয়াছিল। কথাগুলি খুব উচ্চদরের ভাবপূর্ণ ছিল, ইহাই আমার বক্তব্য।

মাটিতে পা দিয়া সত্য কহিল, ভাল কথা, তোমরা বামুন তো?

প্রীতি এই অতর্কিত কঠিন কথায় আহত হইল, কহিল, কেন?

সত্য কহিল, তোমাকে পাবার জন্যে, যদি দরকার হয় তো অসবর্ণ বিয়ে করতেও আমি রাজি আছি। কিন্তু তুমি বামুনের মেয়ে না হ'লে তো তোমার হাতে খেতে পারব না।

প্রীতি কহিল, নাই খেলে। আমার চুমু খাবে তো?

সত্য কহিল, তামাশা নয়, সত্যি বল।

প্রীতি ভ্রূকুঞ্চিত করিল, কহিল, আমার হাতে খেতে তোমাকে বলছে কে? তুমি কি ভেবে রেখেছ, আমাকে হিন্দুবিয়ে করবে, আর আমি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তোমাকে রেঁধে খাওয়াব?

সত্য শঙ্কিত হইয়া কহিল, তবে ?

আমাদের হবে কম্প্যানিয়নেট ম্যারেজ।

কোম্পানি বিয়ে ?

ইডিয়ট। কম্প্যানিয়নেট ম্যারেজ, মানে, আমরা হব পরস্পরের কম্প্যানিয়ন—সাথী। স্বামী স্ত্রী—ওসব সেকেলে আইডিয়া এখন অচল হয়ে গেছে। তুমি হবে আমার বন্ধু, আমি হব তোমার বান্ধবী।

বাঁধাকপি !

ইডিয়ট। বান্ধবী। এ বিয়েয় পুরুত ডাকবার দরকার হবে না, শুধু নিজের নিজের অনারের ওপর আমরা পরস্পরকে মেনে নোব। যখন খুশি এ বিয়ে ভেঙে দেওয়া যাবে। মনের মিলই যদি আমাদের কোনদিন ভেঙে যায়, সেদিন আর বাইরের অনুষ্ঠানের বাঁধন আমাদের একত্র ধ'রে রেখে আমাদের দেহমনকে বিষিয়ে তুলতে পারবে না।

সত্যর মাথা ঘুরিয়া উঠিল। প্রীটির কথার সহজ অর্থ, সে তাহাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিতে রাজি নয়। যাহার জন্য সে এইমাত্র নিজের সমাজ আত্মীয়-পরিজন উনিশ ঘর যজমান সমস্ত এক কথায় ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, তাহার মুখে এ কি ভয়ানক নিঃসঙ্কোচ আত্মপরিচয়! হা ঈশ্বর, তাহার কল্পলোকের দেবীমূর্তির অন্তর চিরিয়া অকস্মাৎ এ কি কদর্য বিচালি বাহির হইয়া পড়িল! নাঃ, সব মিথ্যা। ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই, নাই, নাই। সত্যর চক্ষুর সম্মুখে প্রকাণ্ড একটা আলোর শেজ ঝনঝন করিয়া ভাঙিয়া পড়িল, এবং তারপর তাহাকে ঘিরিয়া গভীর অন্ধকার নামিয়া আসিতে লাগিল।

সত্য নিশ্চয়ই মূর্ছিত হইত, তাহাকে রক্ষা করিল প্রীটির দ্বিতীয় আঘাত,—আমি আমার বাড়িতে রাঁধব খাব, তুমি তোমার বাড়িতে রাঁধবে খাবে।

সত্য কথা কহিতে পারিল না, ফ্যালফ্যাল করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। প্রীতি এবার লক্ষ্য করিল, সত্য কেমন করিতেছে। সান্ত্বনা দিয়া কহিল, ভুল বুঝো না, লক্ষ্মীটি। নাই বা দিলাম আমি তোমাকে রেঁধে, তাতে কি হয়েছে? রান্না আর খাওয়াই তো আর জীবনের সবখানি নয়। আর এও তো বুঝতে পার, মেয়ে পুরুষকে রেঁধে দেবে—এ নিয়ম তৈরি করেছিল স্বার্থপর পুরুষ; মেয়েকে সে করতে চেয়েছে তার দাসী। আমরা সে বর্বরযুগকে অনেক—অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। তুমি কি সত্যিই চাও, আমি তোমার সঙ্গিনী, তোমার প্রিয়া না হয়ে হই তোমার দাসী? সারাদিন ধ'রে তোমার ভাত রাঁধি, বাসন মাজি, ঘর ঝাঁট দিই? বল, চাও?

সত্য চায় কি না ভাবিতে লাগিল।

প্রীতি কহিল, আমি জানি, তুমি চাও না, চাইতে পার না। আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, আমাদের মধ্যে এই সম্বন্ধই কি সবখানি নয়? আমাদের এই প্রেম, আকাশের মতই এ হোক উদার, আজকের এই চাঁদের আলোর মত হোক স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল, এর মধ্যে হাতাখুন্তি টেনে এনে একে মলিন ক'রে তুলতে চেয়ো না।

সত্য ধরাগলায় কহিল, কিন্তু আমি যে ভাল রান্না করতে জানি না। মা যখন ম'রে গেল, সে কি দারুণ কষ্ট! কিচ্ছু রাঁধতে পারতাম না, এটা পুড়ে যেত, ওটা আধসেদ্ধ থাকত, আর সেই সব খেয়ে খেয়ে যা পেট কামড়াত!

আবার বিড়ালছানা! প্রীতি সস্নেহে দুই বাহু দ্বারা তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিল, একেবারে ভূত। মেয়েদের সামনে পেট-কামড়ানো বলতে আছে!

সত্য নিজেকে কিছুটা সামলাইয়া লইল, কহিল, কিন্তু যদি রেঁধেই না দেবে, তবে বিয়ে ক'রে আমার লাভ?

প্রীতি তাহার কানের উপর মুখ রাখিয়া চুপিচুপি কি একটা কথা বলিল, সত্য ভাল বুঝিতে পারিল না। বলিল, আর একটু চেঁচিয়ে বল, শুনি।

প্রীতি বলিল, না।

তারপর অসাড়ের মত তেমনি ভাবেই পড়িয়া রহিল। শুধু তাহার উষ্ণ ঘন নিঃশ্বাস সত্যর গলার উপরে, গালের উপরে আসিয়া পড়িতে লাগিল।

শিবরাত্রি আসিয়া পাড়ল।

সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার দিক বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতেই এক-একটা দিন এক-একটা সম্প্রদায়ের বাষিক স্বৈরাচরণের জন্য নিদিষ্ট আছে—হিন্দুর দোল, মুসলমানের মহরম। ভূতেদের দিন হইল শিবচতুর্দশী। এই দিনে তাহাদের সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা আসে, নিজেদের নিদিষ্ট গণ্ডি ছাড়াইয়া বছরে এই একটি রাত্রি তাহারা যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে, ইচ্ছামত যে কোন রূপ ধারণ করিতে পারে, যাহাকে খুশি ভর করিতে বা ভয় দেখাইতে পারে। তাই এই দিনটির প্রতীক্ষা করিয়া বহু পূর্ব হইতেই ভূতলোকে উদ্যোগ-আয়োজনের হিড়িক পড়িয়া যায়। সারা বছরের ধূলায় আচ্ছন্ন কঙ্কালগুলিকে মাজিয়া ঘষিয়া উজ্জ্বল করিয়া তোলা হয়, স্বরটাকে সাধিয়া ও কৃত্রিম প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইয়া যথোচিতরূপ অনুনাসিক করিয়া লওয়া হয়, যত সব ভয়ের জায়গায় কাহার কোথায় ডিউটি পড়িবে, তাহার ছক কাটা আরম্ভ হইয়া যায়। গলায়-দড়ে ভূতেরা পা ছড়াইয়া নূতন দড়ি পাকাইতে বসে, আলেয়া ভূতেরা কাঠিতে আলকাতরা মাখাইয়া মশাল তৈরি করিয়া লয়, মামদো ভূতেরা রাশিকৃত কাঁচা পেঁয়াজ ও হিং

চিবাইয়া মুখে সুগন্ধ সঞ্চয় করিতে লাগিয়া যায়, পেত্নীরা কাপড় ক্ষারে কাচিয়া সাদা ধবধবে করিয়া তোলে, গোভূতরা শিঙ ঘষিয়া ঘষিয়া গাছের গুঁড়ি ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলে।

চতুর্দশীর আর দিন দুই বাকি। দুপুরবেলা সত্য বসিয়া তাহার মাথার খুলিটাকে আমরুলশাক ও বালি দিয়া ঘষিয়া চকচকে করিয়া তুলিতেছিল। বাহির হইতে চক্রবর্ত্তী ডাকিলেন, সত্য আছ নাকি?

সত্য সাড়া দিয়া কহিল, আসুন।

চক্রবর্ত্তী বসিয়া কহিলেন, ও কি হচ্ছে?

সত্য কহিল, দেখুন না কাণ্ড। মাথাটা রয়েছে বেড়ার গায়ে টাঙানো, আজ নাবিয়ে দেখি না তার মধ্যে এক মাকড়সা দিব্যি বাসা ক'রে ব'সে আছেন।—বলিয়া খুলিটাকে তুলিয়া আলোতে ধরিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, নাঃ, আর বেশি নেই, হয়ে এসেছে।

চক্রবর্ত্তী নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, আর মিথ্যে এখন ওসব করা।

সত্য মুখ তুলিয়া কহিল, তার মানে?

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, তাই তো বলছি। আমরা ম'রে গিয়ে অবধি পৃথিবীতে কি আর ধর্ম্মকর্ম ব'লে কিছু আছে! শুনছি নাকি আজকাল আর কেউ ভূত আছে ব'লেই মানতে চায় না, তা ওসব দিয়ে আর কি হবে! আবার তাঁহার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

সত্য সবিস্ময়ে কহিল, ভূত মানে না! কোথায় শুনলেন?

বলি শোন। বিপিন দত্ত গিয়েছিল কাল রাত্তিরে স্টেশনের দিকে। সে দেখে এসেছে, দুটো ছেলে কাল গাড়ি থেকে নেবে স্টেশনে রাত কাটিয়েছে। তারা নাকি এর আগেকার কোন্ স্টেশনে যাবে ব'লে গাড়ি চড়েছিল, জায়গা ভুল ক'রে অ্যাদ্দুর চ'লে এসেছে।

তারপর?

তারপর, স্টেশন-মাস্টার তাদের বারণ করেছিল নাবতে, তারা সে কথা গায়েই মাখে নি। হেসে বলেছে, ভূত-ফুত আজকাল আর কেউ মানে না মশাই। আর দেখিয়েও তো দিলে তাই—সারাটা রাত খোলা বারান্দায় প'ড়ে দিব্যি ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে গেল!—বলিয়া চক্রবর্ত্তী একান্ত মলিনমুখে আরও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

সত্য কহিল, তা বিপিন দত্তই বা কি করলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? তাদের ঘাড় দুটো মটকে দিতে পারলে না? নিদেন খানিক ভয়ও তো দেখাতে পারত।

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, তাকে তো আর বেশি দোষ দেওয়া যায় না, বুড়ো মানুষ, তায় আবার তার হাঁপানি। ওরকম দু-দুটো ষণ্ডা গোঁয়ারকে সে শুধু-হাতে ঘাঁটাতে যায় কোন্ ভরসায়! সবই কপাল, নইলে আজ কোত্থেকে দুটো চ্যাংড়া ছোঁড়া এসে এমন ক'রে গাঁকে গাঁ সুদ্ধু ভূতকে বেইজ্জৎ ক'রে চ'লে যেতে পারে!

তাঁহার ক্ষোভের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া সত্য চুপ করিয়া রহিল।

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, আর হবেই বা না কেন! মানুষ কলে না পড়লে কাউকেই ডরায় না। আগেকার দিনে হামেশা ভূতের হাতে মানুষ মরত, তারাও আমাদের সমীহ ক'রে চলত। এখনকার ইংরিজী-পড়া নব্য ভূত তোমরা, জান খালি খেতে আর ইয়াকি দিতে, আর কাঁচাবয়সী পেত্নীর পেছনে ঘুরতে। এই তো এত বছর ধ'রে দেখছি, নিত্যি দু বেলা লোকজন গাঁয়ে আসে যায়, কটা লোক আজ পর্যন্ত মরেছে, ভয় পেয়েছে, বল?

সত্য মানিয়া লইল, সে কথা ঠিক।

তারপর দুইজনে বসিয়া বহুক্ষণ পরামর্শ হইল। শেষ পর্যন্ত স্থির

হইল, চতুর্দশীর রাত্রে অন্তত একটা ঘাড় মটকাইতে হইবে, নহিলে গ্রামের মানসম্ভ্রম আর থাকে না।

চতুর্দশী।

রাত্রের প্রথম ট্রেন আটটায়। সন্ধ্যা হইতেই দুইজনে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া। যথাসময়ে গাড়ি আসিল। স্টেশন-মাস্টার নিত্যকার মতই কুলি সিগ্‌নালম্যান প্রভৃতিতে পরিবেষ্টিত হইয়া গাড়ি পাস করাইয়া দিতে শূন্য প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গার্ড সাহেব গাড়ির জানালায় ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত যথারীতি কুশলপ্রশ্ন বিনিময় করিতেছেন, ইহারই মধ্যে এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সেকেণ্ড ক্লাসে একটা ইহুদী ছেলে চলিয়াছিল, সে পাঁচ মিনিট স্টপেজ পাইয়া একটু বেড়াইয়া লইতে প্ল্যাটফর্মে নামিয়া পড়িল। স্টেশন-মাস্টার হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিতে না উঠিতে অতর্কিতে সত্য তাহাকে পিছন হইতে জাপটাইয়া ধরিল, আর চক্রবর্তী দিলেন বিপুল শক্তিতে এক ঝটকায় তাহার ঘাড়টা ভাঙিয়া; ছোকরা একেবারে ঢিপ করিয়া প্ল্যাটফর্মে পড়িয়া গেল। স্টেশন-মাস্টার চীৎকার করিয়া উঠিলেন; মুহূর্তে কৌতূহলী যাত্রীর দলে প্ল্যাটফর্ম ভরিয়া গেল। সত্য বা চক্রবর্তীকে কেহ দেখিতে না পাইলেও এ কাহার কাজ তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সকলে আবার হুড়মুড় করিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। স্টেশন-মাস্টারও সঙ্গীসাথীদের লইয়া গাড়িতে চড়িয়া বসিলেন, গার্ডকে কহিলেন, সায়েব, খুন হব যদি আমাদের একা ফেলে রেখে যাও।

গাড়ি দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে সত্য কহিল, বিশ্বাস হ'ল তো, এখনও লোকে আমাদের ভয় করে? চলুন, ফেরা যাক।

চলিবার উপক্রম করিতেই ইহুদী কহিল, আমি এখানে থাকব কোথায় ?

চক্রবর্তী কহিলেন, এই রাত্রে আর যাবে কোথায়, চল আমাদের সঙ্গেই।

স্টেশন ছাড়াইয়া আসিয়া চক্রবর্তী কহিলেন, নেহাৎ দায়ে প'ড়েই অহেতুক তোমার ঘাড়টা ভাঙতে হ'ল বাবা, কিছু মনে ক'রো না। তোমার নামটি ?

ইহুদী কহিল, সলোমন কোহেন।

তোমরা—আপনারা ?

ইহুদী প্রশ্নটা বুঝিল না। সত্য কহিল, তোমরা কি জাত ?

ইহুদী।

সর্বনাশ! চক্রবর্তী চলিতে চলিতে থামিয়া কহিলেন, সত্য, একে এখন জায়গা দিই কোথায় ?

সত্য কহিল, সে হয়ে যাবে 'খন। চলুন না।

স্বহস্তে খাল কাটিয়া কি কুমীরই যে ঘরে ঢুকানো হইতেছিল, তাহা সত্য তখন বুঝে নাই। যখন বুঝিল, তখন আর নিজের হাত কামড়াইয়া মরা ছাড়া করিবারও কিছু তাহার চোখে পড়িল না।

কোহেনকে বামুনপাড়ার বাহিরে একটা প'ড়ো বাড়িতে বাসা দেওয়া হইয়াছিল। ছোকরা যোগাড়ে। সপ্তাহ না কাটিতেই দেখা গেল, সে প্রীটির সঙ্গে চমৎকার জমাইয়া লইয়াছে।

সত্য ফুঁশিতে লাগিল। প্রীটিকে এক ফাঁকে একা পাইয়া কহিল, এসব কি হচ্ছে, শুনি ?

প্রীটি কহিল, কি হচ্ছে ?

সত্য কহিল, ও ছোঁড়াটার সঙ্গে অত খাতির কিসের তোমার? সারাদিন দুটিতে একসঙ্গে ঘুরঘুর ক'রে বেড়ানো, পারঘাটায় মাছ আনতে যাওয়া, সন্ধ্যের পরেও অন্ধকারে অনেক রাত অবধি বাইরে কাটানো—এসবের মানে কি বুঝতে পারি না?

প্রীতি ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল, তোমার কি?

সত্য কহিল, আমার নয়, কার? আমাকে রেঁধে খাওয়াতে তোমার মান ক্ষ'য়ে যায়, ওটাকে তো দিব্যি খাওয়াচ্ছ!

প্রীতি কহিল, আমার ইচ্ছে আমি খাওয়াব। ওঃ, ভারি আমার ইয়ে এসেছেন, মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা কইতে পাবে না!

এর নাম কথা কওয়া? এসব চলবে না ব'লে দিচ্ছি।

প্রীতি কহিল, তোমার কথায়? আমি কি তোমার কেনা বাঁদী? আর ওর হিংসেয় জ্ব'লে মরছ, তবু যদি ওর যা পার্টস্ আছে, তার ক্ষাউও নিজের থাকত!

সত্য চিবাইয়া চিবাইয়া কহিল, ইস্, গ'লে গেলে যে একেবারে! রঙ্গিণী!

প্রীতি কহিল, তুমি ছোটলোক। কোহেন এটিকেট-জানা স্মার্ট ছেলে, তোমার মত পাড়াগাঁয়ে ভূত নয়। ইতর কুচুটে কোথাকার!

সত্য কহিল, আমি ভূত, আর তুমি নিজে পেত্নী নও?

প্রীতি কহিল, খবরদার, গালাগাল দিও না ব'লে দিচ্ছি।

সত্য কহিল, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। কিন্তু তুমি বাড়াবাড়ি করছ। এ আমি সইব না, এই তোমাকে ব'লে দিলাম।

প্রীতি ঝঙ্কার দিয়া কহিল, আমার যা খুশি আমি করব। তোমার না পোষায়, খ'সে পড়। আমাকে তোমার হিন্দুবিয়ে-করা বউ পাও নি যে, নাহক চোখ রাঙাবে আর আমি চুপ ক'রে তাই সইব।

সত্য ম্লানমুখে চলিয়া আসিল।

চক্রবর্তী সুবিধাবাদী। শুনিয়া কহিলেন, ভালই হয়েছে, বেটী তোমার ঘাড় থেকে ভালয় ভালয় নেবে গেল। এবার বেশ একটি লক্ষ্মী মেয়ে দেখে বিয়ে ক'রে সংসারী হও। ওসব ঘোড়ায়-চড়া শহুরে পেত্নী কি আর আমাদের সয়!

সত্য উত্তর করিল না।

চক্রবর্তী পুনরায় কহিলেন, আর এসব মেয়েকে গাঁয়ে থাকতে দেওয়া কোনমতেই উচিত নয়। গাঁয়ে ছেলেছোকরারা সব রয়েছে—বলে, পুরুষের মতি, না পদ্মপত্রে জল। নিজেকে দিয়েই তো বুঝছ। আর দেরি নয়, ওদের গাঁ থেকে তাড়াতেই হবে।

সত্য কহিল, কি ক'রে তাড়াবেন?

চক্রবর্তী কহিলেন, সে আমি ঠিক ক'রে রেখেছি। আমাদের নবু তো উকিলের মুহুরী হয়েছিল, জানে শোনে। সে বললে, ছোঁড়াটা যখন কলকাতার টিকিট কিনে মরেছে, আইনত ও রেলে চ'ড়ে কলকাতা অবধি যেতে পারে। ওই সঙ্গে অমনি ছুঁড়িটাকেও যেতে হবে।

সত্য উদ্গত অশ্রু সামলাইয়া বিবর্ণমুখে কহিল, সেই ভাল।

আবার তেমনই এক রাত্রি। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া প্রীতি, কোহেন, সত্য ও চক্রবর্তী।

সত্য এ কয়দিন প্রীতির সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে নাই। কিন্তু যাত্রার পূর্বক্ষণে প্রীতি নিজে মুখ ফুটিয়া অনুরোধ করিয়াছিল স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে আসিতে। সত্যর আসিতে বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। নিজের হৃৎপিণ্ডটা বুক ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া একটা হতভাগা উড়নচণ্ডের সঙ্গে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিতেছে, এ দৃশ্য চোখ চাহিয়া দেখা সহজ নয়। তবুও প্রীতির এই

শেষ অনুরোধটিকে সে ঠেলিতে পারে নাই। চক্রবর্তী আসিয়াছেন, ইহারা যাহাতে ভালয় ভালয় বিদায় হইয়া যায়, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে।

গাড়ি আসিয়া প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইল।

প্রীতি কহিল, কোহেন, উঠে পড়। আমি আসছি এক্ষুনি।

কোহেন গাড়িতে উঠিল। প্রীতি কহিল, সত্যদা, শোন।

সত্য ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

চক্রবর্তী অদূরে পায়চারি করিতেছেন।

প্রীতি কহিল, বল, আমাকে তুমি মাফ করলে?

সত্য নীরব। প্রীতির মুখের দিকে সে চাহিতে পারিতেছিল না।

প্রীতি কহিল, দুঃখ ক'রো না। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা কাল্‌চার সোসাইটি সব আলাদা—তোমার সঙ্গে চিরকাল এমন ক'রে থাকা আমার চলত না। বরং এ ভালই হ'ল, একটা ফ্রেণ্ড্‌লি বোঝাপড়ার ভেতর দিয়েই আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'ল। কিন্তু তাই ব'লে মনে ক'রো না, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হচ্ছে না। তোমাকে আমি খুবই ভালবেসেছিলাম সত্যদা, এখনও বাসি।

তাহার পাতলা গোলাপী ঠোঁট ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, চোখের পাতায় এক ফোঁটা জল স্টেশনের ক্ষীণ আলোয় ঝিকমিক করিতে লাগিল, কহিল, বল, মাফ করলে?

সত্য অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কহিল, হুঁ।

প্রীতি কহিল, তোমাকে আমি কক্ষনও ভুলব না সত্যদা, ভুলতে পারব না। যেখানেই যাই, যেমনই থাকি, আজীবন বন্ধু ব'লে, ভাই ব'লে তোমাকে মনে রাখব। তুমি আমাকে ভুলে যাবে না? বল, মনে রাখবে?

সত্য তেমন করিয়া কহিল, হুঁ।

প্রীতি কহিল, তবে যাবার বেলায় তুমি আমাকে পবিত্র একটি প্লেটোনিক চুমো খেয়ে বিদায় দাও।

সত্য নড়িল না।

প্রীতি কহিল, সত্যদা, সময় নেই আর।

সত্য মুখ ফিরাইয়া চাহিল। প্রীতির মৃদুকম্পমান পাতলা গোলাপী ঠোঁট, ঈষদুন্মুক্ত সুন্দর সুগঠিত দাঁতের সারি—

প্রীতি তাহার বুকের একান্ত কাছে সরিয়া আসিয়া মুখ উঁচু করিয়া চোখ বুজিল।

ধুত্তোর প্লেটোনিক। সত্য এক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল, তারপর দুই হাতে তাহার মুখটা তুলিয়া ধরিয়া মুখ নত করিল।

তারপরই তাহার চিত্ত আর স্ববশে রহিল না। দেহের সমস্ত রক্ত উদ্দাম হইয়া ধমনীতে প্রখর বেগে ছুটিয়া চলিল, কানের মধ্যে দপদপ করিতে লাগিল, হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের উপরে দুপদুপ করিয়া আঘাত করিতে লাগিল, নিশ্বাস ঘন ও দ্রুত হইয়া পড়িতে লাগিল, নাসিকা স্ফীত হইল, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল, কণ্ঠার কাছটায় কি একটা ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল, মানবদেহের শাশ্বত অথচ চিররহস্যময় উত্তেজনার সাড়ায় সমস্ত দেহ তাহার থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তবুও একবার প্রাণপণ বলে সে আপনার প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে শেষ চেষ্টা করিল; তারপর যে চিরন্তন দুর্দমনীয় রিপুর কাছে বড় বড় মুনিঋষিরা পর্যন্ত হার মানিয়াছেন, সেও তাহার হাতে অন্ধের মত আত্মসমর্পণ করিল; দুই হাতে প্রীতির বব খামচাইয়া ধরিয়া সজোরে এক ঝাঁকুনি লাগাইয়া বিকৃতস্বরে কহিল, হারামজাদী!

প্রীতি চেঁচাইয়া উঠিল, উঃ!

পলক না পড়িতে কোহেন ছুটিয়া আসিয়া সত্যর পিঠে গোটা দুই-তিন কিল মারিল, এবং চক্রবর্তী কোহেনের মাথায় বিপুল এক চাঁটি কশাইলেন।

সবসুদ্ধ সে এক কাণ্ড। লোক দেখা যায় না, খালি ঝুটাপুটির শব্দ, মারামারির শব্দ, চীৎকার—একগাড়ি লোক নিথর নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল; স্টেশন-মাস্টার দলবল সহ যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেইখানেই জমিয়া গেলেন; ড্রাইভার এক ছোকরা পার্শী, তাহার বিপৎকালে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিল—গাড়ি চালাইয়া সে ঘণ্টায় ছত্রিশ মাইল বেগে পলাইতে পারিত, তাহা ভুলিয়া সে ইঞ্জিন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বনজঙ্গল ভাঙিয়া ঘণ্টায় ছয় মাইল বেগে দৌড় মারিল।

সত্য ও কোহেন তখন লুটোপুটি খাইতেছে। প্রীতি দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, হঠাৎ সে চেঁচাইয়া কহিল, দাঁদাদ্‌দাঁড়াও।

তারপর পার্শীর পিছন পিছন ছুট দিল।

তাহার চীৎকার দুইজনেই শুনিয়াছিল, পরস্পরকে ছাড়িয়া চাহিল, দাদা আবার ইহার মধ্যে কে আসিল!

সত্য কহিল, ওই কি ওর দাদা নাকি?

কোহেন বুদ্ধিমান, কহিল, ওর বাবাকেলে দাদা। ছোটো, ভাগল বেটী।

ড্রাইভার ছোকরা চোখ বুজিয়া ছুটিতেছিল। হঠাৎ তাহার পায়ে কিসে টক্কর লাগিল, তারপর হুড়মুড় করিয়া খানার মধ্যে পড়িয়া তাহার মেরুদণ্ড মটকাইয়া গেল। নিশ্চল দেহটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই প্রীতি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কহিল, এতক্ষণে এলে প্রিয়তম!

সত্য ও কোহেন দাঁড়াইয়া দেখিল। তারপর কোহেন কহিল, আর

আমাদের ঝগড়া নেই। উই হ্যাভ বোঁথ বীন ডিউপ্‌ড। হাত বাড়াইয়া বলিল, শেক।

প্রীটির হাত ধরিয়া পার্শী গিয়া ইঞ্জিনে উঠিল।

গ্রামে শান্তি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু রেল-কোম্পানি এত জানিল না। কয়মাসের মধ্যে তিনটা লোমহর্ষণ মৃত্যু, হেডকোয়ার্টারে জোর লেখালেখি হইতে লাগিল, এবং শেষ পর্যন্ত স্টেশনটি উঠিয়া গেল।

দি গ্রেট ঈস্টার্ন কোশ্চেন

হরিশ মুখার্জি রোডে কবিরাজ নলিনী সেনের ডিস্পেন্সারি। ডিস্পেন্সারিটি ছোট; কিন্তু সেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যায় যে আড্ডাটির অধিবেশন হয়, তাহার গুরুত্ব কম নয়। কারণ বাড়িওয়ালা নিতাইবাবু অতি অমায়িক লোক, এবং এই আড্ডায় অবিদ্বানের স্থান নাই।

সম্প্রতি কয়েকদিন ধরিয়া রেভল্যুশন-তত্ত্ব লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। কবিরাজের ভাগিনেয় অমল এক ফিরিঙ্গীর নিকট হইতে একটা কুকুরছানা কিনিয়াছে, তাহার লেজ কাটা। আলোচনার আরম্ভ সেই কাটা লেজকে উপলক্ষ্য করিয়া।

পাড়ার সরকারী প্রভাতদা মন্তব্য করিলেন, রেভল্যুশনের শুরু এমনি ক'রেই হয়ে থাকে।

নিতাইবাবু কহিলেন, ভাল ভাল কথা ডিক্শনারি-ভর্তি প'ড়ে রয়েছে, তবু কেন যে এসব রিস্কি কথাবার্তা টেনে আনেন বুঝি না। কুকুরের ল্যাজের মধ্যেও রেভল্যুশন সেঁধিয়েছে, আর কি জায়গা নেই?

প্রভাতদা কহিলেন, ল্যাজ আপনার গায়ে লাগল না নাকি? ল্যাজ একটা সোজা জিনিস!

নিতাইবাবু কহিলেন, মানলাম, খুবই ব্যাঁকা। কিন্তু কুকুরছানার ল্যাজ নেই, এর মধ্যে রেভল্যুশন এল কোত্থেকে?

প্রভাতদা কহিলেন, আনতে জানলেই আসে। চোখ থাকা চাই।

গোপেনবাবু কহিলেন, চোখ তো আমাদের নেই, খালি ওঁরই আছে। তবু যদি না প্লাস-সেভ্‌ন চশমা পরতে হ'ত!

প্রভাতদা কহিলেন, চশমা আছে ব'লেই তো তোমরা যেটা দেখতে পাও না, আমি দেখতে পাই।

গোপেনবাবু হাত বাড়াইয়া কহিলেন, দেখি চশমাটা। সেটা পরিয়া কুকুরছানার দিকে চাহিয়া কহিলেন, বিশেষ তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তখনও ল্যাজ ছিল না, এখনও নেই। লাভের মধ্যে ঘরের মেঝেটাই শুধু উঁচু-নীচু এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গেল।

নিতাইবাবু কহিলেন, আপনি রাখুন তো চশমা। আমার দু-পুরুষের বাড়ি মশাই।

প্রভাতদা চশমা ফিরাইয়া লইয়া কহিলেন, দেখে তো সবাই, বোঝে কজন? মেঝে উঁচু দেখাবার মানে জান?

গোপেনবাবু কহিলেন, তারও মানে আছে?

প্রভাতদা কহিলেন, নেই? ওর মানে হচ্ছে, এ চশমা পরলে লেভেল অব লুক-আউট উঁচু হয়ে যায়। তোমার চাইতে আমার নজর উঁচু আর লম্বা। এটা বাইফোকাল, দূরদৃষ্টিও বাড়ায়।

নিতাইবাবু কহিলেন, কিন্তু কুকুরছানার ল্যাজের ভেতর রেভল্যুশন কোথায় হ'ল, সেটা বলুন।

শোনা যায়, একদা নিতাইবাবু একান্ত নিঃসম্বল ও নিঃসহায় অবস্থায় কলিকাতা শহরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই অবস্থা হইতে অধ্যবসায়ের জোরে তিনি এখন প্রকাণ্ড লোহার কারবার করিয়াছেন। স্বভাবগত অধ্যবসায় তাঁহার সকল ব্যাপারেই জাগিয়া থাকে, কোন কথাকে মাঝপথে ছাড়িয়া দেওয়া তাঁহার নিয়ম-বহির্ভূত।

প্রভাতদা কহিলেন, রেভল্যুশন মানে জানেন তো? র‍্যাপিড

ইভল্যুশন। বাঁদরের ল্যাজ খ'সে গিয়ে মানুষ হতে হাজার হাজার বছর লেগেছে, তাকে বলে ইভল্যুশন। রাতারাতি তার ল্যাজ কেটে দিয়ে তাকে মানুষ ক'রে যদি তোলা যেত, তবে সেটা হ'ত রেভল্যুশন।

গোপেনবাবু কহিলেন, রাবিশ। বাঁদরের ল্যাজ কেটে দিলেই সে মানুষ হয় না। তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না।

প্রভাতদা কহিলেন, আহা, কাটা মানে কি দা দিয়ে কুপিয়ে কাটা! সায়ান্টিফিক্যালি কাটতে পারলে মানুষ হতে বাধ্য, তা সে যত বড় বাঁদরই হোক।

নিতাইবাবু কহিলেন, বাঁদর যেতে দিন। কুকুরের কি হ'ল?

প্রভাতদা কহিলেন, ল্যাজ কাটা গেল। এমনি ক'রে কেটে কেটে হয়তো একদিন কুকুরও ল্যাজবর্জিত হয়ে কোন উচ্চতর জীবে দাঁড়িয়ে যাবে। টেবির ল্যাজ-কাটার মধ্যে সেই মহান্ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রয়েছে। কি বলিস টেবি?—বলিয়া প্রভাতদা টেবির দিকে একটা আঙুল প্রসারিত করিলেন। টেবি আনন্দিত হইল, কিন্তু লেজ নাড়িল না। ইচ্ছার অভাবে নয়, লেজের অভাব বলিয়া।

তর্কটার কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না। কবিরাজের ভ্রাতা সত্য সেন সায়ান্সের প্রফেসর। তিনি ঘোরতর আপত্তি করিয়া কহিলেন, বাজে। বাঁদর আর মানুষের মধ্যে যে তফাত, শুধু ল্যাজ দিয়ে তার মাপ হয় না। আর ল্যাজ কেটে দিলেই বাঁদর মানুষ হবে বা ল্যাজ জুড়ে দিলেই মানুষ বাঁদর হয়ে যাবে, এমন কথাও কোন সায়ান্টিস্ট বলে না।

প্রভাতদা কহিলেন, আরে ভাই, ল্যাজ না থেকেও কত মানুষ বাঁদর হয়ে গেল দেখলাম, তা ল্যাজ গজিয়ে! সায়ান্টিস্টরা কি বলে, সে আমারও পড়া আছে।

গোপেনবাবু কহিলেন, ছাই আছে।

প্রভাতদা কহিলেন, নিয়ে এস তো তুমি একটা সায়ান্টিস্ট, যে জোর ক'রে বলতে পারে, কুকুর কখনও কোনদিন এর চাইতে হায়ার লেভেলে উঠতে পারবে না।

অমল কহিল, আলবৎ পারবে, এখুনি পারবে। ওঠ্‌ তো রে টেবি। —বলিয়া তাহাকে উঠাইয়া একটা চেয়ারের উপরে খাড়া করিয়া দিল। কহিল, এই নিন, দেড় ফুট হায়ার লেভেল হয়ে গেল।

ইহার পর তুমুল কোলাহল বাধিত, রক্ষা করিলেন কবিরাজ। ঠিক ক্ষণটি বুঝিয়া তাঁহার বেবি-অষ্টিন দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং অবিলম্বে তিনি গৃহে পদার্পণ করিয়া হাঁকিলেন, এই, চেয়ারের ওপর কুকুর কেন? নামা শিগগির।

অমল কহিল, চেয়ারডগ।

কবিরাজ কহিলেন, কুকুরকে চেয়ারে বসাতে হয়, নিজে চেয়ার কিনে নাওগে। আমার চেয়ার নোংরা ক'রে ওসব চলবে না। মামার বাড়ির আবদার পেয়েছ?

অমল সচ্চরিত্র ছেলে, প্রয়োজন না থাকিলে গুরুজনের মুখে মুখে তর্ক করে না। গম্ভীর মুখে কুকুরকে নামাইয়া লইয়া কহিল, এটা আমার মামার বাড়ি ব'লেই যেন শুনেছিলাম। চল্‌ রে টেবি।

তখনকার মত তর্ক থামিল। কিন্তু শেষ হইল না। পরের দিন আবার ওই আলোচনাই চলিল। তাহার পরের দিনও। হয়তো আরও দুই-চার দিন চলিত, কিন্তু হঠাৎ অসময়ে বৃষ্টি নামিয়া অতর্কিতে এমনই দুর্যোগ শুরু হইয়া গেল যে, পুরা তিনটি দিনের মধ্যে বাড়ির বাহির হইয়া আড্ডা দিতে যাইবার কথা বিশাল কলিকাতা শহরের একটি মানুষও কল্পনা করিতে পারিল না। এবং তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় বৃষ্টি

ধরিয়া গেলে আবার সকলে ডিস্পেন্সারিতে সমবেত হইলেও, প্রভাতদা প্রথম হইতেই এমন বিষম গম্ভীর হইয়া রাহলেন যে, সহসা তাঁহাকে ঘাঁটাইয়া তুলিতে কেহই প্রায় সাহস করিলেন না।

কিন্তু নিতাইবাবু নাছোড়বান্দা। প্রভাতদাকে কথাটা বলিবার প্রথম অবসর মিলিতেই তিনি বলিয়া বসিলেন, তারপর প্রভাতদা, সেদিনকার কথাটার তো কই শেষ হ'ল না!

প্রভাতদা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, না মশাই। একেই তো চারদিকে ধুমধড়াক্কা লেগে আছে, তার ওপর আর মিছিমিছি কুকথা ব'লে শত্তুর বাড়াই কেন? ওর মধ্যে আর নেই।

প্রভাতদা একটা তাকিয়া টানিয়া লইলেন।

কবিরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র ফণি কহিল, এঃ, আবার জল এল!

সত্যই, বাহিরে বৃষ্টি আবার পড়িতে শুরু করিয়াছিল।

প্রভাতদা কহিলেন, নিশ্চিন্তি। তা হ'লে ভদ্দরলোক হয়েই বসা যাক। এ বিষ্টি আর শিগগির থামছে না। কবরেজ মশাই, আজ আর বেরোবেন না?

কবিরাজ কহিলেন, এই বাদলায় রাত্তিরে আর বেরোয় না। ফণি, ড্রাইভারকে ব'লে দে তো, গাড়ি তুলে দিক।

ফণি ড্রাইভারকে বলিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই চাপিয়া বৃষ্টি নামিল। প্রভাতদা চাদরটা ঝাড়িয়া গায়ে জড়াইয়া কহিলেন, তারপর, এ দুদিন কার কেমন কাটল, শুনি?

নিতাইবাবু কহিলেন, রকম আর কি, বাদলায় সবারই এক হাল। ঢালা হোম ইন্টার্নমেন্ট।

প্রভাতদা কহিলেন, অমল কি বল? নববর্ষায় কবিতা-টবিতা নতুন কিছু বেরুল?

অমল কহিল, দূর।

প্রভাতদা সাশ্চর্যে কহিলেন, দূর কি হে? এমন আষাঢ়সজলঘন আঁধারে, শুনলাম, গোপেন অবধি একটা 'সঞ্চয়িতা' কিনে ফেলেছে, আর তুমি কিছু লেখো নি? এ হয় কখনও? কিচ্ছু না? অন্তত একটা সনেট? কি চার লাইন লেখন?

গোপেনবাবু তর্জিয়া কহিলেন, কে বলেছে তোমাকে, আমি 'সঞ্চয়িতা' কিনেছি?

প্রভাতদা দুই চক্ষু ছাতে তুলিয়া কহিলেন, তারা তারা! কালী করুণাময়ী!

ওদিক হইতে ফণি হঠাৎ কহিল, প্রভাতদা, দেখুন তো, আপনার কি একটা বোধ হয় পকেট থেকে প'ড়ে গেছে।

প্রভাতদা শশব্যস্তে ঝুঁকিয়া মেঝে হইতে একটা ভাঁজ-করা ঢাউস সাইজের কাগজ তুলিয়া লইয়া কহিলেন, এঃ-হে-হে, এক্ষুনি সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছিল তো।

নিতাইবাবু কহিলেন, খুব দরকারী তো? তা নইলে আর পকেট থেকে প'ড়ে যায়!

প্রভাতদা কাগজখানা মেলিয়া ফরাশের উপরে বিছাইয়া ধরিয়া কহিলেন, আরে, এইজন্যেই তো আজ বাদল মাথায় ক'রে আসা। জাপানের নতুন খবর আছে।

সকলে দেখিলেন, কাগজখানা প্রকাণ্ড, তাহার আগাগোড়া সারিবদ্ধ জাহাজের ছবিতে ভর্তি। অমল কহিল, এত জাহাজের ছবি কি হবে?

প্রভাতদা গভীরভাবে হাসিয়া কহিলেন, ছেলেমানুষ। জাহাজ ঠাওরালে বুঝি? জাহাজ নয়, এটা হচ্ছে জাপানের একটা খবরের কাগজ।

নিতাইবাবু কহিলেন, জাপানী কাগজ কলকাতায় আসে নাকি?

প্রভাতদা কাগজটাকে সযত্নে মুড়িয়া পকেটে রাখিয়া কহিলেন, পাগল! এ কাগজটা শুধু আমার আসে। সেও আবার কত কল-কায়দা ক'রে। জাপানের, মায় গোটা ঈস্টার্ন কোশ্চেনের এমন সব খবর এতে থাকে, যা আর কোনও পেপারে পাবেন না। খুব বড় কাগজ, বিশেষ ক'রে হালের এই ঝাঁজি রেভল্যুশনটার খবর ছেপে এরা দারুণ টাকা পিটে নিচ্ছে। সেন্সরে কাগজ আসা বারণ। এ হচ্ছে স্মাগ্‌লড, আমার একটি জাপানী ফ্রেণ্ড আমাকে পাঠিয়ে দেন।

গোপেনবাবু কহিলেন, ঝাঁজি রেভল্যুশন আবার কি? জাপানে রেভল্যুশনই বা কবে হ'ল? যত সব ইয়ে।

প্রভাতদা কহিলেন, আছে আছে, তোমরা জানবে কোত্থেকে! রয়টার, এ. পি. কি আর সব সত্যি খবর পায়, না কাগজেই সব ছাপে? সেন্সরে সেন্সরে সব কাঁটাবন বানিয়ে রেখেছে না! রেভল্যুশন হয়ে গেছে মার্চ-এপ্রিলে। সত্যি, কিছু শোন নি?

নিতাইবাবু কহিলেন, কিচ্ছু না।

চান তো বলতে পারি, কিন্তু ভাই, খুব সাবধান, প্রকাশ না হয়। বাইরে রটেছে কি হুলুস্থুল প'ড়ে যাবে, মাঝখান থেকে আমার কাগজ পাওয়াটা যাবে বন্ধ হয়ে। ইণ্ডিয়াতে আসতে দেয় না কিনা।

গোপেনবাবু কহিলেন, দাঁড়াও। এর মধ্যে কুকুর নেই তো?

প্রভাতদা কহিলেন, না। কুকুর নেই, বেড়াল নেই, বাঘ নেই, ভালুক নেই, সিংহ নেই, হাতী নেই, গণ্ডার নেই—

গোপেনবাবু না দমিয়া কহিলেন, বাঁদর? বাঁদরের ল্যাজ?

প্রভাতদা কহিলেন, অত ঘাবড়াও কেন? কি আছে আর কি নেই, সে তো দেখতেই পাবে এখুনি।

নিতাইবাবু কহিলেন, আঃ, গোপেনবাবু, আগে থেকে কু ডাকছেন কেন? ওকে বলতেই দিন আগে। বলুন প্রভাতদা।

প্রভাতদা সিধা হইয়া বসিয়া তাকিয়াটা আর একটু টানিয়া লইয়া কহিলেন, শুনুন তবে। আপনারা দেশবিদেশের হিষ্ট্রির বই পড়েন, কিন্তু বইয়ে যা থাকে, তার বেশির ভাগই হচ্ছে সাজানো, যাকে বলে টাচট্ আপ। এই রেভল্যুশনটিকে ঠিকমত বুঝতে হ'লে জাপানের সত্যিকার হিষ্ট্রি একটু জেনে নিতে হবে। আমি অবিশ্যি একেবারে গোড়া থেকেই বলব।

জাপান সম্বন্ধে একটা কথা আপনারা শুনেছেন, জাপানে বাঙালিয়ানার ছাপ খুব বেশি। কি ক'রে সেটা জাপানে গেল, গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি তার খানিকটা খুঁজে বার করেছে। বাকিটা আমি বলছি।

জাপানের গোড়াকার লোক যারা, তাদের বলে আইনু। তাদের কতক এসেছিল সাইবেরিয়া থেকে, কতক যায় বাংলা থেকে—মালয় ঘুরে আর ইন্দোচীন-আনামের পথে। ওখানে গিয়ে সব মিলে-মিশে এক হয়ে যায়, ধরন-ধারণটা থাকে কতকটা বাঙালীর মত। তারপর কি ক'রে চীনেরা গিয়ে জাপানে বসল, সে ইতিহাস আপনারা বইয়েই পড়েছেন।

এও জানা কথা, এশিয়ার সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছিল ইণ্ডিয়াতে। চীন বল, জাভা বল, বালি বল, সবাই বড় হয়েছে ইণ্ডিয়ার কাল্চার ধার ক'রে। জাভা বালির ইতিহাস গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি ঘেঁটেছে, কিন্তু তার বেশি তারা জানে না।

ইণ্ডিয়া থেকে কাল্চার আমদানি করার পথ, প্রথম দেখালে চীন। সেভেন্‌থ সেঞ্চুরির কথা। চীন তখন বড় হয়ে উঠেছে, তারা দেখলে সত্যি ক'রে সভ্য হতে হ'লে ইণ্ডিয়ার কাল্চার নিয়ে যেতে হবে। অথচ কি ক'রে নেওয়া যায়! চাইলেই তো আর ইণ্ডিয়া তার ফরমূলা দিয়ে দিচ্ছে না। অনেক ভেবে স্থির হ'ল, ইণ্ডিয়া থেকে বড় বড়

পণ্ডিতদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে চীনে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর তাঁরা সেখানে কাল্‌চার প্রতিষ্ঠা করবেন। স্মাগ্‌লিঙের বিদ্যেয় চীনেরা জগতে ওস্তাদ জাত, ওই বুদ্ধিটাই ওদের খেলে ভাল। হ'লও তাই, একজন বড় বাঙালী পণ্ডিতকে তারা বাগিয়ে নিয়ে গেল।

অমল কহিল, তা তো শুনি নি। ইউয়েন্‌থ সাং আর ফা হিয়ান নালন্দায় এসে প'ড়ে গিয়েছিলেন জানি।

প্রভাতদা কহিলেন, সেই কথাই বলছি। ইউয়েন্‌থ সাঙের নাম তোমরা বইয়ে পড়েছ, কিন্তু যা পড়েছ, তা সত্যি নয়। হিউয়েন্‌থ সাং চীনে নয়, বাঙালী। তার আসল নাম হচ্ছে হেমন্ত সেন।

ফণি কহিল, ধ্যেৎ।

প্রভাতদা কহিলেন, ওই তো তোমাদের দোষ, ছাপার বইয়ে যা না পড়েছ, তা বিশ্বেস কর না। আগে শোন, তর্ক ক'রো পরে।

হেমন্ত সেনের বাড়ি ছিল চাটগাঁয়ে। জাতে চাক্‌মা। নালন্দায় পড়াশোনা ক'রে খুব বড় পণ্ডিত হয়ে দেশে গিয়ে টোল খুলে বসে। কিন্তু ইউনিভার্সিটি কেরিয়ার ব্রিলিয়াণ্ট হ'লে হবে কি, আসলে লোকটা ছিল ছিঁচকের একশেষ। স্মাগ্‌লাররা এসে তাকে পটিয়ে ফেললে। অনেক টাকা খেয়ে হেমন্ত সেন রাজি হ'ল। বার্মা পেরিয়ে টেঙ্গুয়ের পথে তারা গিয়ে চীনে উঠল।

এদিকে কিছুদিন পর ধরা পড়ল, হেমন্ত সেন নিরুদ্দেশ, আচার্য শীলভদ্রের দেওয়া নোটের খাতাপত্তরও নেই। খোঁজ্ খোঁজ্। শেষ তার চাকর-বাকরদের বহু ধমক-ধামক করবার পরে জানা গেল, হেমন্ত চীনেদের সঙ্গে কোথায় চ'লে গেছে। সবাই বুঝলে, তবে নিশ্চয় সে চীনে গেছে। মগধের সম্রাট তখন শিলাদিত্য হর্ষবর্ধন। তিনি চীনের রাজা তাই ৎসাংকে চিঠি দিলেন, আমার প্রজা হেমন্ত সেন তোমার

ওখানে আছে, আমরা খবর পেয়েছি। তাকে পত্রপাঠ এখানে ফিরে পাঠিয়ে দেবে, নইলে তোমার নামে তিনশো একষট্টি ধারার মামলা আনা হবে। তাই ৎসাং জবাব দিলে—

পূর্ণবাবু সদ্যজাত উকিল। তিনি কহিলেন, হেমন্ত সেনের বয়স কত ছিল ?

প্রভাতদা কহিলেন, রাজার কাছে প্রজা সব সময়ই শিশুতুল্য। তাই ৎসাং জবাব দিলে, হেমন্ত সেন ব'লে কেউ এখানে নেই, আপনারা ভুল শুনেছেন। হর্ষবর্ধনের স্পাইয়েরা কিন্তু হলফ ক'রে বললে, হেমন্তকে তারা ঠিকই পিকিঙে দেখেছে, তবে তার নাম এখন হয়েছে হিউয়েন্‌থ সাং। হর্ষবর্ধন লিখলেন, হিউয়েন্‌থ সাংই হেমন্ত। তাই ৎসাং লিখলে, হিউয়েন ৎসাং ৎসাং ফ্যামিলির লোক, আমার জানিত আত্মীয়। তাকে যদি দেখতে চান তো পাঠাতে পারি।

বহু লোকজন সঙ্গে নিয়ে হেমন্ত সেন দেশে এল। মাথায় বেণী, পরনে চীনে পায়জামা। নালন্দায় অশোক হলে ট্রাইবুনাল বসল, আচার্য শীলভদ্র তার প্রেসিডেণ্ট। হেমন্তর সঙ্গে এসেছিল চীনের নামজাদা সব উকিল। তারা তেড়ে বললে, চেয়ে দেখুন একে, গোল মুখ, থ্যাবড়া নাক। একে আপনারা আর্য বর্লেন কি ব'লে ? এর চোদ্দপুরুষ চীনে, বিশ্বেস না হয়, খুলুন অ্যান্‌থ্রোপলজির চার্ট।

নালন্দার পণ্ডিতরা ভড়কে গেলেন। সত্যিই তো, এই থ্যাবড়া-নাক লোকটাকে আর্য ব'লে ক্লেম করতে যাওয়া চলে না, আর্যত্বের অপমান। হেমন্ত যখন ওখানে থেকে পড়েছে, তখন অনেকের মধ্যে একজনের নাক কেউ চেয়ে দেখে নি। এখন তার নাক খুঁজে বার করতে সবার ঘাম ছুটে গেল। আচার্য শীলভদ্র বললেন, চুলোয় যাক নাক, ওকে কথা কইয়ে দেখ, শব্দই ব্রহ্ম।

হেমন্ত সেন দেখলে, বিপদ। চীনে ভাষা তার তখনও রপ্ত হয় নি। অথচ এখন ধরা পড়লেই মুশকিল, চীনদেশের ডেলিশাস আরশুলো-শুঁটকি আর খাওয়া হ'ল না। হাজার হোক বাঙালীর মাথা, একটু চুলকোতেই চট ক'রে বুদ্ধি খুলে গেল, ঝেড়ে খাস দিশী চাটগেঁয়ে বুলি শুরু ক'রে দিলে। ইউনিভার্সিটির ছাত্তর যখন ছিল, তখন সে সবার সঙ্গে গৌড়ী বাংলাতেই কথা কয়েছে। এখন চাটগেঁয়ে জবান শুনে পণ্ডিতরা মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। স্থির হ'ল, কথা সত্যি, এ ভাষার তেত্রিশ পুরুষে আর্য স্টক নয়। হেমন্ত চীনে ফিরে গেল। এই সেকেণ্ড জার্নিটা সে করেছিল দার্জিলিং-গ্যাংটকের পথে। হিস্ট্রিতে এরই কথা লেখা আছে।

গেল চীন, এবার এল তিব্বত। তারা বললে, ও ছাত্তর-টাত্তর নয়, একেবার গোড়া ধ'রেই টান মার। নালন্দার প্রিন্সিপাল তখন দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান। তাঁকে এসে বললে, যত টাকা চান দোব, যেতেই হবে। ফণি, অমল, হয়তো শুনে আশ্চর্য হচ্ছ, কিন্তু এ সবই ইতিহাসের কথা। কলেজ থেকে কলেজে, ইউনিভার্সিটি থেকে ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর প্রিন্সিপাল ভাঙিয়ে নেবার রেওয়াজ তখনও ছিল। দীপঙ্কর অবিশ্যি শেষ পর্যন্ত গেলেন না, টাকাটা মেরে দিয়ে তাঁদের বোকা বুঝিয়ে দিলেন।

অমল কহিল, কিন্তু সব বইয়ে তো লেখে তিনি গিয়েছিলেন।

প্রভাতদা কহিলেন, লিখুক। বইওয়ালারা তো আর সব কথা জানে না, যা শুনেছে, তাই লিখে রেখেছে। আসল কথা হচ্ছে, দীপঙ্কর ছিলেন খাস বিক্রমপুরের আদমী, আসল বাস্তুঘুঘু। তিব্বতের লোক যখন তাঁর কাছে এল, তিনি এক চাল চাললেন। তাকে বললেন, টাকা আগাম দিতে হবে, আর আমি অন্ধকার রাত্রে একা তোমার

সঙ্গে লুকিয়ে চ'লে যাব, কেউ টের পেলে গোল হবে। সে লোক জানলে, কাজ হাসিল, একবার একে টেনে নিয়ে টিবেটের সীমার মধ্যে ফেলতে পারলে আর তার কমিশনের টাকা মারে কে! সে মহা খুশি হয়ে আগাম টাকা গুনে দিলে।

নালন্দায় ছিল এক বুড়ো শ্রমণ, তার নাম সতীশ। তার কাজ ছিল সমস্ত বাতির তদারক করা। অতীশ তাকে শিখিয়ে দিলেন, তোমাকে কেউ শুধোলে নাম বলবে অতীশ, আর বাতির তদারক যখন তুমি কর, তখন দীপঙ্কর তো তুমি বটই।

আচার্যের সিল্কের আলখাল্লা প'রে সতীশ তিব্বতে চলল। তিব্বতীরা তো তাকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। তারপর যখন টের পেলে, তাদের কি দারুণ ধাপ্পা দিয়েছে, তখন তাদের মুণ্ডু ঘুরে গেল। শ্রীজ্ঞান অতীশ এসেছেন—এ কথা চারদিকে ইতিমধ্যেই র'টে গেছে, তাকে এখন আবার শোধরাতে গেলে মহা মুশকিল। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে তারা ব্যাপারটাকে চাপা দিয়ে ফেললে। আর সেই থেকে কড়া আইন ক'রে দিলে, কোনও বিদেশী তাদের দেশে ঢুকতে পাবে না—যেন এই কেলেঙ্কারির খবর বাইরের লোকে না পায়। টাকা গচ্চা দেবার কথাটা তো তারা একদম চেপেই গেল। একে তো টাকা দেবার কথা শুনলে শত্তুররা আরও বেশি ক'রে দাঁত বার ক'রে হাসবে, তায় ঘুষের কথা প্রকাশ পেলে ইণ্টারন্যাশনাল খ্যাচাখেচি বাধবার সম্ভাবনা। নালন্দাকে কলা দেখিয়ে দীপঙ্করকে অমনি মেরে দিয়েছি ব'লে তারা খুব একচোট হাসাহাসি করলে। আর টাকা বাজিয়ে সিন্দুকে তুলতে তুলতে অতীশও হাসলেন। সেই টাকায় নালন্দাতে 'মূর্খ হাসে কবার' এই সম্বন্ধে রিসার্চ-স্কলারশিপ খোলা হ'ল।

ফণি কহিল, পাপ হ'ল না?

প্রভাতদা কহিলেন, পাপ হয় হিঁদুদের। অতীশ ছিলেন বৌদ্ধ। আর দেশের জন্যে করলে কিছুতেই পাপ নেই। নিজে না খেলেই হ'ল।

নিতাইবাবু কহিলেন, আচ্ছা, আপনি এসব কথা গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে জানালেই পারতেন।

প্রভাতদা কহিলেন, আরে, সেই নিয়েই তো ঝগড়া। আমি একটা পেপার সাব্‌মিট করতে চেয়েছিলাম, তা কালিদাস নাগ বললে, যেসব মালমশলা ডকুমেণ্টের ওপর আমি থিসিস খাড়া করেছি, সমস্ত তাদের কাছে সাব্‌মিট করতে হবে। ফন্দি মন্দ নয়, আমি দিই, আর তারা সব বেমালুম হাতিয়ে নিয়ে আমাকে কলা দেখিয়ে দিক।

গোপেনবাবু কহিলেন, দিলেই বা, দেশের জন্যে দিলে পাপ নেই।

প্রভাতদা কহিলেন, রেখে দাও দেশের জন্যে। চ'টে বললাম, কক্ষনো দোব না। সেই থেকে রাগারাগি হয়ে রিসার্চ করাই ছেড়ে দিলাম।

অমল কহিল, আপনি কি সাব্‌জেক্টে রিসার্চ করতেন?

প্রভাতদা সে কথা কানে না তুলিয়া কহিলেন, তারপর জাপানের কথা। আপনারা জানেন, জাপান বেশিদিন সভ্য হয় নি। এই সেদিনও জাপানে মিডিয়েভালিজ্‌ম ছিল। ফিউডাল চৌকদের নাম ছিল শকুন, তারা প্রজাদের হাড়মাস ঠুকরে খেত ব'লে। তারপর হ'ল এইটিন সিক্সটি-এইটের রেভল্যুশন। তারও গোড়ায় ছিল একজন ইণ্ডিয়ান।

জাপানের তখনকার প্রথম রেভল্যুশনারিদের ভেতর যোশীদা তোরাজিরোর খুব বড় নাম। ফণি, অমল, হয়তো ষ্টিভেন্‌সনের লেখায় তার নাম পড়েছ। এই যোশীদা কিন্তু আদপেই জাপানী নয়, মরাঠী। তার আসল নাম হচ্ছে দত্তাত্রেয় যোশী। জাপানে গিয়ে ওই নাম দাঁড়িয়ে যায়।

যোশী ছিল রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের একজন লেফ্‌টেনাণ্ট। লক্ষ্মীবাই

মারা গেলে সে দেশ থেকে পালিয়ে যায়, এদিক সেদিক ঘুরে শেষ জাপানে গিয়ে ইস্কুল-মাস্টার হয়ে বসে। ইণ্ডিয়া থেকে যোশী সায়েবদের কলের কামান আর জাহাজ দেখে গিয়েছিল, জাপানে গিয়ে সে তাই ব'লে বেড়াতে লাগল, ওই রকম কল যদি তোমাদেরও না থাকে, তবে তোমাদের বাঁচবার আশা বৃথা। শকুনরা দেখলে, এ তো ভারি বিপদ, এমনি ক'রে ব্যাটা চ্যাংড়াগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। যোশীর নামে ওয়ারেণ্ট বেরুল। যোশী সটকে আমেরিকা যাবার চেষ্টা ক'রে ধরা পড়ল, শকুনেরা কুড়ুল দিয়ে তার মাথাটা কেটে ফেলে নিশ্চিন্তি হ'ল। কিন্তু যোশীর কথার জড মরল না। শেষ পর্যন্ত রেভল্যুশন হয়ে জাপান মডার্নাইজ্‌ড হয়ে গেল।

এর পর কিছুদিনের ইতিহাসও সবারই জানা কথা: মিৎসুই আর মিৎসুবিশিতে হাতাহাতি ক'রে জাপানকে ধাঁ ধাঁ ক'রে বাড়িয়ে তুললে। দেখা গেল, বড়-গোছের এক-আধটা লড়াই না জিততে পারলে বড় জাত ব'লে আমল পাওয়া শক্ত। বাস্, নাইণ্টিন ফোরে পোর্ট আর্থার নিয়ে জাপান রাশিয়াকে চ্যালেঞ্জ করলে, ম্যাচে জিতেও গেল। তারপর আর তাকে রোখে কে! বড় পাওয়ার ব'লে তার নাম হয়ে গেছে, ব্রিটেন বল, আমেরিকা বল, সবাই তার সঙ্গে খাতির জমাতে ব্যস্ত। নাইণ্টিন টেনে কোরিয়া দখল ক'রে জাপান গ্যাঁট হয়ে বসল।

তারপর বাধল ইউরোপের লড়াই। জাপানের পোয়া বারো। দুনো দরে উনো মাল বেচে ইউরোপের আদ্ধেক টাকাকড়ি এনে তার সিন্দুকজাত ক'রে ফেললে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের সস্তা চকচকে মাল দিয়ে সমস্ত দেশের বাজার ভ'রে ফেললে। ইংরেজ ফরাসী জার্মান মার্কিন সবাই যুদ্ধে মশগুল, বাজার সামালায় কে!

অমল হাই তুলিয়া কহিল, বাবাঃ, কলেজেও এই, আবার বাড়িতেও এই—

গোপেনবাবু কহিলেন, ওহে, ছেলেদের ঘুম পাচ্ছে।

প্রভাতদা কহিলেন, যাও বৎসগণ, শুয়ে পড়গে। এমনি ক'রে পৌঁছল নাইন্টিন টোয়েন্টিথ্রী। জাপানের তখন নারী বাড়ি গাড়ি সবই মিলে গেছে। নিপ্পন বদলে তার নাম হয়েছে দি জাপানীজ এম্পায়ার, লড়াইয়ে রাশিয়াকে হারিয়ে শীল্ড এনেছে, টাকাও হ'ল। জাপান বললে, এবারে একটু আয়েশ ক'রে ব'সে নিজেকে উন্নত করা যাক। দেশ-বিদেশ থেকে বড় বড় প্রফেসারদের এনে, বই কিনে, ফুলের চারা কিনে জাপানীরা দেশকে সাজিয়ে তুললে।

এই সময়ে ভারি একটা গোল বাধে। হেম-কবির কতকগুলো কবিতা কে একজন জাপানী ভাষায় ট্র্যান্স্লেট করেছিল। তার মধ্যে 'চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান' প'ড়ে জাপানীরা ক্ষেপে গেল। বললে, ওরাও ভাত মাছ খায়, আমরাও ভাত মাছ খাই, তায় আমরা এমন পরাক্রান্ত আর বাঙালীরা জন্ম-পরাধীন জাত; তবু ওরা আমাদের অসভ্য ব'লে নাক সিটকায় কোন্ নজিরে?

এন্কোয়ারি কমিশন বসল। কমিশন রিপোর্ট দিলে, খবর নিয়ে জানা গেল, বাঙালীরা কবির জাত, তাদের ভেতরে বাইরে সবই রিফাইন্ড। আমরা শক্তিতে বড় হ'লেও স্বভাবে এখনও লড়ুয়ে গুণ্ডাই র'য়ে গেছি। তাই ওরা আমাদের অসভ্য বলে।

খবরের কাগজরা তাই নিয়ে দারুণ মাতামাতি শুরু ক'রে দিলে। এক দল বললে, বাংলা থেকে রিফাইন্মেন্টের ব্যাক্টিরিয়া আনানো হোক। আর এক দল বললে, না, নিজেদের জাতীয় বিশেষত্ব নিয়ে খুশি থাকাই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। গভর্মেন্ট তখন কন্জার্ভেটিভ পার্টির

হাতে। তারা বললে, এসব মতিগতি ভাল নয়, বিদেশী রিফাইন্‌মেণ্ট আমরা আনাব না। পাব্‌লিক ক্ষেপে গেল। বেগতিক দেখে কন্‌জার্‌ভেটিভরা মিনিষ্ট্রি ছেড়ে দিলে, লিবারেল গভর্মেণ্ট হয়ে গেল।

মনে রাখবেন, জাপানে লেবার পার্টি ব'লে তেমন কিছু নেই বড়র মধ্যে এই দুই—কন্‌জার্‌ভেটিভ আর লিবারেল। লিবারেল গভর্মেণ্ট এসেই বললে, ইণ্ডিয়া থেকে রিফাইন্‌মেণ্ট আনাবার ব্যবস্থা ক'রে তবে অন্য কাজ। কাল্‌চারে বড় হতে হ'লে ইণ্ডিয়া ছাড়া গতি নেই, চায়না এনেছে হেমন্ত সেনকে তারা জানে, টিবেট নিয়েছে দীপঙ্করকে। ইণ্ডিয়াতে লোক পাঠানো স্থির হ'ল। ক্যাবিনেট ভেবে দেখলে, শোনা গেছে ইণ্ডিয়ার মহাত্মা গান্ধী জগতের সবচেয়ে বড় মানুষ, তাঁকে যদি বাগানো যায়, তবে বাঙালী না-আনার দোষ গুরুতর হবে না। যে লোককে পাঠানো হ'ল তার ওপর হুকুম রইল, গান্ধীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে দেশে খবর দেবে। জগতের তিনি সবচেয়ে বড় মানুষ, জাপানের ক্ষুদে জাহাজে যদি তাঁকে না ধরে, তবে দরকার হ'লে জাপান আমেরিকা থেকে বড় জাহাজ ভাড়া ক'রে আনবে, তারও কথা স্থির হয়ে গেল।

লোক ফিরে এসে জানালে, সুবিধে হ'ল না।

প্রিমিয়ার বললেন, কেন?

সে বললে, প্রভু, আমরা মিথ্যে খবর শুনেছিলাম, গান্ধী জগতের সবচেয়ে বড় মানুষ। তাঁকে দেখলাম, শুকনো চিমড়ে মতন চেহারা, ন্যাড়া মাথা, ফোকলা মুখ, তায় আবার আদুড় গায়ে শুধু একটুখানি নেংটি জড়িয়ে থাকেন। রিফাইন্‌মেণ্টের গন্ধও তাঁর ধারে কাছে নেই। দেখলে বুঝতেন, সে যা দৃশ্য, তার চাইতে আমারও চেহারা ঢের ভাল।

প্রিমিয়ার ধমকে বললেন, চোপ রও। চেহারা দিয়েই যদি সব হ'ত,

হবে তো থিয়েটার থেকে বেছে বেছে রঙ-করা গেইশাদের নিয়ে এলেই হ'ত। তুমি বেয়াড়ার মত কথা বলেছ ব'লে তোমার চাকরি গেল।

তারপর আবার অন্য লোক পাঠানো হ'ল। একে ব'লে দেওয়া হ'ল, গান্ধী যখন হ'ল না, তখন বাংলাতেই দেখো, আর যদি সুবিধে বোঝ, তবে চেহারার দিকেও একটু নজর রেখো।

এটি কাজের লোক। মাসেকের মধ্যেই দেশে ফিরে এসে জানালে, পেয়েছি। ক্যাবিনেটের ফুলবেঞ্চ সঙ্গে ক'রে মিকাডো স্বয়ং তাকে ইণ্টারভিউ দিলেন, বললেন, কি দেখলে?

সে বললে, প্রভু, দেখলাম। আহা, সে কি রূপ! পুরুষমানুষের এত রূপ হয়, এই প্রথম জানলাম। সত্তরের ধারে গেছে বয়স, তবু রঙ যেন ফেটে পড়ছে। সে বয়স আর নেই, নইলে প্রেমে পড়তুম।—ব'লে দূত টাকের ওপর একবার হাত বোলালে।

মিকাডো বললেন, কীর্তন গাইছ যে!

দূত তখনও বিভোর। বললে, প্রভু, সে যে কীর্তন গাইবারই চেহারা।

মিকাডো ধমক দিয়ে বললেন, বাঁদরামো ক'রো না। গুণ না থাকলে শুধু রূপ দিয়ে কি হবে? গুণের খবর নিয়েছ?

দূত প্রকৃতিস্থ হয়ে বললে, প্রভু, সেও নিয়েছি। জগতের তিনি শ্রেষ্ঠ কবি। মিল দিয়ে, মিল না দিয়ে রকম-বেরকমের কবিতা গান ছড়া বাঁধতে, গল্প প্রবন্ধ প্রশস্তি লিখতে, গান গাইতে, থিয়েটার করতে, ছবি আঁকতে, বক্তৃতা দিতে, সব দিকেতেই চৌকস, বিষয়কর্মেও তেমনই পটু। বাংলা দেশের যে কালচারের এত গর্ব, সবই এঁকে আশ্রয় ক'রে চলেছে। কবিত্বে নোবেলপ্রাইজ-উইনার, দেশে দেশে তাঁর আদর।

মিকাডো বললেন, হয়েছে। এঁকেই আমাদের চাই।

কন্‌সালকে চিঠি লেখা হ'ল।

কন্‌সাল জানালেন, রবি ঠাকুরকে টাকা দিয়ে হাত করা সম্ভব নয়। নিজে তিনি মস্তবড় জমিদার, পার্মানেণ্ট সেট্‌ল্‌মেণ্টের চিরস্থায়ী বেগুনক্ষেতের মালিক। তার ওপর তাঁর শান্তিনিকেতনের হোটেল আর কলেজ আছে, বই বিক্রি আছে, মাসিকপত্রে লেখা আছে, থিয়েটারের আয় আছে। এত সবের দাম দিয়ে তাঁকে কিনে নিতে গেলে জাপানের বাজেট ঘাঁকতি হয়ে যাবে।

অথচ তখন তাঁকে না নিলেও নয়। ক্যাবিনেটের ইয়ং সেক্‌শন বললে, তাঁকে বেড়াবার নেমন্তন্ন ক'রে আনা যাক, তারপর কোনও কৌশল ক'রে আটকে রাখলেই হবে। কিন্তু প্রবীণরা বললেন, সে হয় না, ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের সঙ্গে খ্যাচাখেচি বাধবে। শেষ পর্যন্ত স্থির হ'ল, আগে তাঁকে এনে তো ফেলা যাক, আটকাবার ব্যবস্থা পরে হবে 'খন। আর কিছু না হয়, তোকিও ইউনিভার্সিটিতে একটা বাংলা কাব্যের চেয়ার খাড়া ক'রে দেওয়া যাবে। দেশের লোক বললে, আমরা আধাসুদে চেয়ারবণ্ডে টাকা দোব।

রবিবাবুকে নেমন্তন্ন করা হ'ল, দলবল নিয়ে তিনি জাপান চললেন।

জাহাজ থেকে যখন নামলেন, জেটির বাইরে লোকারণ্য হঠাৎ থ মেরে গেল।

ছেলেরা মনে মনে বললে, এর পরে কি আর মেয়েরা আমাদের দিকে ফিরেও চাইবে। অমন চেহারাই যদি না পেলাম, ধিক এ জীবনে, আমরা হারাকিরি করব।

মেয়েরা চট ক'রে পাউডার-পাফ নাকে বুলিয়ে নিয়ে বললে, আহা, যেন দেবতা স্বর্গলোক থেকে নেমে এলেন! এঁর কাছে

আমাদের দেশের ওই বাঁদুরে চেহারার ছেলেগুলো? ছিঃ! মনে মনে তারা স্থির করলে, মেয়েদের হারাকিরি করতে নেই, আমরা শিংল্ করব।

কবি তীরে নামলেন। সবাই মিলে গান ধরলে, এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর! রবিবাবু একটি সুমিষ্ট হাসি হেসে বললেন, জাহাজের ধকলে এখন আমি স্নান, বিশ্রাম ক'রে চান করা দরকার।

যে কদিন রবিবাবু রইলেন, জাপানে তুমুল হুল্লোড়। তাঁর কথা, তাঁর হাসি, তাঁর হাঁটা চলা হাতের লেখা, তাঁর পোশাক চুল দাড়ি, সবেরই নকল করতে সব ক্ষেপে উঠল। রুমালে পাখায় আঁচলে অটোগ্রাফ-খাতায় দু লাইন কবিতা লিখিয়ে নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি। সেই থেকে দু-চার লাইনের কবিতা লেখারই ফ্যাশান জাপানে চল্ হয়ে গেল। হুঁকোতে একটি আরাম-টানের মত সে কবিতা ক্ষণস্থায়ী ও অতি আরামের, তাই তার নাম হ'ল হুঁকো কবিতা।

ফণি কহিল, ও, সেই জলের লাফ, ব্যাঙের শব্দ?

অমল কহিল, ওটা ব্যাঙের লাফ, জলের শব্দ। যা জানিস না, তাই নিয়ে কথা কইতে আসিস কেন? জলের লাফ ব্যাঙের শব্দর কোন মানে হয় নাকি?

ফণি কহিল, মহ্হ্, চেত্ছে বুইরার হাপিকাশ।

প্রভাতদা কহিলেন, আঃ!

কবিরাজ কহিলেন, এই, থাম্ বলছি। তারপর বলুন।

প্রভাতদা কহিলেন, কদিন থেকে রবিবাবু ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যসামন্তদের ভিড় আর ব্রিটিশ কন্সালের তদারকের বহর দেখে ওরা সব দিক না ভেবে-চিন্তে তাঁকে হঠাৎ আটকে ফেলাটা সমীচীন মনে করলে না। আসবার সময় ছেলেমেয়েরা তাঁকে গান গেয়ে

বিদায় দিলে, যাও যাও যাও গো এবার, যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যাও। রবিবাবু মোনা লিসার মত ক'রে হেসে বললেন, তাই দিয়ে গেলাম, বুঝবে পরে।

লোক মেতে উঠল, রবি ঠাকুরের আর্টকে আনাই চাই এদেশে। গভর্মেণ্ট বললে, হচ্ছে হচ্ছে। বেশ তুখোড় দেখে গুটিকতক জাপানী ছেলেমেয়েকে স্কলার্‌শিপ দিয়ে শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠানো হ'ল, সেখান থেকে তারা রবীন্দ্র-কলার সব টেক্‌নিক শিখে আসবে। আর তাকাগাকিকে পাঠানো হ'ল জুজুৎসু শেখানোর নাম ক'রে। তাকাগাকি পাকা লোক, অন্যের প্যাঁচ তিনি অতি সহজে আয়ত্ত ক'রে নিতে জানেন।

এরা পড়াশোনা শেষ ক'রে ফিরে আসতে দুদিন দেরি আছে দেখে সেই ফাঁকে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল ক'রে কিছুদিনের মত ব'সে খাবার সংস্থান ক'রে নিলে। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে বললে, এবারে ওরা খবর নিয়ে আসতে যা দেরি।

জাপানের ছেলেমেয়েরা আর যাই হোক, অকৃতজ্ঞ নয়, স্কলার্‌শিপের মান তারা রাখে। দেশে ফিরে তারা বললে, সব শিখে এসেছি। তাকাগাকি বললেন, ওদের টিপে-টুপে দেখলাম, আমাদের গায়ে যেমন ডুমো ডুমো শক্ত মাস্‌ল ভরা, ওদের তা নয়, বেশ নরম নরম হাত পা। তাই ওরা অমন মোলায়েম রকম চলতে বলতে পারে। এক কথায় জাপানের ছেলেমেয়েরা এক্‌সার্‌সাইজ করা ছেড়ে দিলে।

দেখতে দেখতে জাপানের রঙ বদলে গেল। ছেলেরা চুল বব্‌ করে মিহিসুরে কথা কয়, মেয়েরা দাঁতে দাঁত চেপে মোলায়েম উচ্চারণ ক'রে দখিন হাওয়া পথিক হাওয়ার গান গায়। দেশের অলিতে-গলিতে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠতে লাগল রাশীকৃত কচি-কচিনী-

নিকেতন, মৃদুল সংসদ, কমনীয় সংঘ, ধোঁয়ালিকা ক্লাব। জাপান কাল্‌চার্ড হয়ে উঠল। তার কোথাও আর এতটুকু কুশ্রী বস্তু থাকবার জো নেই। লোকের মুখে সুনীল আকাশ মলয় বাতাস লেগেই রয়েছে। বাগানে বাগানে মাধবী রজনীগন্ধা রক্তকরবী, মাঠে মাঠে কাশক্ষেত। হলদে সিল্কের কোঁচায় আর আঁচলে পথঘাট ঝলমল করছে, দাঁতপড়া কুঁজো বুড়ো-বুড়ীরা ঢেলার ভয়ে ঘর ছেড়ে বেরোয় না। কথার উচ্চারণটাকে অবধি তারা বদলে মোলায়েম ক'রে ফেললে। আগেকার যত কাব্য সাহিত্য ছিল, সমস্ত পচা আর অশ্লীল ব'লে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা হ'ল। পণ্ডিতেরা মিলে ডিক্‌শনারি বাছাই ক'রে সমস্ত কাঠখোট্টা আর অভব্য শব্দ বাদ দিয়ে দিলেন, দেশসুদ্ধ ছেলেমেয়েরা একদিনে প্রতিজ্ঞা ক'রে অশ্লীল তো অশ্লীল, অমার্জিত কথা পর্যন্ত সব ভুলে গেল।

জাপান বললে, এবারে আমাদের সভ্য হওয়া কম্‌প্লিট। ডিক্‌শনারি খুলে দেখ, 'বাকা'র বাড়া গাল অবধি জাপানে নেই।

দেশে দেশে ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল।

কিন্তু কন্‌জারভেটিভ পার্টি এতদিন ব'সে ব'সে সব দেখছিল আর ফন্দি আঁটছিল। নতুন ইলেক্‌শনের সময় কাছে আসতেই তারা জোর প্রোপাগাণ্ডা শুরু ক'রে দিলে। তারা বললে, হে দেশবাসী, লিবারেলদের কাণ্ডকারখানা দেখে তোমরা তাজ্জব হয়ে গেছ, কিন্তু আমরা হই নি ; কারণ আমাদের বুদ্ধি আছে। জাপানের এক দিকে তার পুরোনো শত্রু রাশিয়া, আর এক দিকে আমেরিকা। ফাঁক পেলেই তারা জাপানকে ঠেসে ধরবে। এই কি কাব্যি করবার সময়? আর বিদেশী বাঙালীর কেতা আমদানি ক'রে দেশসুদ্ধ ছেলেগুলো দেখতে দেখতে স্বর্ণলতা হয়ে উঠল, যুদ্ধ বাধলে এই সখীরা লড়াই করতে

পারবে ভেবেছ? বাঙালী কবিয়ানা করতে পারে, তার হয়ে লড়াই করবার জন্যে ইংরেজরা রয়েছে—সে থাকে বটগাছের ছায়ায়। তার নকল করতে গিয়ে তোমরা যে কি সর্বনাশের পথে চলেছে, এখনও ভেবে দেখ, এখনও ফের। লিবারেলরা কাল্‌চারের নাম ক'রে দেশকে উচ্ছন্নে দেবার ব্যবস্থা করেছে, এদের আর প্রশ্রয় দিও না।

হাজার কাল্‌চার্‌ড হোক, মব-মাইণ্ড তো, একটুতেই হেলে পড়ে; খবরের কাগজে নানাবিধ কঠিন প্রশ্ন বেরুতে লাগল। সত্যিই তো, দেশের বর্তমান মিলিটারী স্টেংথ কতখানি, সে সম্বন্ধে গভর্মেণ্ট কি বলেন? গেল ক-বছরে দেশে কটা সাব্‌মেরিন তৈরি হয়েছে, কটা মেশিনগান, আর কতগুলোই বা রাইটিং-প্যাড ফাউণ্টেনপেন? রজনী-গন্ধা আর কাশের বনে জাপানের মাঠঘাট ছেয়ে গেছে; যুদ্ধ বাধলে খাদ্য-সংস্থানের কি হবে, সে কথা চিন্তা ক'রে গভর্মেণ্ট বাউণ্টি দিয়ে গোল আলু আর মানকচুর চাষকে বাড়িয়ে তোলবার কথা ভেবেছেন কি? পোর্ট আর্থারের মার রাশিয়া ভুলে যায় নি। সম্প্রতি তারা ঈস্টার্ন ফ্রণ্টিয়ারে প্রকাণ্ড সেনা-ছাউনি করেছে, অ্যামুনিশন ফ্যাক্টরি অবধি বসিয়েছে। তাদের বাধা দেওয়া সম্বন্ধে গভর্মেণ্ট কি পলিসি নেবেন ঠিক করেছেন?

গভর্মেণ্ট দেখলে, বেগতিক। এখন লোকের মনে একটা জোর ইম্প্রেশন না করতে পারলে মিনিস্ট্রিও যায়, মানসম্ভ্রমও যায়। তারা পালটে বললে, হে দেশবাসী, তোমরা কিচ্ছু চিন্তা ক'রো না। আমাদের তোমরা অনেক বছর ধ'রে দেখেছ, দেশের উন্নতিসাধন করবার জন্যে আমরা আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখি নি। এখন কুচুড়েদের কথা শুনে আমাদের অবিশ্বাস করা তোমাদের উচিত হয় না। আর রাশিয়া কি করছে না করছে, সে খবর আমরাও রাখছি না এমন নয়, সে সম্বন্ধে

আমাদের প্ল্যানও আছে। তবে সেসব তো আর প্রকাশ্যে ঢাক পিটে ব'লে বেড়াবার বস্তু নয়।

পার্লামেণ্টে কন্‌জারভেটিভরা বললে, ছেঁদো কথার কম্ম নয়। দেশ বড় শুধু কলা দিয়ে হয় না, তার জন্যে চাই কলোনি। দেশবাসী জানতে চায়, অদূর ভবিষ্যতে সাইবেরিয়াতে কোন ক্যাম্পেন হবে কি না!

গভর্মেণ্ট বললে, কি আপদ! সে যে হবে, সে কথা তো কবে থেকেই ঠিক হয়ে আছে।

কন্‌জারভেটিভরা বললে, কই, আমরা তো কিচ্ছু জানি না! তার আয়োজনও তো কিচ্ছু দেখছি না!

গভর্মেণ্ট বললে, তোমাদের জানবার কথা নয়। আর যুদ্ধের আয়োজন কি সবাইকে জানিয়ে করতে হবে নাকি? হে দেশবাসী, চিনে রাখ বুদ্ধির দৌড়, এই বুদ্ধি নিয়ে এঁরা রাজ্য চালাবেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, শুধু কথায় চিঁড়ে আর ভিজতে চাইছে না। গভর্মেণ্ট বাধ্য হয়ে বললে, যুদ্ধ হবে। দেশে কন্‌স্‌ক্রিপ্‌শন অর্ডার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজে নিউজ এজেন্সিতে কড়া সেন্সর বসল। তাই এর পরের কোনও খবর আর বাইরে এসে পৌঁছোয় নি। আমি নেহাৎ পেপারটা পাই ব'লেই সব জানি। কিন্তু এসব তো আর যেখানে সেখানে ব'লে বেড়ানো চলে না।

জাপানী সেনা যেদিন জাপান থেকে রওনা হ'ল, সেদিন জাপানময় এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য। কাগজগুলো ছবি-টবি দিয়ে স্পেশাল বার করলে। আমার কাছে একখানা এখনও রয়েছে; কারু ইচ্ছে হয়, গিয়ে দেখে এস এক সময়। মেয়েরা উলু দিয়ে ছেলেদের রণসাজে সাজিয়ে দিলে। তাদের কপালে পরিয়ে দিলে রক্তচন্দনের ফোঁটা, হাতে গলায় পরিয়ে দিলে রক্তকরবীর মালা, বাটন্‌হোলে অপরাজিতা, আর হেল্‌মেটে নীলকণ্ঠ

পাখির পালক। তারপর সবাই মিলে এঁকে বেঁকে নেচে নেচে গান গাইলে, যদি হ'ল যাবার ক্ষণ, তবে যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন। পরশন দেওয়া-টেওয়া হয়ে গেলে—

ফণি কহিল, পরশন কি প্রভাতদা ?

প্রভাতদা কহিলেন, ওসব ছেলেমানুষদের শুনতে নেই। সব হ'য়ে-ট'য়ে চুকে-বুকে গেলে ছেলেরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এল। আগে ঘর থেকে বেরুবার সময় তারা হাঁকত, 'বান্‌জাই'। এবারে একটু বদলে নিয়ে নরম গলায় বললে, বোন, যাই! মেয়েরা ছলছল চোখ ক'রে ভিজে গলায় বললে, যাই বলতে নেই—এসগে।

অমল কহিল, উহুঁ। দেশসুদ্ধু মেয়েরা দেশসুদ্ধু ছেলেদের বোন হ'ল কি ক'রে ?

প্রভাতদা কহিলেন, ভূত কোথাকার! সবাই এক দেশমাতার সন্তান নয় ? আর আরও বড় হয়ে বুঝবে, প্রিয়া কথাটার গণ্ডি বড় সঙ্কীর্ণ। বোন কথাটার এক্‌স্‌টেন্‌শন ঢের বড়, তাতে অনেক রকম সুবিধে আছে। ভাল ভাল বাংলা বই প'ড়ে দেখো। পড়াশোনা তো ছাইও করবে না, জান খালি ইয়াকি দিতে, আর বড়দের সঙ্গে মুখে মুখে তক্ক করতে।

নিতাইবাবু কহিলেন, আহা, যেতে দিন। তারপর বলুন।

প্রভাতদা শান্ত হইয়া কহিলেন, বলতে কি দেয় ? যাক। ছেলেরা রাস্তা দিয়ে মার্চ ক'রে গান গেয়ে চলল, আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে। স্টেশনে এসে তারা ট্রেনে উঠল ; মেয়েরা উলু দিয়ে খই ছিটিয়ে বললে, জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠ ওঠ জয়রথে তব, মোরা আসন বিছায়ে আশা চেয়ে ব'সে রব। তারপর নিজেরাও জয়রথের মেয়ে-গাড়িতে উঠে বসল, জেটি অবধি এসে ওদের সী-অফ ক'রে যাবে।

জাহাজ ছাড়ল। ছেলেরা ডেকের ওপর থেকে রুমাল উড়িয়ে বললে, হে বন্ধু, বিদায়। মেয়েরা পালটা গাইলে, জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার জানি, জানি।

কি ক'রে তারা জানল, আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, আমি বলতে পারব না, ওসব টেলিপ্যাথোলজি-ঘটিত ব্যাপার। কিন্তু যে ক'রেই হোক, জেনেছিল তারা ঠিকই। দু হপ্তা কাটতে না কাটতে জাপানী সেনা আবার এসে জাপানের ঘাটে তরী বাঁধল। ঘরে ঘরে শাঁক বেজে উঠল, রাজ্যসুদ্ধ লোক জাহাজঘাটে গিয়ে ভেঙে পড়ল, মেয়েরা তাড়াতাড়ি চান সেরে চুল এলোখোঁপা ক'রে জড়িয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে জেটির সামনে দাঁড়িয়ে মহা উল্লাসে গান ধরলে, পরবাসী চ'লে এস ঘরে, অনুকূল সমীরণভরে, এস এস পরবাসী।

কিন্তু অন্তরা ধরবার আগেই অকস্মাৎ সবার মাথায় একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ বজ্রাঘাত হ'ল। জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে সারি সারি ছেলেরা নেমে এল—সবার মুখ নীচু, কারও মুখে কথা নেই। হেল্‌মেটে নীলকণ্ঠ পাখির পালক বিবর্ণ নোংরা, রক্তকরবীর মালা শুকিয়ে ঝ'রে প'ড়ে গেছে, তার জায়গায় হাতে বাঁধা আছে শুধু সুতো, বাটন্‌হোলে প'ড়ে রয়েছে খালি ছ্যাদাটা। যুদ্ধে হার হয়েছে।

অথচ মজা হচ্ছে এই, যুদ্ধ মোটে হয়ই নি। কিন্তু তবু তাদের হার হয়ে গেল। ব্যাপারটা কি হয়েছিল বলি।

রাশিয়াতে আজকাল রেড আর্মির ভাইস-কমিশার ফর ডিফেন্স হচ্ছে টুখাচেভ্‌স্কি। তার হাতেই সব, চীফ কমিশার ভোরোশিলফ বুড়ো মানুষ। টুখাচেভ্‌স্কির বয়স বেশি নয়, কিন্তু বুদ্ধিটা ভারি চোখা। কিছুদিন থেকে তার হুকুমে সাইবেরিয়ার পূব-সীমান্তে রেড আর্মির এক ছাউনি করা হয়েছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে যত না হয়েছে ব্যারাক

তৈরি, তার চাইতে বেশি বসেছে অ্যামুনিশন ফ্যাক্টরি আর কুলিবস্তি। অনেকে আশ্চর্য হয়ে বলেছে, ওখানে ফ্যাক্টরি বসানো কেন, এদিককার ফ্যাক্টরি থেকে মাল নেওয়ালেই তো হয়! টুখাচেভ্‌স্কি মুচকে হেসে বলেছে, মানে আছে, পরে জানবেন।

এখন জাপানী সেনা গিয়ে নামতেই টুখাচেভ্‌স্কিও ওদিকে মার্চের অর্ডার দিলে। কিন্তু সৈন্যদের নয়, কারখানার মজুরদের। জানেন তো, রাশিয়াতে আজকাল ভদ্রলোক ব'লে কিছু নেই, বেবাক চাষা আর কুলি। ব্যাটারা সারাদিন লাঙল ঠেলে, লোহা পেটে, তাদের মুখও খুব ভাল হবার কথা নয় তো। তায় তারা কথাই বলে লিট্‌ল রাশিয়ানে—মানে রাশিয়ার ছোটলোকদের ভাষায়। মজুররা এসে সরাসর জাপানী সেনার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ-খিস্তি ক'রে গালাগাল দিতে শুরু করলে। রিফাইন্‌ড টেস্টের জাপানী ছেলেদের চামড়ার দৌড় বাকা অবধি, বাকা বললেই তারা হারাকিরি করে। এই চোস্ত জবান শুনে তারা লাল টকটকে হয়ে উঠল। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, তোমরা গুলি চালাও, সে বরং আমাদের সইবে, কিন্তু এই সব অমার্জিত বাক্য—এ একেবারেই অসহ্য। এ তোমরা উচ্চারণ করছ কি ক'রে? ছিঃ!

শুনে তারা আরও তেড়ে গালাগাল দিতে লাগল। টুখাচেভ্‌স্কি ব'লে দিয়েছে, যে যত বেশি মুখ-খারাপ করতে পারবে, তার তত ইনাম মিলবে।

জাপানী ছেলেরা আর পারলে না, দু হাতে কান চেপে ধ'রে পেছন ফিরে চোঁ-চা দৌড়ে গিয়ে জাহাজে উঠল। জাহাজের সিঁড়ির ওপর সে কি ঠেলাঠেলি! কোথায় গেল নীলকণ্ঠ পাখির পালক, কোথায় গেল ফুলের মালা—জামা-টামা ছিঁড়ে ঘেমে টয়লেট খারাপ হয়ে গিয়ে সে এক বিতিকিচ্ছি কাণ্ড! কতজন ঠেলাঠেলিতে সমুদ্রের মধ্যেই

প'ড়ে গেল। সমুদ্রের নীল জল দেখতে ভাল হ'লেও খেতে ভাল নয়। সেই জল খেয়ে তারা ম'রে গেল। বাকিরা পড়ি তো মরি ক'রে জাহাজ ছুটিয়ে কোন রকমে দেশে এসে পৌছল।

ওদিকে রাশিয়ার হরিজনরা গাল দিতে দিতে তাদের জাহাজ অবধি ধাওয়া করলে, তারপর ওদের ফেলে-আসা বন্দুক কামান রুমাল সিগারেটের টিন সমস্ত কুড়িয়ে গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। টুখাচেভ্স্কি একটা কাস্তে-আঁকা মেডেল পেয়ে গেল। স্টালিন পুরো একটি মিনিট ধ'রে নিজের হাতে তার পিঠ চাপড়ে দিলে।

এই তো অবস্থা, এখন কন্‌জারভেটিভদের আর পায় কে! তারা জোর প্রোপাগাণ্ডা চালালে, ইলেক্‌শনে লিবারেলরা একেবারেই ভোট পেলে না।

নতুন কন্‌জারভেটিভ গভর্মেন্টের নাম হয়েছে ঝাঁজি গভর্মেণ্ট, এদের পলিসিটা খুব ঝাঁজালো কিনা, তাই। এরা এবারে লেগে গেছে দেশটাকে আবার নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলতে। বলছে, জাতসুদ্ধুকে আবার খাঁটি সামুরাই ক'রে তুলতে হবে, বুশিদো ছাড়া আর কোন কাল্টের জাপানে জায়গা নেই। সমস্ত ব্যাপারে কড়া ডিক্টেটরশিপ চলছে, তার কাছে হিট্‌লারও তুচ্ছ। লিবারেলদের চাঁইয়েরা যারা পেরেছে দেশ ছেড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে, যারা পারে নি তারা জেলে প'চে মরেছে।

এই গেল রেভল্যুশনের হিস্ট্রি।

প্রভাতদা তাকিয়ায় ঠেস দিয়া হাঁফ লইলেন, কহিলেন, আজ এই পর্যন্ত থাক্। বাকিটা কাল।

অমল কহিল, কি আবার কালকের জন্যে তুলে রাখবেন? আজই সবটা বলুন।

প্রভাতদা কহিলেন, না থাক্, কালই ভাল। কি বল গোপেন?

গোপেনবাবু কহিলেন, হয়েছে, কেন আর দর বাড়াও? ব'লে ফেল। লোকের দায় পড়েছে দুদিন ধ'রে তোমার ঘ্যানঘেনে গল্প শুনতে! খেয়ে-দেয়ে তো আর কাজ নেই!

প্রভাতদা কহিলেন, আচ্ছা। এর পরে আর বেশি কিছু নেইও।

ফণি কহিল, তাড়াতাড়ি ক'রে ফাঁকি দেবেন না কিন্তু।

প্রভাতদা কহিলেন, না, না। শোন তারপর। রেভল্যুশন তো হ'ল। এখন গোল বেধেছে দেশের তরুণগুলোকে নিয়ে। পাওয়ার হাতে পেয়েই গভর্মেণ্ট দেশের সেন্‌সাস নিতে যায়, সেখানেও বিপত্তি। সেন্‌সাস-কমিশনাররা জানিয়েছে, আমরা ভারি ধাঁধায় প'ড়ে গেছি। এই এক দল লোক দেখতে পাই, এরা হাঁটে পুরুষের মত, হাসে মেয়ের মত; চুলও বব্ করে, দাড়িও কামায়। এদের পুরুষের লিস্টে ফেলব, না মেয়ের? গভর্মেণ্ট বলেছে, ভেবে বলব।

সেই থেকে চিন্তার শুরু। এরা এতদিন বলেছে, আমরা নিত্যসবুজ, আমরা নেহাৎ কাঁচা, আমরা কখনও ঝুনো হব না। এখন নতুন গভর্মেণ্টের ভাবনা হয়েছে, এই ডাবগুলোকে নিয়ে কি করা যায়! ওর মধ্যে যাঁরা আবার এক্স্‌ট্রিমিস্ট, তাঁরা বলেছেন, এগুলো একেবারেই গোল্লায় গেছে, এদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। আর মেণ্ডেলের থিওরি যদি মানি, এদের ছেলেপুলেরাও হবে এমনই নবনীতকোমল। কাজেই এদের বংশ বাড়তে দিলে জাতকে জাত ননী মেরে যাবে। অতএব এদের অবিলম্বে ঝাড়েমূলে উৎখাত ক'রে দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা হোক, হিট্‌লার যেমন জু তাড়াচ্ছে। কিন্তু আর একদল বলছে, তা হ'লে চলবে কি ক'রে? এদের আগেকার জেনারেশন গেছে বুড়ো হয়ে। এখন যুবোগুলোকে যদি সব তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে জাত

টিকবে কাকে নিয়ে? ঠাকুদ্দা থেকে নাতিতে লাফ মেরে মেরে তো আর সত্যিই একটা জাত চলতে পারে না। আর এদের তবু হাজার হোক বয়সের জোর আছে। বুড়োরা হয়েছে জরাজীর্ণ। তারাই বা এদের সমান জায়গা নেয় কি ক'রে? এই নিয়ে মহাতর্ক। এই কাগজটাতে লিখেছে—এটার তারিখ হচ্ছে ছউই মে, দু মাস আগেকার কথা। স্মাগল্ড হয়ে আসতে অ্যাদ্দিন লেগেছে, আমি কাল পেয়েছি। এতে লিখছে— বলিয়া প্রভাতদা কাগজখানা খুলিলেন। এক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন, শুনুন পড়ছি। কিন্তু, মানে—আপনাদের মধ্যে কেউ জাপানীজ জানেন তো?

সকলে গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

প্রভাতদা একবার চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন, কেউ না? তা হ'লেই তো মুশকিল। আচ্ছা শুনুন, আমি বাংলা ক'রেই ব'লে যাচ্ছি।

তোকিয়ো, পাঁচুই মের খবর। তরুণ প্রব্‌লেম নিয়ে পার্লামেণ্টে যে কচকচি চলছে, তার শেষ কি দাঁড়াবে বলা শক্ত। গভর্মেণ্ট জোর দিয়ে বলেছেন, এদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতেই হবে। ওদিকে ন্যাশনাল ওয়েল্‌ফেয়ার কমিটি বলছেন, এদের তাড়ালে পরে দারুণ মুশকিলে পড়তে হবে। কারণ এদের তাড়ালে দেশে পুরুষ যারা থাকবে, তারা হচ্ছে বৃদ্ধ ও শিশুর দল। শুধু বৃদ্ধদের নিয়ে দেশের মিলিটারি স্ট্রেংথ থাকবে না। অন্য সব দিকেতেও ওয়ার্কিং এনার্জি ক'মে যাবে। শিশুরা বড় হতে এখনও হবে-গড়ে পনরো থেকে কুড়ি বছর। এই দীর্ঘকাল ধ'রে দেশের সকল কাজকর্ম চালাবার মত সংস্থান কোথা থেকে পাওয়া যাবে?

স্টপ প্রেসে আর একটুখানি খবর আছে, গুজব শোনা যাচ্ছে, ক্যাবিনেট নাকি আপাতত বিদেশ থেকে কিছু লোক আনিয়ে কাজ

চালিয়ে নেবার কথা ভাবছেন। এ সম্বন্ধে কোন সরকারী বিবৃতি এখনও দেওয়া হয় নি। যদি লোক আমদানি করাই হয়, কোথা থেকে আনা হবে, সে সম্বন্ধেও কিছু স্থির হয়েছে ব'লে জানা যায় না। তবে আশা করা যায়, দু-চার দিনের ভেতরেই একটা অফিসিয়াল ডিসিশন প্রকাশ করা হবে।

প্রভাতদা থামিলেন।

নিতাইবাবু কহিলেন, দেখি কাগজটা। কাগজটা দেখিয়া কহিলেন, আচ্ছা, এই ওপরের দু কোণে দুটো জুতোর ছবি দিয়েছে কেন?

প্রভাতদা কহিলেন, এটা ঝাঁজি পার্টির আশ্রিত পেপার কিনা। ওই হচ্ছে ওদের নতুন এম্‌ব্লেম।

নিতাইবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, জুতো?

হ্যাঁ। ওরা বলে, দেশের উন্নতির পথে যা কিছু বাধাবিঘ্ন আসবে, সমস্ত মাড়িয়ে দ'লে যাওয়াই হচ্ছে আমাদের পণ। তাই ওরা হার্ডসোল বুটজুতোকে ওদের পার্টি-এম্‌ব্লেম ক'রে নিয়েছে, রাশিয়ার যেমন কাস্তে-হাতুড়ি। লিবারেলদের এম্‌ব্লেম ছিল চন্দ্রমল্লিকা।

ফণি হাত বাড়াইয়া কাগজখানা তুলিয়া লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, তারপর আপন মনেই কহিল, আশ্চর্য!

প্রভাতদা কহিলেন, আশ্চর্য তো বটেই। রবীন্দ্রনাথকে দেখতে গিয়ে এরা দেখল তাঁর চুল আর দাড়ি, সত্যিকার রবীন্দ্রনাথ চোখের আড়ালেই থেকে গেলেন। এর চেয়ে বড় কেলেঙ্কারি আর কি হতে পারত, বল!

ফণি কহিল, সে কথা নয়। কাল মেজো কাকীমার একটা জাপানী স্লিপার কিনে এসেছে, তার বাক্সটার মধ্যেও ঠিক এমনি একটা কাগজ ছিল জুতো জড়ানো। এমনি ছবি তাতেও আঁকা।

প্রভাতদা তৎক্ষণাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া কহিলেন, কই, দেখি দেখি, এস তো নিয়ে। আছে তো, না ফেলে দিয়েছ ?

দেখছি। ফণি চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ওই রকম আর একখানা কাগজ লইয়া ফিরিয়া আসিল।

প্রভাতদা ছোঁ মারিয়া তাহার হাত হইতে কাগজটা লইয়া তাহার উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন, তারপর দ্রুত চক্ষু চালাইতে চালাইতে উৎফুল্লস্বরে কহিলেন, হুঁ।

সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে আর একটা 'হুঁ' বলিয়া প্রভাতদা মুখ তুলিলেন, কহিলেন, নাঃ, প্রোপাগাণ্ডা চালাতে জানে বটে। জানে, গভর্মেণ্ট ইণ্ডিয়াতে ও কাগজ ঢুকতে দেবে না, বাস্, জুতোয় জড়িয়ে পাঠাচ্ছে। কাস্টম অফিসাররা তো আর সবাই কিছু জাপানীজ জানে না, আর জানলেও কেউ অত প'ড়ে দেখবে না। চুপসে লাখ লাখ কাগজ ইণ্ডিয়াতে চ'লে আসবে, দশ হাজারে একজনের চোখেও যদি পড়ে, তা হ'লেও গোটা ইণ্ডিয়াতে পঁয়ত্রিশ হাজার লোক কাগজ পড়বে। মাথা আছে মানতেই হবে।

গোপেনবাবু কহিলেন, কি, আর কিছু খবর আবিষ্কার হ'ল ?

প্রভাতদা কহিলেন, আরে, খবর থাকবে না, এ কি তোমার ধ্যাধ্যেড়ে বাংলা কাগজ পেয়েছ নাকি। দাঁড়াও, প'ড়ে দেখি আগে।

খানিক দূর পড়িয়া প্রভাতদা ফরাশে প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া কহিলেন, যা ভেবেছিলাম। সাধে কি আর ও জাত বড় হয় !

নিতাইবাবু কহিলেন, কি খবর ?

প্রভাতদা কহিলেন, শুনুন। ও, আপনারা তো আবার কেউ—আচ্ছা, আমি বাংলা ক'রেই বলছি। এটার তারিখ হচ্ছে সাতুই জুন। এক মাস পরের খবর। শুনুন।

কাগজটা চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়া প্রভাতদা অনুবাদ করিতে লাগিলেন।—

তোকিও, ৬ই জুন। কচি-সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্যে গভর্মেণ্ট যে কমিশন বসিয়েছিলেন, তেসরা তারিখে তাঁরা তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করেছেন। রিপোর্ট ছাপা হয়ে বাজারে বেরুতে এখনও কিছুদিন দেরি আছে। জনসাধারণের অবগতির জন্যে আমরা তার সারাংশটুকু প্রকাশ করছি।

কমিশন বলেন, এই সমস্যাটাকে আমরা দুটো ভাগ ক'রে দেখেছি, কচিদের নিয়ে কি করা যায়, আর দেশের শক্তিসংস্থানের কি উপায় হতে পারে। এই সম্পর্কে আমরা পণ্ডিত ডাক্তার বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিতে মিলে প্রায় তিনশো লোকের মতামত যাচাই করেছি। শেষকালে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, কচিদের পাকিয়ে তোলবার আশা করা বৃথা। যে ক্যালিবার থাকবার দরুন জাপানী ছেলেরা চিরকাল দুর্ধর্ষ কর্মী হতে পেরেছে, সেই বস্তুটিই এদের ভেতরে আর নেই। এক্ষেত্রে এদের বসিয়ে খাওয়ানোও একটা সমস্যার ব্যাপার। তারপর এরা যাক আর দেশে থাক্‌, দেশের সব কাজকর্ম চালাবার জন্যে লোক দরকার। বাইরে থেকে লোক আনানোর প্রস্তাব আমরা সমীচীন মনে করি না। কারণ বিদেশ থেকে লোক আনতে গেলে তার ঝড়তি-পড়তি বদ্দি মালই নিতে হবে, নিজের বাছাই-করা সিটিজেন কোন দেশই দিতে রাজি হবে না। আর যদিও বা ভাল লোক পাওয়া যায়, তাদের দরুন শেষে যে দেশে বিদেশী প্রভাব বেড়ে উঠবে না বা তারা পরে ফাঁক পেলে নিজের দেশের সুবিধে করবার জন্যে জাপানকে বলি দেবে না, এ সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া চলে না।

অতএব দেশের লোক নিয়েই কাজ চালাতে হবে। মানে, দেশের বুড়োদের আবার তাজা ক'রে তোলবার ও শিশুদের তাড়াতাড়ি ক'রে

বাড়িয়ে তোলবার উপায় দেখতে হবে। আর এক সমস্যা, এই কচিদের যদি দেশ থেকে তাড়িয়েও দেওয়া হয়, এরা যেখানে যাবে এমনি বাঁদরামো ক'রে জাপানের নাম খারাপ ক'রে দেবে। সেটা জাতীয় প্রেস্টিজের পক্ষে হানিকর। তারও একটা বিহিত হওয়া দরকার। এরা দেশ থেকে যাক আর দেশে থাক্, এদের বাঁদরামো কমাবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের সামনে যে সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে মোটামুটি তিনটি প্রশ্নের আকারে খাড়া করা যেতে পারে—শিশুদের তাড়াতাড়ি বাড়িয়ে তোলা, কচিদের বাঁদরামো কমানো এবং বুড়োদের ফিরে জোয়ান ক'রে তোলা।

প্রথম প্রশ্নটির সমাধান সহজ এবং অন্য দুটির চাইতে আলাদা। এ বিষয়ে বড় বড় ডাক্তারদের সঙ্গে আলাপ ক'রে আমরা জেনেছি, এটা অতি সহজেই করা যাবে। তাদের খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে, আর সম্ভব হ'লে কৃত্রিম উপায়ে তাদের বাড় বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির সম্বন্ধে আমরা এ পর্যন্ত যেসব প্রস্তাব পেয়েছি, তার মধ্যে একটি হচ্ছে, বড় বড় অ্যাসাইলাম ক'রে কচিদের আজীবন আটকে রাখা। কাজটা শক্ত নয়, কিন্তু বাজেটের ওপর সেটা একটা ভারী বোঝা হবে। কেউ কেউ এও বলেছেন, সোজাসুজি শুট ক'রে এদের মেরে ফেলা হোক। তাতে খরচা অবিশ্যি কম, ফলও নিশ্চিত। কিন্তু পাব্লিক সেটাকে বরদাস্ত করবে কি না বলা শক্ত। এদের বাপ-মারা সব ক্ষেত্রে সেটা পছন্দ করবেন না, অনেক জায়গা থেকে এমন আভাসও পাওয়া গেছে।

তৃতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে একটি অতি সহজ ও সুন্দর উপায় ছিল,

অপারেশন ক'রে বাঁদরের গ্ল্যাণ্ড বসিয়ে বুড়োদের আবার তাজা ক'রে তোলা। কিন্তু সেখানে একটা অসুবিধে আছে। যে জাতের বাঁদরের গ্ল্যাণ্ড নিয়ে এই অপারেশন করা হয়, পৃথিবীতে তার সংখ্যা খুবই কম। আমাদের দরকার মাফিক এত বেশি পরিমাণ বাঁদর পাওয়া যাবে ব'লে বিশেষজ্ঞরা ভরসা দেন না।

গোপেনবাবু কহিলেন, কেমন, শেষ পর্যন্ত সেই বাঁদরই আনলে তো টেনে?

প্রভাতদা কহিলেন, এই রে, ধ'রে ফেলেছে। ভয় পেয়ো না, এ বাঁদরের ল্যাজ নেই।

এই সমস্ত বিবেচনা ক'রে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত ও সাজেশন দিচ্ছি। এর পরে সাজেশনগুলো দিয়েছে—

শিশুদের খাবারের স্ট্যাণ্ডার্ড ও পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া।

দরকার হ'লে অন্যদের খাবার রেশন ক'রেও তাদের বরাদ্দ বাড়ানো, ও তারা ঠিক খেতে পাচ্ছে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে স্টেটের তত্ত্বাবধানে বড় বড় বোর্ডিং-হাউস ক'রে তাদের এনে রাখা।

সার্জিকাল অপারেশন ক'রে তাদের পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের সিক্রিশন বাড়িয়ে দেওয়া।

কচিদের বাঁদরামো কমাবার জন্যে আইন ক'রে সমস্ত কচি-ক্লাব ভেঙে দেওয়া। কচিপনা করাটাকে পাব্‌লিক নুইসেন্স ব'লে পাঁচ আইনের অন্তর্গত ক'রে ফেললেই ভাল হয়।

টাকায় কুলোলে অ্যাসাইলাম করা যেতে পারে। তা না হ'লে অন্তত কতকগুলো জায়গা কাঁটা-তার দিয়ে ঘিরে কচি-কলোনি ক'রে দেওয়া এবং সমস্ত কচিদের সেখানে এনে আটকে রাখা, যেন তাদের হাওয়া আর কাউকে না লাগে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, কচিত্ব ভারি ছোঁয়াচে।

কচিদের ভেতর যারা আবার কচিষ্ঠ, তাদের বেছে বেছে বার ক'রে, তারপর তাদের থাইরয়েড কেটে নিয়ে বুড়োদের গলায় বসিয়ে দেওয়া। এতে বুড়োদেরও সমস্যা মিটবে, কচিদেরও বাঁদরামো কমবে।

শেষোক্ত প্রস্তাবটির গুরুত্ব বেশি ব'লে কথাটাকে রেফারেণ্ডামে দিয়ে সমস্ত জাতির মত নেওয়া আমরা উচিত মনে করি। আমাদের আশা আছে, দেশভক্ত জাপানী এতে অমত করবে না।

আমরা কমিশনের মতামত দিলাম। সম্ভবত শিগগিরই পার্লামেণ্টে এ নিয়ে আলোচনা শুরু হবে।

প্রভাতদা কাগজখানা মুড়িয়া পকেটে রাখিলেন, কহিলেন, এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। সবটা প'ড়ে দেখতে হবে।

দেয়ালে বড় ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল।

অমল ফণির কানে কানে কহিল, বাজে।

ফণি কহিল, কি, ঘড়িটা?

অমল কহিল, না, গল্পটা।

প্রভাতদা আড়চোখে তাকাইয়া কথাটা লক্ষ্য করিলেন, তারপর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, আরে ভাই, জাপানী সবই বাজে, মায় পয়সার মাল পেন্সিল পর্যন্ত। এ তো বিনি পয়সার গল্প। আচ্ছা, রাত অনেক হ'ল, উঠি এবারে।

মুক্তি ?

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু হস্তিনাপুরীর প্রাসাদপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তখনও প্রদীপ জ্বলে নাই। চতুর্দিকে প্রাসাদ-হর্ম্যরাজি আলোকোজ্জ্বল। সেই আলোকের প্রতিচ্ছায়া পাষাণ-চত্বরে প্রতিফলিত হইয়া কক্ষের অন্ধকারকে তরল ও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

অস্পষ্ট আলোকে চক্ষে পড়ে, শয্যার উপরে মাতা ও পুত্র। পুত্র উপাধানে মুখ রাখিয়া শুইয়া আছে, অসম নিঃশ্বাসের শব্দে তাহার অবরুদ্ধ ক্রন্দন-বেগের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার পৃষ্ঠে একখানি হাত রাখিয়া মাতা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার চক্ষুর নিঃশব্দ ধারা পুত্র দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব তাহার অজ্ঞাত নহে। তাহার পাঁচ বৎসরের জীবনে মাতার চক্ষে এই অশ্রু সে কখনও শুকাইতে দেখে নাই।

বহুক্ষণ পরে বালক কহিল, মা!

মাতা কহিলেন, বাবা।

বালক কহিল, মা, এমন কেন হইল?

মাতা কহিলেন, অদৃষ্ট। রাত্রি অনেক হইয়াছে ধ্রুব, ঘুমাও।

ধ্রুব কহিল, কেন পিতা এমন করিলেন? আমি তো তাঁহার ক্রোড়ে উঠিতে চাহি নাই।

সুনীতি কহিলেন, ছি ধ্রুব! তিনি তোমার পরমগুরু, তাঁহার কার্যের সমালোচনা করিও না। ঘুমাও।

ধ্রুব নিঃশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু বুজিল।

মুহূর্ত পরে এক দাসী কক্ষে প্রবেশ করিল, কহিল, দেবি, মহর্ষি আসিয়াছেন।

সুনীতি সত্বর শয্যা ত্যাগ করিয়া কহিলেন, তাঁহাকে সসম্মানে লইয়া আইস। আর একটি প্রদীপ আনিয়া দাও।

অনতিবিলম্বে দীপহস্তা দাসীর পশ্চাতে মহর্ষি নারদ প্রবেশ করিলেন। মাতা ও পুত্র তাঁহার পদবন্দনা করিলে ঋষি আসন গ্রহণ করিলেন। দাসী দীপ রাখিয়া চলিয়া গেল।

নারদ কহিলেন, মাতা, কুশল?

সুনীতি কহিলেন, আর কুশল, দেব। সকলই তো শুনিয়াছেন।

নারদ কহিলেন, হাঁ। সেইজন্যই একবার সংবাদ লইতে আসিলাম। ধ্রুবকে সস্নেহে অঙ্কে টানিয়া লইয়া নারদ কহিলেন, ধ্রুব, বল তো বৎস, কি কি হইয়াছিল?

ধ্রুব ম্লান নয়নে মাতার দিকে চাহিল।

সুনীতি কহিলেন, বল, ধ্রুব। মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উঁহাকে বলিতে দোষ নাই।

মাতার অনুজ্ঞা পাইয়া ধ্রুব প্রভাতের বৃত্তান্ত ঋষির নিকটে বিবৃত করিল।

প্রভাতে ধ্রুব তাহার একমাত্র ক্রীড়াসঙ্গী শশক-শাবককে লইয়া খেলিতেছিল। সহসা শশক দৌড়িয়া রাজসভায় প্রবেশ করে। শশকের পশ্চাতে আত্মবিস্মৃত ধ্রুবও সভামণ্ডপে গিয়া উপস্থিত হয়। মলিন-বস্ত্রপরিহিত অনাদৃত রাজপুত্রকে দেখিয়া সভামধ্যে মৃদু গুঞ্জন উত্থিত হয়। অপ্রতিভ রাজা উত্তানপাদ সিংহাসন হইতে নামিয়া ধ্রুবকে ক্রোড়ে তুলিয়া লন। ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইয়া তিনি সিংহাসনে বসিলে সভাসদ্‌গণ বিপুল হর্ষধ্বনি করিয়া উঠে। অতর্কিত কোলাহল শুনিয়া রাজ্ঞী সুরুচি

অন্তরালস্থ আসন ত্যাগ করিয়া সভামধ্যে উপস্থিত হন। সুরুচির চক্ষে বহ্নির আভাস পাইয়া ত্রস্ত রাজা ধ্রুবকে নামাইয়া দিতে যান; তাড়াতাড়িতে তাঁহার হাতের ঠেলা লাগিয়া ধ্রুব সিংহাসন হইতে একেবারে নিম্নে শিলাস্তরণে পড়িয়া গিয়াছে, বাম কফোণিতে আঘাত পাইয়াছে।

বলিতে বলিতে ধ্রুবের চক্ষে জলের ধারা বহিতে লাগিল। নারদ সস্নেহে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, বৎস, সকলই নিয়তির খেলা। কাঁদিয়া কি হইবে? কাঁদিও না। মাতা তোমার হস্তে জলসিক্ত পট্টিকা বাঁধিয়া দিবেন, তাহা হইলেই ব্যথা সারিয়া যাইবে।

ধ্রুব কহিল, আমি হাতের ব্যথায় কাঁদি নাই। সভামণ্ডপে সকলের সম্মুখে আছাড় খাইবার লজ্জা আমি ভুলিতে পারিতেছি না। মহর্ষি, পিতা আমাকে কেন অমন করিয়া ঠেলিয়া ফেলিলেন? আমি তো তাঁহার ক্রোড়ে থাকিতে চাহি নাই। আমি আপনিই নামিয়া যাইতেছিলাম।

নারদ কহিলেন, বৎস, বলিলাম তো, সকলই নিয়তি। নহিলে বিশ্বে কে কাহাকে ঠেলিয়া ফেলে?

সুনীতি কহিলেন, ধ্রুব, তোমাকে না বলিলাম, গুরুনিন্দা করিতে নাই? কে বলিল, মহারাজ তোমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছেন? হয়তো তিনি তোমাকে ধরিয়া রাখিতেই চাহিয়াছিলেন, তুমিই টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গিয়াছ।

ধ্রুব কিছুক্ষণ নীরব রহিল। তারপর আবার কহিল, মহর্ষি, আমি পড়িয়া গেলাম কেন?

সুনীতি কহিলেন, কি মূর্খের মত প্রশ্ন করিতেছ তুমি! টাল সামলাইতে না পারিলে সকলেই পড়িয়া যায়। তুমিও গিয়াছ। ইহার আবার 'কেন' কি?

নারদ কহিলেন, না বৎসে, বারণ করিও না। শিশুর মনে যে অনুসন্ধিৎসা জাগে তাহা তাহার বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষের পরিচায়ক। তাহার সেই জ্ঞানস্পৃহাকে কখনও বাধা দিতে নাই। বল ধ্রুব, তুমি কি প্রশ্ন করিতেছিলে?

ধ্রুব কহিল, আমি হয়তো পিতার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া সিংহাসন হইতে নিম্নে মাটিতে পড়িয়া গেলাম কেন?

সুনীতি কহিলেন, আবার মূর্খের মত প্রশ্ন! সিংহাসন হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ, মাটিতে পড়িবে না তো কোথায় পড়িবে, শুনি?

নারদ ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, ধ্রুব সঙ্গত প্রশ্নই করিয়াছে। বস্তুত ইহা জগতের অন্যতম আদিম শাশ্বত প্রশ্ন, মানবের বহু প্রশ্ন বহু সমস্যা ইহাকে ঘিরিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। উচ্চস্থান হইতে স্খলিত মানব নিম্নে পতিত হয়। মানবের অধঃপতনের কারণ কি, এই প্রশ্নের উত্তর আমি বলিতেছি, ধ্রুব, শ্রবণ কর। মাতা, তুমিও অবধান কর।

অনন্ত অসীম জগৎমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ এক আদিম ও শাশ্বত আকর্ষণে পরস্পরে সংলগ্ন ও সম্পৃক্ত রহিয়াছে। এই আকর্ষণ সমগ্র সংসারের শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে। বিশ্বস্থ চরাচর সজীব নির্জীব সকল বস্তু অপরাপর বস্তুনিচয়কে স্বতঃই নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, অপরকে নিকটে টানিয়া আনিবার, নিজের সহিত সংলগ্ন, মিলিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। এই মহা আকর্ষণ বিশ্বসৃষ্টি ও বিশ্বস্থিতির প্রধান কারণ। জ্ঞানিগণ ইহাকে মায়া বলেন, বৈজ্ঞানিকরা ইহাকেই মাধ্যাকর্ষণ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই মহাশক্তির তাড়নায় গ্রহনক্ষত্র স্ব স্ব কক্ষে সতত ধাবিত হয়; ইহারই প্রেরণায় মাতা পুত্রকে, পতি পত্নীকে, বন্ধু বন্ধুকে একান্ত আপনার বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরে;

ইহারই মোহে পুরুষ নারীর দিকে আকৃষ্ট হয়, ব্যাঘ্র মনুষ্যকে ভক্ষণ করে, রাজা পার্শ্ববর্তী রাজার রাজ্য আপনার করায়ত্ত করিতে চাহেন। ইহারই পাশে বদ্ধ বলিয়া আত্মা পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া যাইতে ব্যথিত হয়; ইহারই বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মা জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে। স্থান কাল ও পাত্র বিশেষে এই আকর্ষণ নব নব রূপ ও নব নব নামে আত্মপ্রকাশ করে; কোথাও ইহার নাম চৌম্বক আকর্ষণ, কোথাও বাৎসল্য, কোথাও হিংসা, কোথাও চিচুরিয়া, কোথাও প্রেম, কোথাও বিজিগীষা। বৎস, এই আকর্ষণ, এই মায়ার পাশে জীব পৃথিবীর সহিত বদ্ধ থাকে, নিয়ত ধরিত্রীবক্ষের অভিমুখে আকৃষ্ট হয়, উচ্চস্থান হইতে স্খলিত হইবামাত্র বেগে ভূতলে পতিত হয়। চলিত ভাষায় তাহাকেই বলে আছাড় খাওয়া। এই মোহকে ছিন্ন করিতে পারিলে তাহাকে বলে মুক্তি। তাহার জন্য ঋষিরা যুগ যুগ ধরিয়া তপস্যা করেন।

ধ্রুব কহিল, মহর্ষি, এই মায়া বা মাধ্যাকর্ষণ, ইহার পাশ কেহ ছিন্ন করিতে পারিলে তাহার কি হয়?

নারদ কহিলেন, মুক্তি হয়। মুক্ত বিহঙ্গম যেমন যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারে, মুক্ত জীবও তাহাই পারিবে। সেই মুক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া ঋষিরা জ্যোতিঃপথে গতায়াত করিয়া থাকেন।

ধ্রুব কহিল, তাঁহারা আছাড় খান না?

নারদ কহিল, না। আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, সকল প্রকার আছাড়েরই তাঁহারা ঊর্ধ্বে চলিয়া যান।

ধ্রুব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল। তারপর কহিল, মুক্তি কিরূপে হয়?

নারদ কহিলেন, সাধনা দ্বারা। কিন্তু ইহা সহজলভ্য নহে। যুগ যুগ

ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিয়া ঋষিগণ ও যোগিগণ ইহার আস্বাদমাত্র লাভ করেন, সেই কণিকারও স্থায়িত্ব অতি সামান্য।

ধ্রুব কহিল, আমি তপস্যা করিব।

সুনীতি কহিলেন, কি যা-তা বকিতেছ তুমি, ধ্রুব! তপস্যার বয়স তোমার হইয়াছে নাকি?

নারদ কহিলেন, মাতা ঠিকই বলিয়াছেন, ধ্রুব। তোমার এখনও তপস্যা করিবার বয়স হয় নাই। মনে গাম্ভীর্য ও মুখে দীর্ঘ শ্মশ্রুর সঞ্চার না হইলে তপস্যায় অধিকার জন্মে না।

ধ্রুব কহিল, কিন্তু আপনি যে বলিলেন, যোগীরা মুক্তির আস্বাদমাত্র পাইয়া থাকেন; সম্পূর্ণ মুক্তি কি কেহই লাভ করিতে পারে না?

নারদ কহিলেন, পারে না বলিতে পারি না, কিন্তু কাহাকেও পারিতে দেখি নাই। পূর্ণ মুক্তি দুর্লভ্য বস্তু, সাধনা ও সিদ্ধির যে স্তরে পৌঁছিলে ইহার নাগাল পাওয়া যায়, তাহা একমাত্র ভগবান নারায়ণের কৃপাতেই সম্ভব। তাঁহার কৃপা ব্যতীত ইহা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।

ধ্রুব কহিল, নারায়ণ কে?

নারদ কহিলেন, নারায়ণ সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ, তিনিই বিশ্বনিয়ন্তা। গোলোকে তাঁহার বাস।

ধ্রুব কহিল, গোলোক কোথায়?

নারদ কহিলেন, কোথাও নহে। গোলোক সর্বত্র। 'গো' শব্দের অর্থ রশ্মি। নারায়ণের কৃপার রশ্মি যেখানে পতিত হয়, মানবের চিত্তে ভক্তির রশ্মি, সৎধর্মের রশ্মি যেখানে প্রজ্বলিত হয়, সেইখানেই গোলোক, সেইখানেই নারায়ণের বাস।

ধ্রুব কহিল, কিন্তু সর্বত্রই যদি তিনি থাকেন, তবে কেন ঋষিরা গভীর বনের মধ্যে গিয়া তপস্যা করেন?

নারদ কহিলেন, মনঃসংযোগের জন্য। লোকালয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, দুরাত্মা প্রতিবেশীদিগের গাত্রঘর্ষণে তপস্যায় একাগ্রচিত্ত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। বনে সাধনার নিভৃত অবসর মেলে।

ধ্রুব কহিল, তপস্যা কিরূপে করিতে হয়?

নারদ কহিলেন, তপস্যার প্রথা ও প্রক্রিয়া বহুবিধ, কিন্তু মূলে সকল তপস্যাই এক। তোমাকে একে একে আমি সকল কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

সুনীতি নীরবে শুনিতেছিলেন। তিনি ত্রস্ত হইয়া কহিলেন, মহর্ষি, করিতেছেন কি, সর্বনাশ ঘটাইবেন না। এই বালককে তপস্যাবিধি বলিতে আপনি উদ্যত হইয়াছেন; সে বিধি শিখিলে কি আর আমি ইহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিব?

নারদ কহিলেন, মাতা, তুমি সত্য বলিয়াছ। আমার ও কথাটা মনে হয় নাই। বৃদ্ধ হইয়াছি; বার্ধক্যের সহিত স্বতঃই অমিতভাষিতা আসিয়া পড়ে। ধ্রুব, তোমার এখন তপস্যাবিধি শিখিবার সময় নহে। তুমি রাজপুত্র, এখন তোমার শিক্ষণীয় বিষয় হইতেছে রাজধর্ম, বীরোচিত ক্ষাত্রধর্ম। যৌবনের অন্তে সংসার ত্যাগ করিয়া যখন তোমার বানপ্রস্থে যাইবার সময় হইবে, তখন আমি স্বয়ং তোমাকে তপস্যার রীতি শিখাইয়া দিব। আজ আমি আর বসিব না, রাত্রি অনেক হইয়াছে।

মহর্ষি চলিয়া গেলেন।

সুনীতি কহিলেন, ঘুমাও ধ্রুব। তপস্যার চিন্তাকে তুমি মনে স্থান দিও না। আমার একমাত্র অবলম্বন তুমি। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে আমার কি অবস্থা হইবে?

অন্যমনস্ক ধ্রুব উত্তর দিল না।

রাত্রি গভীর। সমস্ত রাজপুরী সুপ্তিতে অচেতন। চিন্তাভারে শ্রান্তা সুনীতি নিঃসাড়ে ঘুমাইতেছেন।

আহত কফোণিতে তীব্র বেদনা অনুভব করিয়া ধ্রুবের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘুমের ঘোরে ধ্রুব খাট হইতে পড়িয়া গিয়াছে।

মাধ্যাকর্ষণ। অচ্ছেদ্য। অজেয়। অমোঘ।

ধ্রুব ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুপ্তা মাতার মুখের দিকে একবার চাহিল। তারপর নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল।

সে তপস্যা করিবে। মাধ্যাকর্ষণকে জয় করিবে।

ঘোর অরণ্য। বৃক্ষতলে একাসনে উপবিষ্ট ধ্রুব।

অরণ্যের ব্যাঘ্র আসিল, কহিল, ধ্রুব, তোমাকে খাইব।

ধ্রুব কহিল, মূঢ়, মোহকে প্রশ্রয় দিও না, তাহাকে জয় কর।

জলৌকা কহিল, ধ্রুব, তোমাকে ধরিলাম।

ধ্রুব কহিল, আমার শিরাস্থ শোণিত বিকর্ষক, তোমাকে সে আকর্ষণ করিবে না।

উর্বশী মেনকা রম্ভা আসিয়া কহিল, ধ্রুব, এই দেখ আমরা নাচিতেছি।

ধ্রুব চক্ষু খুলিল না, কহিল, আমার এখন নাচ দেখিবার সময় নাই।

ঐশ্বরী মায়া সুনীতির বেশ ধরিয়া আসিল, কহিল, ধ্রুব, তোমার জন্য সন্দেশ আনিয়াছি, খাও।

ধ্রুব কহিল, না। সন্দেশ খাইলেই আবার খাইতে ইচ্ছা করে, অন্তরস্থ মাধ্যাকর্ষণকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

অবশেষে তপস্যামগ্ন ধ্রুবের সম্মুখে নারায়ণ আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্নিগ্ধ আলোকে বনপথ উদ্ভাসিত হইল।

নারায়ণ ডাকিলেন, ধ্রুব !

ধ্রুব কহিল, কে আপনি ?

নারায়ণ কহিলেন, চক্ষু মেলিয়া দেখ। আমি নারায়ণ। তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়া বর দিতে আসিয়াছি।

ধ্রুব চরণ বন্দনা করিল।

নারায়ণ কহিলেন, তুমি এই কঠোর তপস্যা করিতেছ:কেন ? বল, কি তুমি চাও ?

ধ্রুব কহিল, আগে বলুন, যাহা চাই দিবেন ?

নারায়ণ অসতর্ক, কহিলেন, দিব।

ধ্রুব কহিল, আমি চাই মুক্তি। বিশ্বচরাচরে আপনি মুক্তির বিঘ্ন-স্বরূপ মাধ্যাকর্ষণ ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। সেই মাধ্যাকর্ষণের আমি উচ্ছেদ করিব।

নারায়ণ সবিস্ময়ে কহিলেন, সে কি ? মাধ্যাকর্ষণের উপর তুমি চটিলে কেন ?

ধ্রুব উত্তেজিত হইয়া কহিল, কেন! মানুষের দুর্গতি, মানুষের অধঃপতনের মূল—মাধ্যাকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণের মোহে ব্যাঘ্র ও জলৌকা মনুষ্যকে আক্রমণ করে। মাধ্যাকর্ষণের প্রেরণায় মানুষ পরস্ব অপহরণ করে। মাধ্যাকর্ষণ আছে বলিয়াই তো আমি আছাড় খাইয়াছি, দুই দুই বার।

নারায়ণ কহিলেন, যত দুর্গতির মূল মাধ্যাকর্ষণ, এ কথা তোমাকে কে শিখাইয়াছে, ধ্রুব ?

ধ্রুব কহিল, যেই শিখাক। ইহার সত্যতা তো আপনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

নারায়ণ কহিলেন, পারিব। ধ্রুব, তোমাকে কেহ মিথ্যা বুঝাইয়াছে।

মাধ্যাকর্ষণ কেবল পতনের মূল নহে, উন্নতিরও মূল। সকল প্রকার গতিই মাধ্যাকর্ষণের সৃষ্টি; সেই গতি যে ক্ষেত্রে নিম্নমুখী হয়, তাহার জন্য দায়ী তত্রস্থ ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি। মূর্খের ও বিকৃতবুদ্ধির হস্তে ইহার অপব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া এই শক্তিটাকেই মন্দ বা অবাঞ্ছনীয় তুমি বলিতে পার না। মাধ্যাকর্ষণের কুফল তোমার চক্ষে পড়িয়াছে; ইহার উপকারিতার কথা তুমি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ?

ধ্রুব কহিল, কি আবার ইহার উপকারিতা?

নারায়ণ কহিলেন, শ্রবণ কর। বিশ্বসংসার আমার বিরাট ও বিচিত্র সৃষ্টি। ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন বস্তুকে একত্রে বাঁধিবার, এক সুসমঞ্জস বিধানে চালাইবার ব্যবস্থা না থাকিলে ইহার অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয় না। মাধ্যাকর্ষণ সেই বন্ধন। মহামায়ার এই অদৃশ্য অথচ অলঙ্ঘ্য বন্ধনে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি একত্র গ্রথিত, সুসংবদ্ধ। মাধ্যাকর্ষণ ব্যাঘ্রের মধ্যে হিংসার রূপে আত্মপ্রকাশ করে—ইহাই তুমি জানিয়াছ ধ্রুব, তোমার জন্য তোমার মাতার হৃদয়ে যে বাৎসল্যের মধুভাণ্ডার সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহাও সেই মাধ্যাকর্ষণেরই আত্মপ্রকাশ—এ কথা তোমার কখনও মনে হইয়াছে? মাধ্যাকর্ষণ আছে বলিয়াই তুমি মুক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছ; মাধ্যাকর্ষণ আছে বলিয়াই তোমার তপস্যা আমাকে বাঁধিয়া তোমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। তবু কি বলিবে, মাধ্যাকর্ষণ কেবল অমঙ্গলেরই মূল, মঙ্গলের মূল নয়?

ধ্রুব কহিল, এত কথা আমি শুনিতে চাহি না। আমার কথা, বিশ্বসংসার হইতে মাধ্যাকর্ষণকে আমি বিলুপ্ত করিব।

নারায়ণ কহিলেন, অসম্ভব। বিশ্বসংসারের সৃষ্টি ও স্থিতির মূল মাধ্যাকর্ষণ। ইহার উচ্ছেদ অর্থ সৃষ্টির বিলোপ। তাহার জন্য তুমি

তপস্যা করিতে পার না। অশুভ উদ্দেশ্যে তপস্যার অপব্যবহার করিবার অধিকার কাহারও নাই।

ধ্রুব কহিল, আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান। যে সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইতে কিছুতেই বিচ্যুত হইব না।

নারায়ণের ওষ্ঠাধর মৃদুহাস্যরঞ্জিত হইল। কহিলেন, ধ্রুব, জান কি, ইহাও মাধ্যাকর্ষণেরই খেলা?

ধ্রুব কহিল, জানিতে চাহি না। আপনি আমার প্রার্থিত বর দিতে প্রতিশ্রুত। এখন যদি সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে চাহেন, তবে আমার বলিবার কিছু নাই।

নারায়ণের মুখশ্রী গম্ভীর হইল। কহিলেন, ধ্রুব, বালক তুমি। অথচ যে কথা আমাকে বলিলে, ত্রিসংসারে কেহ কোনদিন আমাকে তাহা বলিতে সাহস করে নাই। তুমি বলিলে, বেশ, আমার প্রতিশ্রুতি আমি রাখিব। মাধ্যাকর্ষণের উচ্ছেদ চাহিবার অধিকার তোমার নাই। তুমি কেবল তোমার ব্যক্তিগত প্রার্থনাই করিতে পার। তুমি যদি চাও, তোমার উপরে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব আমি রহিত করিয়া দিব। আর এ কথাও সত্য, তোমার মত নির্বোধ ও একগামী বালককে নিজের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া বিশ্বসংসারের কোন উপকার নাই। বালকবয়সেই তুমি এতখানি দুর্বিনীত, বড় হইয়া তুমি কি হইবে?

ধ্রুব মুখ গোঁজ করিয়া কহিল, বক্তৃতা রাখিয়া দিন। আমার নিজের মুক্তিই আমি চাই।

নারায়ণ কহিলেন, ধ্রুব, এখনও ভাবিয়া দেখ। একবার ইহার বাহিরে গেলে, পরে হাজার চাহিয়াও আর বিশ্বশৃঙ্খলার প্রবাহে ফিরিতে পারিবে না। একবার মাধ্যাকর্ষণ-রহিত হইলে আর কখনও ডাকিয়া আমার সাক্ষাৎ পাইবে না।

ধ্রুব কহিল, চাহিবও না। আপনি আমাকে মাধ্যাকর্ষণ-রহিত করিয়া দিন, আপনার বিশ্বসৃষ্টিতে আমার প্রয়োজন নাই।

নারায়ণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তথাস্তু।

অসীম শূন্যে বন্ধনমুক্ত ধ্রুব ঝুলিয়া আছে। তাহাকে কেহ নিকটে টানে না, তাহার আকর্ষণ কেহ অনুভব করে না। চতুর্দিকে সৌরজগৎ গ্রহনক্ষত্রেরা পরস্পরের প্রীতি ও আকর্ষণে ছুটিয়া বেড়ায়, নিশ্চল নিস্পন্দ ধ্রুব চাহিয়া দেখে। তাহার গতি নাই,—দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে, উর্ধ্বে, নিম্নে—তাহাকে আকর্ষণ করিবার, কাছে টানিয়া লইবার কেহ নাই। পাশ দিয়া গ্রহ নক্ষত্র উল্কা ধূমকেতুরা ছুটিয়া চলিয়া যায়—ধ্রুবের দিকে কেহ ফিরিয়া চাহে না, বিচ্ছুরিত আলোকধারার, বিস্ফুরিত উল্কাখণ্ডের একটি কণা পাঠাইয়াও কেহ তাহাকে স্পর্শ করে না। অনন্ত অসীম চরাচরে ধ্রুব একাকী। সে বন্ধনহীন, সে অনাকৃষ্ট, অনাত্মীয়, অবান্ধব।

রাত্রির পর রাত্রি নিঃসীম শূন্যে বিনিদ্র চক্ষু মেলিয়া সে চাহিয়া থাকে—সতৃষ্ণনেত্রে একদা-পরিচিত পৃথিবীর দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। চাহিয়া চাহিয়া অজ্ঞাতে কি তাহার নয়নকোণে অলক্ষিত একবিন্দু অশ্রু জমিয়া উঠে? জানি না। কেহ জানে না। জগৎ বহিয়া চলে, ধ্রুবের দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না, কেবল সপ্তর্ষিমণ্ডলের বিরাট প্রশ্নচিহ্নটা তাহাকে কেন্দ্র করিয়া আকাশে ঘুরিতে থাকে। লব্ধমুক্তি ধ্রুবের দিকে চাহিয়া কি যেন এক অন্তহীন মূক প্রশ্ন সপ্তর্ষির মধ্যে জাগিয়া থাকে—কিন্তু কে বলিবে সে প্রশ্নটা কি?

বর

সকালবেলা। কাম্যক বনের ঘন গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে সোনালি রৌদ্র মাটিতে পড়িয়া চিত্র-বিচিত্র নকশার সৃষ্টি করিয়াছে। পাখিরা কলরব করিতেছে, মশাদের কোলাহল থামিয়াছে।

সারারাত হোম হইয়াছে, ভোরবেলাই হারীতের ক্ষুধা পাইয়াছিল। গৃহমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিল, জননী গৃহে নাই। হারীত তন্দ্রায় পড়িয়াছিল, গৃহকোণে কলসটিও নাই দেখিয়া বুঝিল, মা জল আনিতে গিয়াছেন।

হোম আজও চলিবে, সমিধ-আহরণে যাওয়া দরকার। অথচ সারা রাত জাগরণের পর খালি-পেটে কুড়াল চালানোও আরামের কথা নয়। হারীত অধীর হইয়া ছটফট করিতে লাগিল; তাহার ব্যগ্র চক্ষু পথের পানে এবং শঙ্কিত কর্ণ যজ্ঞশালার দিকে উদ্যত রহিল।

সকল দুঃসময়েরই কালে অবসান হয়। শুচিস্মিতাও জল লইয়া ফিরিলেন। হারীতকে দেখিয়া কহিলেন, এ কি, তুই এখনও সমিধ আহরণ করিতে গেলি না যে?

হারীত কহিল, ক্ষুধায় আমার অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছে। খাইয়া যাইব বলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম।

শুচিস্মিতা কহিলেন, কিন্তু ওদিকে সমিধ অভাবে যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটিলে উনি ক্রুদ্ধ হইবেন। লক্ষ্মী বাবা আমার, তুমি চটপট কিছু কাষ্ঠ লইয়া আইস, আমি ততক্ষণ অতি উৎকৃষ্ট আহার্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি।

হারীত কহিল, 'লক্ষ্মী বাবা আমার' ডাকিলেই যদি পেট ভরিত, তবে

আর লোকে এত কষ্ট করিয়া কৃষিকর্ম প্রভৃতি করিত না। আমি না খাইয়া যাইতে পারিব না।

শুচিস্মিতা কহিলেন, কিন্তু যজ্ঞের বিঘ্ন যদি হয়? তুমি ঋষিপুত্র, এ কি অন্যায় জেদ তোমার!

হারীত কহিল, আমিও তো তাহাই বলিতেছি। আমি ঋষিপুত্র, মল্লপুত্র নহি। শূন্য উদরে কুঠার চালনা করিবার মত শক্তি আমার নাই।

শুচিস্মিতা রোষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, তবে ঘটুক যজ্ঞের বাধা, কেমন? এহেন পাপবুদ্ধি তোমার জন্মিল কোথা হইতে? তোমার মত গণ্ডমূর্খকে গর্ভে ধরিয়াছি মনে করিয়াও আমার চিত্তে ধিক্কার আসিতেছে। কাষ্ঠ না আনিলে আজ তুমি খাইতে পাইবে না। এই আমি বসিলাম। দেখি, কে তোমাকে খাইতে দেয়।

হারীত উঠিয়া কুঠার স্কন্ধে লইল। কহিল, বেশ, আমার ক্ষুধা অপেক্ষা যখন কাষ্ঠের প্রতিই তোমার নজর অধিক, আমি চলিলাম। কিন্তু দুর্বল দেহে শ্রম করিতে গিয়া যদি হাত পা কাটিয়া ফেলি বা গাছ চাপা পড়িয়া মারা পড়ি, পুত্রহীন আমি হইব না, তোমরাই হইবে—সেই কথাটা মনে রাখিও।

হারীত গরগর করিতে করিতে প্রাঙ্গণে নামিয়া পড়িল। বাহিরে যাইবার পথে একখানি বংশনির্মিত আগড় লাগানো ছিল। রাগের মাথায় সেটাকে ঠেলিয়া যাইতে তাহার পায়ে সামান্য আঘাত লাগিল। ক্রোধোন্মত্ত হারীত ভ্রূক্ষেপও করিল না, বেড়াটা দুম করিয়া ঠেলিয়া দিয়া হনহন করিয়া আগাইয়া চলিল।

শুচিস্মিতা দেখিলেন, হারীতের পায়ে আঘাত লাগিয়াছে। নিমেষে তাঁহার ক্রোধ উবিয়া গেল। উঠিয়া আসিয়া ডাকিলেন, এই, ফিরিয়া আয়, খাইয়া যা।

হারীত থামিয়া দাঁড়াইল, মুখ ফিরাইল না।

শুচিস্মিতা কহিলেন, কাছে আয়, দেখি তোর পায়ে আঘাত লাগিল না কি!

হারীত মুখ ভার করিয়া কহিল, থাক্, দেখিতে হইবে না।

শুচিস্মিতা আগাইয়া আসিলেন, হারীতের হাত ধরিয়া কহিলেন, লক্ষ্মী বাবা আমার, রাগ করিস না। আয়, খাইয়া যা।

হারীত কহিল, হাত ছাড়িয়া দাও বলিতেছি।

শুচিস্মিতা হাতটাকে নিজের মস্তকে স্থাপন করিয়া কহিলেন, আমার মাথা খাস। না খাইয়া তুই যাইতে পারিবি না।

হারীত কহিল, আমি মাথা-টাথা খাইতে পারিব না।

শুচিস্মিতা কহিলেন, বালাই, বালাই, সত্যই মাথা খাইবি কেন! ঘরে কি আহার্যের অভাব ঘটিয়াছে? দেখি, তোর পায়ে কতটা লাগিয়াছে!

হারীত কহিল, লাগে নাই।

নিশ্চয় লাগিয়াছে।

শুচিস্মিতা নুইয়া বসিয়া তাহার পা দেখিলেন। কহিলেন, না, কাটে নাই বটে। বল্কলের পাড়টা খানিক ছিঁড়িয়া গিয়াছে,—দুপুরবেলা ছাড়িয়া দিস, আমি শেলাই করিয়া দিব এখন। চল্, খাইবি। পরশু যে চাঁপাকলা কাটিয়া আনিয়াছিলি, তাহা পাকিয়াছে। নন্দিনীর দুধ দিয়া চমৎকার দধি পাতিয়া রাখিয়াছি।

হারীত ফিরিল। আসনে বসিয়া পড়িয়া কহিল, শীঘ্র লইয়া আইস।

শুচিস্মিতা ঝটিতি দধি ও কলা লইয়া আসিলেন। কহিলেন, চিঁড়া ধুইয়া দিতেছি, ভিজিল বলিয়া।

হারীত কহিল, তুমি জল লইয়া ফিরিতে এত দেরি করিলে কেন? দেরি না হইলে আমার রাগ হইত না।

শুচিস্মিতা চিঁড়া মাখিতে মাখিতে কহিলেন, দেরি হইল কি আর সাধে! আজ ঘাটে গিয়া দেখি, ভগিনী অরুন্ধতীও জল লইতে আসিয়াছে। আমাকে দেখিয়া কত দুঃখের কথা বলিতে লাগিল—

আর তুমি অমনি দাঁড়াইয়া গেলে, না? গল্প পাইলে আর কিছুই মনে থাকে না। এদিকে যে আমি ক্ষুধায় মরিতেছি—

শুচিস্মিতা কহিলেন, রাগ করিস না বাবা, সত্যই ভারি দুঃখের কথা। এত সাধ করিয়া বেচারী পুত্রটির বিবাহ দিয়াছে, এখন বধূর ঠেলায় তাহার প্রাণ যায়। নামেই প্রিয়ংবদা—অমন বদমেজাজী অপ্রিয়ভাষিণী বধূ কাম্যক বনে কেহ কখনও দেখে নাই। অরুন্ধতীর যা কান্না যদি দেখিস।

হারীত কহিল, আমার বহিয়া গিয়াছে তোমার বন্ধুর কান্না দেখিতে যাইতে। তোমার চিঁড়া ধোওয়া কি এ বৎসর সারা হইবে না?

শুচিস্মিতা তাড়াতাড়ি চিঁড়ায় জল ঢালিয়া দিয়া কহিলেন, এই যে হইল। বাবা রে বাবা, কি মেজাজ ছেলের—ওই রকম একটি বধূর পাল্লায় পড়িলেই রাজঘোটক হইত!

হারীত মুঠা মুঠা চিঁড়া দধিপূর্ণ পাত্রে ফেলিতে ফেলিতে কহিল, হুঁ:। চুলের ঝুঁটি ধরিয়া দুই কিলে শায়েস্তা করিয়া দিতাম না!

শুচিস্মিতা কহিলেন, তা বটে। তপোবনকে শবরপল্লী করিয়া না তুলিলে চলিবে কেন?

হারীত চিঁড়া মাখিয়া মুখে তুলিল।

শুচিস্মিতা আপন মনে কহিলেন, আর বিচিত্রই বা কি! হয়তো আমারও গৃহে এমন বধূই আসিবে, আমারও শেষে চোখের জলেই জীবন

কাটিয়া যাইবে। দগ্ধ দেশাচারের জ্বালায়, নিজে যে দেখিয়া শুনিয়া মনের মত বাছিয়া বধূ ঘরে আনিব, তাহার তো জো নাই।

দধিটা ভাল জমিয়াছিল, এবং কাম্যক বনের চিঁড়া ও চাঁপাকলার সুতার বিখ্যাত। অতএব হারীত কহিল, তুমি চিন্তা করিও না মা। বধূ হইতেই যদি তোমার ভয়, আমি বিবাহই করিব না।

শুচিস্মিতা সস্নেহে হাসিয়া কহিলেন, পাগলা ছেলে। সে কথা তোকে কে বলিয়াছে?

হারীত গম্ভীর হইয়া কহিল, না মা, রহস্য নয়। আমার মা তুমি, আমি তোমাকে দুইটা রুক্ষ কথা বলিলেও বা বলিতে পারি। তাই বলিয়া কে-না-কে একটা পরের মেয়ে আসিয়া বলিবে? আমি সত্যই বিবাহ করিব না।

শুচিস্মিতার মুখে ম্লান ছায়া পড়িল। কহিলেন, ছি বাবা, অমন কথা বলিতে নাই। তুমি ঋষিপুত্র, একবার সত্য করিয়া ফেলিলে আর ভাঙিতে পারিবে না। আমার কাছে যা বলিয়াছ বলিয়াছ, আর কখনও এমন কথা মুখে কেন, মনেও আনিও না।

হারীত কহিল, সত্য তোমার কাছে করিলেও সত্য, আর কাহারও কাছে করিলেও সত্য, নির্জনে উচ্চারণ করিলেও সত্য। আমি ঋষিপুত্র—

শুচিস্মিতা কহিলেন, হারীত!

হারীত কহিল, হাঁ, আমি ঋষিপুত্র, যে কথা একবার উচ্চারণ করিয়াছি—

হারীত!!

যে কথা একবার মুখে উচ্চারণ করিয়াছি, তাহার অন্যথা করিতে—

হারীত!!!

অন্যথা করিতে পারিব না। আমি বিবাহ করিব না।

অন্তরীক্ষে দেবগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, কিন্তু শুচিস্মিতার কানে সে ধ্বনি পশিল না। তিনি মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

হারীত ডাকিল, মা!

মা উত্তর দিলেন না।

হারীত ভীতস্বরে ডাকিল, সুশী!

সুশ্বেতা ওদিক হইতে সাড়া দিল, কেন?

শীঘ্র আয়।

সুশ্বেতা ছুটিয়া আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কহিল, কি হইয়াছে দাদা? মা কি মরিয়া গিয়াছেন?

হারীত কহিল, মূর্ছিতা হইয়াছেন। তুই এক পাত্র জল লইয়া আয়।

দুই ভাইবোনে মিলিয়া অনেক জল, অনেক বাতাস দিতে ক্রমে শুচিস্মিতার সংজ্ঞা ফিরিল। চক্ষু অর্ধ-উন্মীলিত করিয়া অস্ফুট ক্ষীণস্বরে কহিলেন, হারীত!

হারীত তাঁহার মুখের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, মা!

শুচিস্মিতা কহিলেন, হারীত, তুই আমার—

হারীত কহিল, হাঁ মা, এই তো আমি তোমার কাছেই রহিয়াছি। ঘুমাও।

শুচিস্মিতা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হারীত কহিল, সুশী, তুই এইখানেই থাক্। মা ঘুম ভাঙিয়া সুস্থ না হইলে অন্যত্র যাইস না।

সুশ্বেতা কহিল, আমি রান্না চাপাইয়া আসিয়াছি যে!

হারীত কহিল, তা হউক। আমি সমিধ-আহরণে চলিলাম।

পাত্রগুলি সরাইয়া রাখ্, খাইতে বসিয়া সমিধ আনিতে যাইতে দেরি করিয়াছি জানিলে পিতা ক্রুদ্ধ হইবেন।

দণ্ড দুই পরে শুচিস্মিতার তন্দ্রা ভাঙিল। মৃদুস্বরে কহিলেন, হারীত!

সুশ্বেতা কহিল, দাদা সমিধ আনিতে গিয়াছে।

শুচিস্মিতা উঠিয়া বসিলেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, দুটি খাইয়াও যাইতে পারিল না!

সুশ্বেতা কহিল, তুমি ব্যস্ত হইও না মা, উত্তরীয়ে বাঁধিয়া দেড় কুড়ি কলা লইয়া গিয়াছে।

হারীতের মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, ক্ষুধার কথা বিস্মৃত হইয়া সে অন্যমনে আগাইয়া চলিল। কিন্তু কিছু দূর গিয়াই যে মনোহর দৃশ্য তাহার চক্ষে পড়িল, তাহাতে চমৎকৃত চিত্ত তাহার চকিতে চাঙ্গা হইয়া উঠিল।

গোদাবরীর একেবারে কিনারায় প্রকাণ্ড এক শুষ্ক দেবদারু বহুকাল যাবৎ খাড়া দাঁড়াইয়া ছিল। সেই গাছটা গোড়া হইতে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, এবং শুধু তাই নয়, পড়ার ধাক্কায় আপনা হইতেই টুকরা টুকরা হইয়া রহিয়াছে। কাটিবার পরিশ্রম তো বাঁচিয়াছেই, মাথায় করিয়া বহিয়াও এটাকে লইয়া যাইতে হইবে না—একটা ভাল দেখিয়া লতা যোগাড় করিয়া গাছটাকে নদীর জলে ভাসাইয়া একেবারে আশ্রমের ঘাটেই গিয়া তোলা যাইবে। তাহার উপর আবার আনন্দের ত্র্যহস্পর্শ—গোদাবরীতেও তখন ভাঁটা। এখন একবার কোনমতে কাঠকে জলে নামাইতে পারিলেই হইল। হারীত ভারি উৎফুল্ল মনে লতা কাটিতে চলিল।

শুভক্ষণ যখন আসে, চতুর্দিক হইতেই ঝাঁপিয়া আসে। লতার

সন্ধান করিতে হারীতকে বেশি বেগ পাইতে হইল না। নিকটেই একটা বড় পাকুড়গাছ কে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার পরিত্যক্ত ডালপালার মধ্যে একটা বৃহৎকায় শ্যাম-লতা জড়াইয়া রহিয়াছে। অতি অল্প আয়াসেই সেটাকে সাফ করিয়া লওয়া যাইবে।

হারীত কুঠারটাকে একটা গাছের গোড়ায় রাখিল, উত্তরীয় খুলিয়া পুঁটুলি করিয়া কুঠারের পাশে রাখিল, তারপর বল্কল মালকোঁচা মারিয়া পরিয়া লতা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিল।

হং হো!

হারীত মুখ ফিরাইয়া দেখিল, জটাজূটসমন্বিত এক ঋষি।

লতা-টানা থামাইয়া কহিল, আমাকে বলিতেছেন?

ঋষি কহিলেন, বালক, বর্ষীয়ানকে সম্মান করিতে হয়।

হারীতের মন আপাতত প্রসন্ন ছিল, আসিয়া ঋষিকে প্রণাম করিল।

ঋষি কহিলেন, কল্যাণ হউক। বৎস, তুমি কে? ইহাই বা কোন্ স্থান?

হারীত কহিল, দেব, আমি ঋষিবর শ্রীমহাতপার পুত্র, নাম হারীত। ইহা কাম্যক বন।

ঋষি কহিলেন, আমি ঋষি ক্রতু।

হারীত পুনর্বার প্রণাম করিল।

ক্রতু কহিলেন, দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিয়াছিলাম। এই অঞ্চল আমার অপরিচিত বলিয়া দিগ্‌ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি।

হারীত কহিল, দেব, অনতিদূরে আমাদের আশ্রম। যদি অনুগ্রহ করিয়া একবার পদার্পণ করেন, আশ্রম ধন্য হইবে, পিতাও অত্যন্ত খুশি হইবেন।

ক্রতু কহিলেন, তোমার শ্রদ্ধেয় জনে ভক্তি আমার স্মরণ থাকিবে।

কিন্তু ইদানীং আমার সময় অতি অল্প। আমি ঋষিশ্রেষ্ঠ দুর্বাসার আহ্বানে যাইতেছি, বিলম্ব হইলে ঋষি ক্রুদ্ধ হইবেন। না হইলে, এমনিই আমি ক্ষুৎপিপাসার্ত ও পরিশ্রান্ত, আতিথ্যগ্রহণের আমন্ত্রণ কদাচ উপেক্ষা করিতাম না, আমার সে স্বভাব নহে। তোমার উপরোধ রাখিতে পারিলাম না, সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

হারীত কহিল, তাহা বুঝিতেছি। কিন্তু আপনাকে ক্ষুৎপিপাসার্ত অবস্থায় চলিয়া যাইতে দিয়াছি শুনিলে পিতা নিরতিশয় দুঃখিত হইবেন।

ক্রতু কহিলেন, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও। এখন আশ্রমে গেলেই আটকা পড়িয়া যাইব, আমার পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে।

হারীত কহিল, তবে অন্তত এইখানেই যতটুকু সম্ভব ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া যাইতে হইবে। আমার উত্তরীয়ে আমাদের স্বীয় উদ্যানজাত সুপক্ক কদলী বাঁধা আছে।

ক্রতু শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করিয়া কহিলেন, তুমি তোমার পিতার পুত্রের যোগ্য কথাই কহিয়াছ। কিন্তু তুমি নিজে খাইবে বলিয়া কদলী লইয়া আসিয়াছ। বালকের মুখের গ্রাস খাওয়া বৃদ্ধের শোভা পায় না।

হারীত কহিল, আমি এখন বালক নহি, তরুণ। আপনি বৃদ্ধ ও পরিশ্রান্ত। বিশেষত আমার গৃহ নিকটে, তথায় আরও প্রচুর কদলী আছে। এবং সর্বোপরি আপনি অতিথি। যদি না খান, তবে আমি—

ক্রতু সহর্ষে কহিলেন, তুমি যখন একান্তই ছাড়িবে না, তখন আর কি করি! থাক্ থাক্, তোমার আর কষ্ট করিতে হইবে না, আমি নিজেই লইতেছি। তুমি তোমার কর্তব্য করিতে থাক।

হারীত কহিল, কিন্তু এখানে জলপাত্র নাই। আমি বরং গৃহ হইতে একটা—

ক্রতু কহিলেন, চিন্তা করিও না, আমি নদীতে নামিয়াই জল পান করিব। মুনি-ঋষির সর্বদা বিলাসিতা করিলে চলে না, বিশেষ বিদেশে। তুমি কিন্তু আমাকে পথটা বলিয়া দিবে।

হারীত আবার লতা ছাড়াইতে লাগিল। ঋষি পরিতৃপ্তিসহকারে সব কয়টি কদলী ভক্ষণ করিয়া জল পান করিলেন, তারপর একটি সুগম্ভীর ঢেঁকুর তুলিয়া কহিলেন, বড় আনন্দ পাইলাম। আশীর্বাদ করি, তোমার রাঙা খোকা হউক। এইবার তাহা হইলে পথটা আমাকে একটু দেখাইয়া দাও।

হারীত পথ দেখাইয়া দিল। ঋষি পুনর্বার আশীর্বচন উচ্চারণ করিয়া বনপথে অন্তর্হিত হইলেন।

আশ্রমে পৌঁছিতেই সুশ্বেতা ছুটিয়া আসিয়া কহিল, দাদা, এত দেরি করিয়া আসিলে কেন?

হারীত উত্তরীয়ে ঘাম মুছিয়া কহিল, দেরি কোথায় দেখিলি? অন্য দিন হইতে তো অনেক শীঘ্র ফিরিয়াছি। মা কেমন আছেন?

সুশ্বেতা কহিল, ভাল আছেন। কিন্তু তুমি আর দেরি করিও না, শীঘ্র খাইতে আইস। মা তোমার থালা কোলে করিয়া সেই কখন হইতে বসিয়া রহিয়াছেন। তুমি না খাইলে তিনি কিছু মুখে তুলিবেন না।

হারীত কহিল, আমি চট করিয়া গোদাবরীতে একটা ডুব দিয়া আসিতেছি। তুই আমার বল্কলটা আনিয়া দে। আর উত্তরীয়টা—আচ্ছা থাক্!—বলিয়া হারীত হঠাৎ একটুখানি হাসিল।

সুশ্বেতা কহিল, দাও উত্তরীয়। হাসিলে কেন?

হারীত কহিল, না, উত্তরীয়ে বাঁধিয়া কলা লইয়া গিয়াছিলাম, এটাও ধুইয়াই আনি।

সুশ্বেতা কহিল, কিন্তু হাসিলে কেন? কলা গলায় বাধিয়া গিয়াছিল বুঝি? না, খোসার উপরে চরণক্ষেপণ করিয়া—। বলিয়া সে দুই বাহু উর্ধ্বে প্রসারিত করিয়া, দেহ পশ্চাতে হেলাইয়া, কলার খোসায় অসতর্ক পদক্ষেপজনিত ভারকেন্দ্রের অসমতার অভিনয় করিল, উ?

হারীত কহিল, তাহা নয়। আজ একটা ভারি মজার কাণ্ড ঘটিল।

কি, বল না দাদা, লক্ষ্মীটি।

এখন নহে, পরে বলিব। আমার বল্কল আনিলি না?

শুচিস্মিতা কিন্তু কন্যার মুখে সকল কথা শুনিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। হারীতকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন, হ্যাঁ রে, সত্য?

হারীত কহিল, আমি রূঢ় কথা বলিতে পারি, বানানো কথা বলি না।

শুচিস্মিতা কহিলেন, কিন্তু এখন উপায়?

কিসের উপায়?

ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গেলি? কি ভূত তোর ঘাড়ে চাপিল, খামকা ত্রিসত্য করিয়া বসিলি, বিবাহ করিব না। এদিকে ঋষি গেলেন তোকে পুত্র-বর দিয়া। তারপর?

হারীত নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। শুচিস্মিতা কহিলেন, তোকে সত্য ভাঙিতেই বা বলি কেমন করিয়া, ওদিকে ঋষিবাক্যই বা রক্ষা হয় কি করিয়া! এ তো মহা সমস্যা বাধাইয়া বসিলি দেখিতেছি।

হারীত কহিল, তুমি কি করিতে বল?

শুচিস্মিতা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তারপর ব্যাকুলভাবে হারীতের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, লক্ষ্মী বাবা আমার, কথা শোন্। তুই বিবাহ কর্।

হারীত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

শুচিস্মিতা বলিতে লাগিলেন, সেদিন যাহা বলিয়াছিস বলিয়াছিস, আর কেহ সে কথা জানে না।

হারীত হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ছি মা, তুমি আমাকে সত্যভঙ্গ করিতে বল!

শুচিস্মিতা কহিলেন, তাহা ছাড়া যে আর উপায় নাই। আমি বলিতেছি, তুই বিবাহ কর্। আমার আদেশে যত দোষ তোর খণ্ডিয়া যাইবে। তবু যদি পাপ হয়, সে পাপ সমস্ত আমার।

হারীত ধীরস্বরে কহিল, তাহা হয় না।

শুচিস্মিতা কহিলেন, হইতেই হইবে। তুই আমার একমাত্র পুত্র, তুই বিবাহ না করিলে বংশ লোপ পাইবে। কিন্তু সে জন্যও তো আমি তোকে সত্যভঙ্গ করিতে বলি নাই! কিন্তু এখন, এই যে ঋষি তোকে পুত্র-বর দিয়া গেলেন, তোর পুত্র না হইলে তাঁহার সত্যভঙ্গ হইবে। তুই নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাকে সত্যভ্রষ্ট করিবি? এই তোর ধর্ম্মজ্ঞান?

হারীত গোঁজ হইয়া কহিল, আমি কি করিব?

বিবাহ কর্। আমি জানি, সত্যভঙ্গ করা পাপ। কিন্তু অপরকে সত্যভঙ্গ-পাপে নিমজ্জিত করা আরও বড় পাপ। বিশেষত ঋষি ক্রতুর মত লোককে এত বড় পাপের ভাগী যদি করিস, আমার অশান্তির আর সীমা থাকিবে না।

হারীত চটিয়া কহিল, তোমার ঋষি ক্রতুর মত লোকই বা এমন কাণ্ড করিলেন কোন্ বুদ্ধিতে, শুনি? নিজে না খাইয়া তাঁহাকে কলা খাওয়াইয়াছিলাম, খাইয়া চুপচাপ কাটিয়া পড়িলেই তো পারিতেন। আবার আদিখ্যেতা করিয়া 'রাঙা খোকা হোক' বলিয়া আশীর্বাদ করিতে তাঁহাকে কে বলিয়াছিল? না-হক এক বাক্য ঝাড়িয়া আচ্ছা ফ্যাসাদ

বাধাইয়া দিয়া গেলেন! আমি তাঁহার কাছে পুত্র-বরের জন্ত কাঁদিয়া পড়িয়াছিলাম কিনা! যত সব—

শুচিস্মিতা কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, হা ঈশ্বর! তোকে আমি আঁতুড়েই সৈন্ধবচূর্ণ খাওয়াইলাম না কেন! হতভাগ্য দুর্বিনীত ছেলে—যে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি সর্বলোকের নমস্ত, তাঁহাকে তুই এমন কথা বলিস!

হারীত কহিল, বলি। এতই যদি তিনি মহাপুরুষ, আমি যে সত্য করিয়াছিলাম, সেটা তিনি খেয়াল করেন নাই কেন? ত্রিকালজ্ঞ, না কচু।

ক্রোধে শুচিস্মিতার মুখ শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না, হস্ত প্রসারণ করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।

হারীত উঠি-উঠি করিতেছে, এমন সময় সুশ্বেতা আসিয়া পড়িল। সুশ্বেতা মেয়েটির বয়স কম, কিন্তু বুদ্ধি ছিল। ঘরের মধ্যে তাকাইয়াই সে মোটামুটি অবস্থা অনুমান করিয়া লইল; চকিতে বাহির হইয়া গিয়া একটু দূর হইতে হাঁকিয়া কহিল, মা, বাবা আসিতেছেন।

হারীত আর তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রস্থান করিল।

এত বড় একটা সমস্তা নিজের দায়িত্বে চাপা দিয়া রাখিতে শুচিস্মিতা ভরসা করিলেন না। স্বামীর মেজাজটা যখন বেশ একটু ভাল আছে, এমন সময় বুঝিয়া তাঁহার কাছে কথাটা পাড়িলেন।

মহাতপা ধীরপ্রজ্ঞ লোক। হারীত বিবাহ করিবে না শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। কহিলেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, বেশ, শুনিয়া রাখিলাম।

শুচিস্মিতা কহিলেন, শুধু আধখানা কথা শুনিয়া রাখিলেই কর্তব্য সমাপন হইল?

মহাতপা কহিলেন, আর কি করিব শুনি? নাচিব? না তাহাকে সত্যভঙ্গ করিতে বলিব?

শুচিস্মিতা রাগ করিয়া কহিলেন, আমি কি তাই বলিতেছি নাকি? আর বলিলেই যেন কত হইত—যে বাধ্য পুত্র তোমার! আমিই কি বলিতে কসুর করিয়াছি?

মহাতপা চক্ষু চাহিয়া কহিলেন, কি বলিয়াছ? সত্যভঙ্গ করিতে?

শুচিস্মিতা সহসা স্পষ্ট উত্তর দিতে পারিলেন না।

মহাতপা কহিলেন, খুব ভাল। ছেলে বিবাহ করিবে না বলিয়াছে—বলিয়াছে, বাস্। অমন অনেক ছেলেই বলে। চুপ করিয়া থাকিলেই হইল। আর যদি সে সত্যই বিবাহ করিতে না চায়, নাই করিল। তুমি কোন্ বুদ্ধিতে তাহাকে সত্যভঙ্গ করিতে অনুরোধ করিতে গেলে? বেশ করিয়াছে সে তোমার কথা রাখে নাই, আমার পুত্রের যোগ্য কাজই করিয়াছে। এখন আবার আমার কাছে সেই কথা লইয়া কাঁদুনি গাহিতে আসিয়াছ কোন্ লজ্জায়?

হ্যাঁ, আমার কথা কানে না তোলাটা যে তোমার পুত্রত্বেরই পরিচায়ক, সে কথা আর এত দিন পরে আমাকে নূতন করিয়া তোমায় বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু আমি মিথ্যা কাঁদুনি গাহিতেই তোমার কাছে আসি নাই, বিশ্বসংসারে লোকের আরও কাজ আছে। এদিকে যে জটিল সমস্যা পাকাইয়া উঠিয়াছে—

কি আবার জটিল সমস্যা ইহার মধ্যে আসিল? সে বিবাহ না করিলে বংশ লোপ হইবে—এ চিন্তা এখনই না করিলেও চলিবে। আর যদি বিবাহ না করিলে পরে সে ইন্দ্রিয়-দমন করিতে পারিবে কি না, ইহাই তোমার সমস্যা হয়—

শুচিস্মিতা ঝাঁজিয়া উঠিলেন, ষাট হইয়াছে তোমাকে বলিতে

আসিয়াছিলাম। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান যদি নাও থাকে, শালীনতা-জ্ঞানও কি একেবারেই থাকিতে নাই? কি সব যা তা কথা একজন মহিলার সম্মুখে এমন অনায়াসে উচ্চারণ করিতে তোমার বাধিতেছে না?

মহাতপা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কি হইল! কিসের সম্মুখে বলিলে?

মহিলা। বলি কথাটাও শোন নাই নাকি কোনদিন?

ও, হ্যাঁ। কিন্তু এখানে আছি তো আমি আর তুমি, মহিলা আবার আসিল কোথা হইতে?

আমার মাথা হইতে। বলি কথাটা শেষ পর্যন্ত শুনিবে, না, না?

আহা, আমি কি বলিয়াছি শুনিব না! একটু সুস্থ হইয়া বলিলেই তো হয়।

বলিতে দিলে তো বলিব।

বেশ, বল।

তখন শুচিস্মিতা ক্রতু-সংবাদ স্বামীর গোচর করিলেন।

তিনি ধৈর্য ধরিয়া শেষ পর্যন্ত শুনিয়া কহিলেন, তা ইহার মধ্যে তোমার জটিল সমস্যাটা উপজিল কোথায়?

সে জ্ঞান থাকিলে আর এমন দশা হইবে কেন! ছেলে বলিল বিবাহ করিব না; ঋষি দিলেন তাহাকে পুত্র-বর। বিবাহ না করিলে পুত্র হইবে কি করিয়া?

মহাতপা ইহাতেও বিচলিত হইলেন না। কহিলেন, এই কথা! তা তিনি যখন বর দিয়া গিয়াছেন, ফলিবার হয় তো এক দিক না এক দিক দিয়া ফলিয়া যাইবেই। তুমি লাফালাফি না করিলেও ফলিবে।

সেই ফলিবেটা কি উপায়ে, শুনি না।

উপায় তো কতই আছে। ধর, যদি সে বিবাহ না করে এবং তপস্যা আরম্ভ করে, দেবতারা হয়তো তাহার তপোভঙ্গ করিবার জন্য কোন অপ্সরাকে প্রেরণ করিবেন—

শুচিস্মিতা কানে আঙুল দিয়া কহিলেন, হইয়াছে, থাম। নিজের পুত্রের সম্বন্ধে এমন কথা উচ্চারণ করিতে মুখে একটু আটকাইল না। পুরুষমানুষের ধরনই এক অদ্ভুত।

মহাতপা কহিলেন, পুরুষমানুষের ধরন মেয়েমানুষের মত নয়, তাহার কি করা যাইবে! তোমার জটিল সমস্যা বাধিয়াছিল, তাহার একটা সমাধান বাতলাইয়া দিলাম, কোথায় সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবে, না আবার এক ফ্যাঁকড়া বাহির করিয়া বকাবকি শুরু করিয়া দিলে! তোমাকে দোষ দিই না, ওটা মেয়েমানুষের স্বভাব। কিন্তু কথাটা তোমার পছন্দ হইল না কেন, শুনি? পুরাণে ইতিহাসে—

জ্বালাইও না বলিতেছি। কেন পছন্দ হইল না, তাও আবার বলিয়া দিতে হইবে নাকি?

না বলিতে চাও, আমার গরজ নাই। এবারে সরিয়া পড়, আমার বিস্তর কাজ আছে। কোশলে অনাবৃষ্টি হইয়াছে, সেজন্য যজ্ঞের আয়োজন করিতে হইবে। দক্ষিণাপথে—

এমন না হইলে আর— নিজের ঘরবাড়ি রসাতলে যাক, ওদিকে তুমি দুই চক্ষু বুজিয়া ত্রিলোকের মঙ্গলচিন্তায় মত্ত থাক, তাহা হইলেই সব হইবে। ভাল লোক লইয়াই পড়িয়াছি যাহোক। সত্য বলিতেছি, তোমার ব্যবহারে এক এক সময় গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে।

মহাতপা চক্ষু মুদিয়া কহিলেন, অয়ি তন্বি, তোমার পদভরে ঘরবাড়ি রসাতলে যাইবে কি না, ঠিক বলিতে পারিলাম না, কিন্তু ওই কর্মটি করিতে যাইও না। দড়ি ছিঁড়িয়া যাইবে, মিথ্যা গলায় ব্যথার উদ্ভব

এবং মালিশার্থে ইঙ্গুদী তৈলের অপব্যয় হইবে। আমি এমনিই ব্যস্ত মানুষ, যন্ত্রণা আর বাড়াইও না।

শুচিস্মিতা এবারে উপায়ান্তর গ্রহণ করিলেন। অগত্যা মহাতপার গাম্ভীর্য টুটিল, কহিলেন, আহা, কর কি? ছিঃ, চক্ষু মুছিয়া ফেল। মেয়েটা হঠাৎ আসিয়া পড়িলে কি ভাবিবে?

শুচিস্মিতা কহিলেন, যাহা সত্য আমার কপাল, তাহার বেশি কিছু আর ভাবিবে না।

আঃ, তোমাদের দক্ষিণদেশী মেয়েদের দোষই ওই, ঠাট্টা বুঝিতে পার না। আচ্ছা, এবারে বল, কি বলিবে? অভয় দিলাম, আর গণ্ডগোল করিব না।

শুচিস্মিতা চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, কত বার তো বলিলাম। একটা বিহিত কর।

কি বিহিত করিব? আমি একটা বিবাহ করিলে তো আর ইহার সমাধান হইবে না। তাহাকে সত্যভঙ্গ করিতেও আমি বলিতে পারিব না।

কিন্তু তাহার পুত্র না হইলে যে ঋষি সত্যে পতিত হইবেন।

হওয়াই উচিত। পথে-ঘাটে অমন সস্তা বর ছড়াইলে সে বর বন্ধ্যাই হয়। আরে বাপু, কুড়িখানেক কলা খাওয়াইলেই যদি পুত্র-বর মিলিত, তবে আর লোকে কষ্ট করিয়া পুত্রেষ্টিও করিত না, অপুত্রকত্ব বলিয়াও কোন কথা জগতে থাকিত না। ওসব সস্তা বর ফলে না। আর যখন ফলে, আমি যে উপায় বলিলাম, ওই রকম বক্র গতিতেই ফলে কথাটা ভাবিয়াই বলিয়াছিলাম, চাপল্য আমি করি না।

ওসব আমি বুঝি না। ঋষি যখন বর দিয়াছেন, সে বর যাহাতে ফলে এবং শোভনভাবেই ফলে, তাহার ব্যবস্থা তোমাকে করিতে হইবে আমি নাতির মুখ দেখিব।

তাই বল, তোমার গরজ। কিন্তু নাতির মুখ দেখিবার উপায় তো আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। আচ্ছা, তোমার বুদ্ধিতে কি উপায় যোগাইল, সেইটাই বল শুনি?

শুচিস্মিতা পতির প্রতি চকিত বক্রদৃষ্টি হানিয়া কহিলেন, কে বলিল তোমাকে, আমি কোন উপায় স্থির করিয়াছি? আমি কিছু জানি-টানি না।

হুঁ হুঁ, মাঝে মাঝে বুঝি। কিছু একটা মতলব মাথায় না থাকিলে বৃথা এতক্ষণ বসিয়া কলরব করিবার পাত্রী তুমি নহ। কেন আর দর বাড়াইতেছ, নাও, বলিয়া ফেল।

বলিয়া লাভ কি? কথা রাখিবে না তো।

ভাল জ্বালা। আচ্ছা, যদি রাখা সম্ভব হয় তো রাখিব। কিন্তু বলিয়া রাখিতেছি, তাহাকে সত্যভঙ্গ করিতে বলিতে পারিব না।

আচ্ছা, আচ্ছা।

এইবারে শুচিস্মিতা আসল কথা পাড়িলেন। কহিলেন, যোগবলে পুত্র আনিয়া দাও।

মহাতপা অনেকক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে পত্নীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। শেষে কহিলেন, কি বলিলে?

ওই তো বলিলাম, যোগবলে—

হুঁ। এমন না হইলে আর স্ত্রীবুদ্ধি বলিয়াছে কেন!

কেন, স্ত্রীবুদ্ধির অপরাধটা কি হইল শুনি?

যোগবল তো যত্রতত্র ফলিয়া থাকে কিনা, ঝুড়ি ভরিয়া কুড়াইয়া আনিলেই হইল। যাও যাও, ছেলেমানুষি করিও না।

ছেলেমানুষি!

নয়তো কি? আজ তোমার নাতির মুখ দেখিবার শখ হইবে, কাল

তোমার নাতি জুজু দেখিবার বায়না ধরিবে, আর আমি বসিয়া বসিয়া যোগবল দিয়া খেলনা তৈরি করিব, কেমন ?

আ মরি মরি, কি মধুর উপমাই দিলেন! নাতি আর জুজু এক হইল ?

এক না হইলেও একই শ্রেণীর তো—অনাবশ্যক বস্তু। তাহার জন্য যোগবলের অপচয় করা চলে না।

বুদ্ধির দৌড় দেখিলে অঙ্গ জ্বলিয়া যায়। নাতির মুখ দেখাটা অনাবশ্যক বস্তু হইয়া গেল!

নিশ্চয়। পুৎনরকের দায় এড়াইয়াছি। নাতি আমার ঐহিক পারত্রিক কোনও কাজে আসিবে না। আসিবে যাহার, সে যদি পুত্রের প্রয়োজন আছে মনে করে, নিজেই ব্যবস্থা দেখিবে। আমার অত নষ্ট করিবার সময় নাই। তাহা ছাড়া যোগবল আমাদের গচ্ছিত ধন, বিশ্বের হিতার্থেই তাহার ব্যবহার। নিজের খেয়ালে তাহার অপচয় করার অধিকার আমাদের থাকে না।

শুচিস্মিতা আর একবার চক্ষে অঞ্চল দিতে যাইতেছেন, হেনকালে অন্তরীক্ষে ভীম গম্ভীর ধ্বনি শ্রুত হইল।

মহাতপা কহিলেন, গৃহচ্ছদের উপরে কোন্‌ উল্লুক আরোহণ করিয়াছে ?

শুনিলেন দৈববাণী হইল, হে ঋষি, শুচিস্মিতার বাক্য অবহেলা করিও না। যোগবলে তোমার পুত্রের সন্তান সৃষ্টি কর।

মহাতপা ঝাহু লোক। কহিলেন, কোন্‌ দেব আমাকে সম্বোধন করিলেন, আগে শুনি।

উত্তর হইল, আমি অশ্বিনীকুমার দস্র। শ্রবণ কর।

মহাতপা কহিলেন, আদেশ করুন।

বাণী কহিল, কলিযুগে মনুষ্যজাতি বিজ্ঞানবলে রসায়নাগারে কৃত্রিম মনুষ্য সৃষ্টির প্রয়াস পাইবে। তুমি যজ্ঞবলে আগে-ভাগেই মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া দাও, যেন উত্তরকালে ম্লেচ্ছ জাতি মনুষ্যসৃষ্টির সাধনায় প্রথম সাফল্যের গৌরব না করিতে পারে। হে মহাতপা, তুমি নিঃসংশয়চিত্তে যজ্ঞায়োজন কর। উনপঞ্চাশ পবন তোমার সহায় থাকিবেন, আমরা দুই ভ্রাতা তোমাকে জ্ঞান যোগাইব।

দৈববাণী ক্ষান্ত হইল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিস্তব্ধ গৃহ যেন থমথম করিতে লাগিল। অবশেষে মহাতপা কহিলেন, তবে আর কি, নিশ্চিন্ত হইলে?

শুচিস্মিতা মনে মনে কহিলেন, মরণ, দেবতারা কি নিভৃত গৃহেও আড়ি পাতিয়া থাকে নাকি!

মহাপতা কহিলেন, সে বরাহ কোথায়?

শুচিস্মিতা কহিলেন, আশ্রমেই আছে। ডাকিব?

ডাক। আয়োজন আমি করিতে পারি, সঙ্কল্প হোম আহুতি সমস্ত তাহাকেই করিতে হইবে। যজ্ঞোৎপন্ন পুত্র যজ্ঞকারীর নামেই পরিচিত হয়। যজ্ঞ কি এখনই করা তোমার মত?

শুচিস্মিতা তাড়াতাড়ি কহিলেন, হাঁ। ফাঁড়া যত শীঘ্র কাটিয়া যায়, ততই মঙ্গল। আমি তাহাকে ডাকিয়া দিতেছি।

শুচিস্মিতা উঠিয়া গেলেন।

অনতিবিলম্বে হারীত আসিয়া পিতার সম্মুখে দাঁড়াইল।

তিনি তাহাকে একবার আপাদমস্তক অবলোকন করিয়া কহিলেন, এ আবার কি জঞ্জাল বাধাইয়াছ?

হারীত নিঃশব্দে ঘামিতে লাগিল।

মহাতপা কহিলেন, পুত্রমুখ দেখিবার বড় বেশি শখ হইয়াছে, না? হতভাগা মর্কট!

হারীত করুণকণ্ঠে কহিল, আমি কি করিব? আমি তো বর চাহি নাই। ঋষি বলিলেন—

ঋষি বলিলেন। তুমি সর্দারি করিয়া তাঁহাকে কলা খাওয়াইতে গিয়াছিলে কেন, শুনি? জান এটা সত্যযুগ নয়, বিনা স্বার্থে কেহ কাহাকেও কিছু দেয় না। তুমি কলা খাওয়াইতেই তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, তুমি কিছু চাও। আর ও বয়সে সকলেই চায় পত্নী-বর, সেটাকে উচ্চারণ করে পুৎনরকের দোহাই দিয়া। তারপর যদিই তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি কেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জানাইলে না, তুমি দ্বিতীয় ভীষ্ম বনিয়া গিয়াছ?

হারীত আরও কাতরস্বরে কহিল, তিনি বলিয়াই চলিয়া গেলেন যে।

আবার তর্ক করে! চলিয়া গেলেন—ডাকিলে আর ফিরিতেন না, কেমন? তোমার ইচ্ছা থাকিলে ছুটিয়া গিয়াও তো তাঁহাকে ধরিতে পারিতে। আর এই মহান সত্যটা করিয়া বসিলে কি উপলক্ষ্যে?

হারীত নীরব।

মহাতপা কহিলেন, নাম চাও, নাম, না? ভীষ্ম চিরকুমার-ব্রত লইয়া ত্রিভুবনে নাম কিনিয়াছেন, কাজেই তোমারও একটা প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, এই তো? ভীষ্মের নাম শুধু এই প্রতিজ্ঞার জন্য নয়, অবিবাহিত অনেকেই থাকে। তোমার মত হতভাগারা মেয়ে জোটে না বলিয়াই থাকে, তাহাতে নাম হয় না। ভীষ্মের আরও অনেক গুণ আছে, যাহার জন্য তাঁহার নাম—সে তোমার আছে? আর দেখ, এই কথাটা কোন দিন ভুলিও না, যে প্রথম কোনও বড় কাজ করে, তাহারই নাম হয়। আর যে তাহাকে শুধু অহেতুক অনুকরণ করে, তাহাকে বলে মর্কট—তুমি যা। বুঝিয়াছ?

হারীত মাথা হেলাইয়া জানাইল, বুঝিয়াছে।

মহাতপা কহিলেন, তবু ভাল। যাও, কাল উপবাস ও সংযম করিবে, পরশ্ব যজ্ঞারম্ভ হইবে। আর কোন প্রয়োজন থাকে বলিতে পার, না থাকে—

হারীত কম্পিতপদে প্রস্থান করিল।

যজ্ঞস্থল। যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেওয়া হইয়াছে, এবারে প্রাণ-আবাহন হইতেছে। অদূরে বসিয়া শুচিস্মিতা অপলকনেত্রে দেখিতেছেন।

হারীত হোতার আসনে উপবিষ্ট। পার্শ্বে মহাতপা তন্ত্রধার। হারীতের সম্মুখে অর্ধনির্বাপিত হোমকুণ্ডের উপরে রক্ষিত মন্ত্রপূত বারি-পূর্ণ স্বর্ণকলস।

মহাতপার নির্দেশ অনুসারে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হারীত সেই কলসে শিশুর দেহসৃষ্টির উপকরণ-বস্তুচয় নিক্ষেপ করিতেছে। প্রতি অঙ্গের জন্য অনুরূপ দ্রব্যচয় একে একে কলসে নিক্ষিপ্ত হইল—অস্থির জন্য হস্তীদন্ত, দন্তের জন্য মুক্তা, মাংসের জন্য গৈরিক মৃত্তিকা, রক্তের জন্য দ্রাক্ষাসার, চর্মের জন্য ভূর্জপত্র, বর্ণের জন্য জারিত স্বর্ণ, বাহুর জন্য বংশকোরক, উরুর জন্য কদলীকাণ্ড, চক্ষের জন্য বেত্রফল, ওষ্ঠের জন্য লাক্ষারস, কেশের জন্য কৃষ্ণরেশম।

দশ মাস দশ দিন কলস মন্ত্ররুদ্ধ কক্ষে সংগুপ্ত রহিল। তারপর কক্ষের ভিতর হইতে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল।

মহাতপা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দ্বার উন্মোচন করিলেন, শুচিস্মিতা আস্তেব্যস্তে ছুটিয়া গিয়া শিশুকে কলস হইতে বাহির করিলেন।

শিশুকে কোলে লইয়া বাহিরে আসিতেই মহাতপা কহিলেন, এ কি, যজ্ঞের সঙ্কল্পানুরূপ তো হয় নাই!

শিশুর সর্বশরীর, মায় মাথার চুল পর্যন্ত ঘোর উজ্জ্বল রক্তবর্ণ।

মহাতপা কহিলেন, হতভাগাটা কতখানি লাক্ষারস ঢালিয়াছিল!

শুচিস্মিতা কহিলেন, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কোন কালেই হইবে না। ঋষির বর ছিল রাঙা খোকা হইবে, মনে আছে?—বলিয়া অজস্র চুম্বনে রাঙা খোকাকে রাঙাতর করিয়া তুলিলেন।

ইতিহাস

দাসী নিবেদন করিল, মহাদেবি, রাজকুমারী আজও উঠিয়া গেলেন। দুধ খাইলেন না।

রাজা কহিলেন, তাহাকে বল, আমি ডাকিতেছি।

দাসী চলিয়া গেল।

রাণী কহিলেন, ডাকিলে কেন? তাহাকে কিন্তু গালমন্দ করিতে পাইবে না।

রাজা কহিলেন, গালমন্দ কেন করিব! কেন সে দিন দিন আহার কমাইতেছে, মনে তাহার কি দুঃখ, সেই কথাটি জিজ্ঞাসা করিব।

রাজকুমারী প্রবেশ করিলেন। তপ্তকাঞ্চনতুল্য গাত্রবর্ণ, অনিন্দ্য মুখশ্রী ও দেহসৌষ্ঠব, যৌবনোন্মেষে সর্ব অঙ্গে রূপ ও স্বাস্থ্য যেন ধরিতেছে না। অলসমধুর স্বরে কহিলেন, পিতা, ডাকিয়াছ?

রাজা কহিলেন, হাঁ। তোমার সহিত একটু পরামর্শ আছে।

রাজকন্যা মাতার কণ্ঠে বাহু জড়াইয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। কহিলেন, কি পরামর্শ?

রাজা কহিলেন, বলিতেছি। তাহার পূর্বে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি দিন দিন আহারের পরিমাণ কমাইতেছ কেন?

রাজকন্যা কহিলেন, দাসীটা লাগাইয়াছে বুঝি? উহার মিথ্যা কথা। আমি সমানই আহার করিতেছি।

রাজা কহিলেন, সে যে বলিল, তুমি কয়দিন ধরিয়া দুধের বাটি স্পর্শও করিতেছ না?

রাজকন্যা কহিলেন, দুধ আমার ভাল লাগে না। দুধ খায় শিশুরা

রাজা কহিলেন, ও, এখন বুঝি বড় হইয়াছ! আচ্ছা, কিন্তু মাছ খাইতেছ না কেন?

রাজকন্যা কহিলেন, বা, মাছ খাই তো।

নামমাত্র স্পর্শ কর। বাটি যেমন ভরা, তেমনই থাকে। তোমার মাতা স্বয়ং ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

আমার ভাল লাগে না।

কিন্তু সেইটাই তো ভাল কথা নয়। এই উঠন্ত বয়স, এ সময়ে মানুষের ভোজনস্পৃহা বাড়ে। আর তুমি অনশনের কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ করিয়াছ।

অনশন কোথায় করিলাম, বা রে!

ও অর্ধাশন আর অনশন একই কথা।

আমার পেটে না ধরিলে কি করিয়া খাইব, তাই শুনি?

এতদিন তো পেটে ধরিত। এখন হঠাৎ ধরে না বলিলে বুঝিতে হয়, তোমার কোন অসুখ করিয়াছে। রাণি, রাজবৈদ্যকে সংবাদ দাও।

না না, বৈদ্যকে সংবাদ দিতে হইবে না। আমার অসুখ হয় নাই।

কি হইয়াছে তবে? বৈরাগ্য? সন্ন্যাসিনী হইবি?

বৈরাগ্য আমার কোথায় দেখিলে? এই তো সেদিনও কতগুলা নূতন বস্ত্র, নূতন অলঙ্কার কিনিলাম। বৈরাগ্য যাহার হয়, সে বুঝি হীরা-মুক্তার অলঙ্কার কেনে? প্রসাধন অঙ্গরাগ কেনে?

রাণী কহিলেন, বুঝিয়াছি। তা এত কষ্ট না করিয়া আমাকে বলিলেই পারিতিস। মহারাজ, স্বয়ংবরের আয়োজন করুন। কেমন রে, এই তো কথা?

ধ্যেৎ।

ধ্যেৎ কি রে ?

তাহা নয়।

রাজা কহিলেন, ইহাও না, উহাও না ; বৈরাগ্যও তোর হয় নাই, স্বয়ংবরও চাহিস না, কি তবে তোর হইয়াছে তাই বল্ দেখি, বুঝি। অভিমান করিয়াছিস ?

না। অভিমান আমি কখনও করি, দেখিয়াছ ?

অনশনও তো করিতিস না। তা বেশ, তোর কথাই মানিয়া লইলাম। এখন একটু খুলিয়া বল্, তোর কি হইয়াছে ?

কিচ্ছু হয় নাই, বলিব কি ?

কিচ্ছু হয় নাই তো আহার ছাড়িলি কেন ? যাহা তোর প্রয়োজন, যাহা তোর ইচ্ছা, চাহিবার আগেই তো পাস। তবে কেন কৃচ্ছ্র সাধন করিস ?

সে কি কিছু চাহিয়া ?

কেন, তাই বল্ না। আমাদের এ রকম করিয়া দগ্ধাইয়া তোর কোন লাভ আছে ? দাসীর মুখে শুনিয়া অবধি এই সপ্তাহের মধ্যে একটি দিনও স্বচ্ছন্দে আহার করিতে পারি নাই, শান্তিতে নিদ্রা যাই নাই। আমাদের একমাত্র সন্তান তুই। তুই যদি শখ করিয়া অনাহারে থাকিস, তবে কাহার জন্য আমার এই বিশাল সাম্রাজ্য, কিসের জন্য আমার এই বিপুল সম্পদ্ ?

রাণী কহিলেন, আমার মাথা খাস মা, বল্ তোর কি হইয়াছে।

রাজকন্যার চক্ষুর পাতা ভিজিয়া উঠিল। কহিলেন, বলিলাম তো কিছু হয় নাই। বিশ্বাস কর না কেন ?

কিছু হয় নাই তো খাস না কেন ?

রাজকন্যা বহুক্ষণ নীরব রহিলেন। তারপর কহিলেন, ব্রত।

ব্রত? রাণী বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, কিসের ব্রত?

ব্রতের কথা বুঝি বলিতে আছে? কি বোকা তুমি!

মধুর হাসিয়া রাজকন্যা মাতার স্কন্ধে মুখ লুকাইলেন।

রাণীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। ধীরে ধীরে তিনি কন্যার মস্তকে পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, ব্রতের কথা আমাকে বলিতে দোষ নাই। আমাকে বল্।

রাজকন্যা মুখ তুলিলেন। সকৌতুক ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন, কিন্তু বাবাকে তো বলিব না।

রাজা কহিলেন, তুই বল্, আমি উঠিয়া যাইতেছি।

রাণী কহিলেন, না না, তুমি থাক, আমরাই অন্য কক্ষে যাইতেছি।

রাজা মহা সন্ত্রস্ত হইয়া কহিলেন, উহুঁহুঁ, কর কি? তোমার যাওয়া কি সোজা কথা! আমিই যাই। তুমি যতক্ষণে কক্ষান্তরে যাইবে, আমি তাহার মধ্যে শত ক্রোশ পার হইতে পারিব।

রাণী সকোপ কটাক্ষ হানিয়া কহিলেন, খুঁড়িও না বলিতেছি। মোটা হইলেই পার, কেহ বারণ করিয়াছে?

রাজা কহিলেন, ওরে ব্বাবা।

রাণী কহিলেন, খাইয়া হজম করিতে পারিলেই মোটা হয়। চল্ রে, আমরা যাই।

রাজকন্যা মাতার হাত ধরিলেন। লীলাভরে টানিয়া কহিলেন, হেঁইও! তারপর সকৌতুকে হাসিয়া উঠিলেন। উপলচরণা ঝরনার নৃত্যচ্ছন্দের মত সেই চপল হাস্যধ্বনি কক্ষের মধ্যে বাজিয়া ফিরিতে লাগিল।

রাণী ও রাজকন্যা চলিয়া গেলেন। রাজা একাকী বসিয়া রহিলেন। গভীর দুশ্চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বিশাল

গৌড়, ধনে জনে মানে জ্ঞানে শিল্পে কলায় সমৃদ্ধ এই মহাসাম্রাজ্য, তিনি ইহার একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁহার একমাত্র সন্তান এই কন্যা, সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী। সে যদি অনাহারে দেহপাত করে, তবে কেন আর রাজ্য লইয়া তাঁহার এই বিড়ম্বনা, এই অহর্নিশি পণ্ডশ্রম?

অর্ধদণ্ড অতীত হইল। তারপর রাণী ও রাজকন্যা ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা কহিলেন, কি হইল?

রাণী কহিলেন, ভয়ের কারণ নাই, নিশ্চিন্ত হও।

রাজা কহিলেন, কি ব্যাপার, বল তো শুনি।

রাজকন্যা মাতার দিকে চাহিলেন, ওষ্ঠে তর্জনী স্থাপন করিয়া কহিলেন, মুম্।

রাণী হাসিয়া কহিলেন, তোমাকে বলিতে বারণ।

কন্যাকে কহিলেন, তোমার কোন ভয় নাই মা, তুমি যাও। আমি বলিব না। শুধু তোমার ব্রতকে সমর্থন করার জন্য যেটুকু বলা একান্ত আবশ্যক, সেইটুকু বলিব। কেমন তো?

রাজকন্যা কহিলেন, আচ্ছা।—বলিয়া চকিতচরণে চলিয়া গেলেন।

রাজা কহিলেন, রাণি!

রাণী কহিলেন, সব শুনিলাম।

রাজা রাণীর পার্শ্বে ঘেঁষিয়া বসিলেন। কহিলেন, শীঘ্র বল। ওর ক হইয়াছে?

রাণী কহিলেন, কিছুই হয় নাই। ব্রত।

কিসের ব্রত?

তাহা শুনিয়া তোমার কি হইবে? মোটের উপর জানিয়া রাখ,

আমাকে সকল কথা সে বলিয়াছে। সমস্ত শুনিয়া আমিও সম্মতি দিয়াছি।

রাজা সচকিত হইয়া কহিলেন, সম্মতি দিয়াছ!

রাণী ভ্রূ বাঁকাইয়া কহিলেন, কেন দিব না?

কিসের ব্রত কি বৃত্তান্ত কিছুই জানিলাম না, আর তুমি চট করিয়া তাহাতে সম্মতি দিয়া বসিলে?

তোমার জানিবার প্রয়োজন করে না। তুমি রাজা, রাজকার্য লইয়া থাক। মেয়েদের ব্রত-পার্বণের মধ্যে তুমি কথা বলিতে আস কেন?

কিন্তু এই ব্রতের যেটুকু দেখিলাম, তাহা তো শুধুই উপবাস।

অল্পাধিক উপবাস সকল ব্রতেরই অঙ্গ। ব্রত অর্থ কৃচ্ছ্রসাধন। ব্রত কি বিলাস-ভোজ?

না হইল। তবু সম্মতি দেওয়ার পূর্বে তোমার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল।

কি আবার ভাবিব?

অনেক কথা। তুমি রাণী। তোমাকে সমস্ত রাজ্যের দিকে চাহিয়া চিন্তা করিতে হয়। সাময়িক খেয়ালকেই সত্য মানিয়া যা-খুশি করিলে চলে না।

কিন্তু আমি যা-খুশি করি নাই।

করিয়াছ।

করিয়া থাকি তো করিয়াছি, বেশ করিয়াছি।

বেশ কর নাই। বৃথা উত্তেজিত হইও না, স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখ ব্রতচর্যা দরিদ্রের জন্য। আহারের অভাবে তাহাদের উপবাস করিতে হয়। ব্রতের নামে সেই উপবাস পালন করিয়া তাহারা লোকচক্ষে নিজের শালীনতা রক্ষা করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই উপবাসের দোহাই

দিয়া দেবতাকেও ঠকায়। আমার কন্যার কিসের অভাব যে, সে উপবাস করিবে?

যা মুখে আসে তাই বলিও না, ব্রতের অসম্মান হয়। দেবতার অমর্যাদা করিলে কোপে নিষ্কৃতি পাইবে না।

কন্যাই যদি গেল, তবে কার জন্য আর নিষ্কৃতি! উপবাসে কন্যার দেহ ক্ষীণ হইবে। স্বাস্থ্য ভগ্ন হইবে।

হউক। তবু তো আমার মত অহর্নিশি বাক্যযন্ত্রণা সহিতে হইবে না। মোটা হইয়াছি বলিয়া তোমার কাছে যে গঞ্জনা খাই, কন্যা যদি সেই দুর্ভাগ্য এড়াইতে পারে, তবেই আমি ধন্য মানিব। স্বাস্থ্য কি ধুইয়া খাইবে?

আমি তাহাকে এ ব্রত করিতে দিব না।

আমি দিব। ব্রতই নারীর প্রাণ। ব্রত যদি করিতে না দাও, আমি বিষ খাইয়া মরিব। নবীনা রূপসীকে ঘরে আনিয়া, তখন ব্রত পূজা মানিও না, যত খুশি স্বেচ্ছাচার করিও, আমি বারণ করিতে আসিব না।

রাজা হার মানিলেন।

কথাটা কিন্তু গোপন রহিল না। প্রথমে দাসীমহলে ছড়াইল। সেখান হইতে পাচিকামহলে। তারপর তাহাদের প্রণয়ীমহলে। সেখান হইতে আবার তাহাদের প্রণয়িনীমহলে। ইহার পরে আর কাহারও অজানা থাকিবার কথা নয়। রাজ্যের সর্বত্র অস্ফুট গুঞ্জন চলিতে লাগিল—রাজকন্যা উপবাস করিতেছেন।

প্রকৃত বৃত্তান্ত কেহই জানিত না। অতএব কাহিনী যত ছড়াইল

ততই তাহার উপর রঙ চড়িল। কেহ বলিল, ব্রত। কেহ বলিল, প্রত্যাদেশ। কেহ বলিল, প্রত্যাদেশ-টেশ কিছুই না, রাজা বকিয়াছিলেন সেই রাগে।

উপবাসের প্রকার সম্বন্ধেও নানাবিধ গল্প রটিতে লাগিল। কেহ বলে, রাজকন্যা আর সমস্তই খান, শুধু মাছ মাংস দুধ খান না। কেহ বলে, রাজকন্যা শুধুই ফলমূল খাইয়া আছেন। ভগবান তথাগত তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিয়াছেন, উনকোটি বৎসর এই ব্রত পালন করিতে পারিলে তাঁহার অক্ষয় নির্বাণ ঘটিবে। আবার কাহারও মুখে শোনা যায়, স্বপ্নটা ঠিকই, তবে স্বপ্ন দিয়াছেন বোধিসত্ত্ব নয়, স্বয়ং দেব নারায়ণ। রাজকন্যার আহার এক্ষণে সকালে তিনটি ও সন্ধ্যায় তিনটি করিয়া তুলসী-পত্র। এই পত্রের সংখ্যা ক্রমশ কমাইয়া দিনে একটিতে দাঁড় করাইতে পারিলেই তাঁহার মুক্তি—একেবারে সোজা বিষ্ণুলোকে চলিয়া যাইবেন।

রাজপ্রাসাদের নিভৃত অন্তঃপুরে রাজকন্যার বাস। তাঁহার রূপের খ্যাতি লোকের কানে পৌঁছায়, রূপের দ্যুতি লোকচক্ষের অগোচরেই থাকে। এখন সেই খ্যাতি শতগুণ হইয়া প্রচারিত হইতে লাগিল। তপস্যার আগুনে জ্বলিয়া রাজকন্যার রূপ নাকি এমনই প্রখর দ্যুতিমান হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার দিকে আর চাহিয়া দেখা যায় না। ধূমহীন বহ্নি শিখার মত তাঁহার উজ্জ্বল অপার্থিব মূর্তি, পদক্ষেপে শাল্মলী-তূলার লঘুতা, চক্ষে উদাস দৃষ্টি। সেই অপূর্ব লোকোত্তর দৃষ্টির এক কণা ঠিকরাইয়া আসিয়া তাহাদের উপরে পড়িতেছে কল্পনা করিয়া গৌড়-রাজ্যের ভাবুক যুবকবৃন্দ প্রত্যহ তিনবার করিয়া মূর্ছিত হইতে লাগিল।

পুরুষেরা ব্রতের আলোচনাই করিল, মেয়েরা করিল আচরণ। রাজকন্যা যাহা করেন, রাজ্যসুদ্ধ মেয়েরা তাহার অনুকরণ করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। ব্রতের প্রচলন বাড়িতে লাগিল। রাজকন্যার দেখাদেখি

তাহার সখীরা আরম্ভ করিয়াছিল; রাজকন্যার সংবাদ লইতে গিয়া পুরোহিতকন্যা এবং মন্ত্রীকন্যা ব্রত শিখিয়া আসিল। তাহাদের নিকটে ব্রত গ্রহণ করিল সেনাপতি পাত্র মিত্র অমাত্যদিগের কন্যা ও তরুণী বধূরা। তারপর আর নগরীর কুমারী ও বিবাহিতা কিশোরী তরুণী যুবতী কেহই বাদ রহিল না। ঘরে ঘরে ব্রত আরম্ভ হইয়া গেল। বাজারে দুধ আর বিকায় না, মাছ-মাংসের দোকানে ক্রেতা নাই। নদীর মাছ নদীতে পচিতে লাগিল, ক্ষেতের শস্য ক্ষেতেই রহিল, অভুক্ত খাদ্যের রাশি পচিয়া গন্ধে আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

বণিকেরা আসিয়া কহিল, মহারাজ, আমাদের ব্যবসায় বন্ধ হইয়া গেল, আমরা কি না খাইয়া মরিব? অনুমতি করুন, আমরা দেশান্তরে যাই।

ব্যাধ ধীবর গোপালকেরা কহিল, মহারাজের আশ্রয়ে বড় সুখে ছিলাম, বিধি বাদ সাধিলেন। মহারাজ, আদেশ হইলে দেশত্যাগ করি, স্ত্রীপুত্রের অন্নাভাবে মৃত্যু চাহিয়া দেখিতে পারিব না।

সেনাপতি কহিলেন, মহারাজ, গৌড়-রাজ্যের সম্মুখে ঘোর দুর্দিন। এখনও অবহিত হউন, নহিলে আর রক্ষা থাকিবে না। প্রকাশ্য রাজসভায় ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

মহামন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ, সমস্ত প্রজা-প্রধানগণকে লইয়া একত্রে আলোচনা-সভা বসিবে, এই মর্মে ঘোষণাপত্র আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। এখন রাজহস্তের স্বাক্ষর হইলেই হয়।

সভাপণ্ডিত কহিলেন, মহারাজ, আগামী শুক্লা ত্রয়োদশীর প্রভাতে ভাল দিন আছে, সভার উপযুক্ত সময়।

সভামূর্খ কহিল, মহারাজ, আমার হাসি পাইতেছে।

সভা।

সভায় তিলধারণের স্থান নাই, সুবিস্তীর্ণ সভা-কুট্টিম জনতার চাপে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। গৃহতলে, চত্বরে, বাতায়নের অলিন্দে, মানুষের আর অবধি নাই। রাজ্যের দূর অতিদূর জনপদ হইতে পর্যন্ত জনপ্রধানেরা গ্রামপ্রধানেরা আসিয়াছেন। নগরীর নিকর্মা ছেলের দল আসিয়া ভিড় করিয়াছে। নগরীর তরুণীরা প্রায় কেহই আসিতে বাকি নাই।

সভাস্থ জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া রাজা কহিলেন, প্রজামুখ্যগণ! সেনাপতি জানাইয়াছেন, গৌড়ের সম্মুখে ঘোর দুর্দিন আসন্ন, তিনি এই-রূপ ইঙ্গিত পাইয়াছেন। তাঁহার নির্দেশক্রমে এই সভার আয়োজন। সেনাপতি, আপনার বক্তব্য সভার সমক্ষে প্রকাশ করুন।

সেনাপতি কহিলেন, মহারাজ, সম্প্রতি গৌড়-নগরীতে এক অভিনব অনশনব্রতের প্রচলন হইয়াছে। নগরের তরুণীরা ক্রমশই উত্তরোত্তর আহার-বিমুখ হইয়া উঠিতেছে। নগরীতে যাহা আজ হইতেছে, বহিঃস্থ জনপদের তরুণীরা অচিরাৎ তাহার অনুকরণ করিবে। এই অনশনব্রত সমগ্র গৌড়-রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল বলিয়া। ইহার মধ্যে ঘোরতর বিপদের সম্ভাবনা আমি দেখিতে পাইতেছি; এই ব্রতোচ্ছ্বাসকে সময়ে বাধা না দিতে পারিলে সমগ্র গৌড়ের শান্তি, সমৃদ্ধি, এমন কি স্বাধীনতা পর্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে, এমন আশঙ্কা করিবার কারণ ঘটিয়াছে।

অপ্রত্যাশিত ঘোষণা। সভামণ্ডপ স্থির নিস্তব্ধ। অতগুলি লোক কেহ এতটুকু শব্দ করিতেছে না, হস্ত পদ পর্যন্ত নাড়িতেছে না, একাগ্র-চিত্ত হইয়া সেনাপতির উচ্চারিত এই ভীষণ বার্তা শুনিতেছে।

সেই মৃত্যু-হিম নীরবতাকে খণ্ডিত করিয়া সহসা উচ্চ হাস্যধ্বনি শ্রুত হইল। রাজা শব্দ লক্ষ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, কে হাসে?

মূর্খ কহিল, মহারাজ, প্রগল্‌ভতা মার্জনা করিবেন। আমার বড় হাসি পাইতেছে।

রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, হাসি পাইতেছে! কেন?

মূর্খ কহিল, সেনাপতির বুদ্ধি দেখিয়া, মহারাজ। মেয়েরা আহার কমাইতেছে, ইহা তো ভরসার কথা। সেনাপতি আর্তনাদ করিতেছেন কেন, আমি তো কিছু বুঝিলাম না।

বুঝাইয়া বল। তুমি কি বলিতে চাহ?

মহারাজ, কেহ যদি কম খাইয়া খুশি থাকে, তাহাতে খাদ্যের সাশ্রয় হয়। ইদানীং দেশে অল্পাহারের প্রথা চলিত হইয়াছে, ইহার ফলে রাজ্যের ইষ্টই হইবে, আমার মোটা বুদ্ধিতে এই তো বুঝি।

সেনাপতি কহিলেন, জান না শোন না, মূর্খের মত কথা বল কেন?

মূর্খ কহিল, আমি মূর্খ, সেটা তো জানা কথা। মূর্খ বলিয়াই রাজকোষ হইতে বৃত্তি পাই। কিন্তু মূর্খই হই আর যাই হই, এই নবাগত প্রথার মধ্যে আমি ইষ্ট বই অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

ইষ্টটা কি? ইহারা কম খাইলে তোমার ভাগে খাদ্য বেশি পড়িবে, এই তো?

ঠিক ধরিয়াছেন। একা আমার ভাগে নহে, সকলেরই।

কিরূপে?

বলিতেছি। গৌড়-রাজ্যে যত লোক আছে, তাহার কিঞ্চিদধিক অর্ধেক নারী। নারীরা সকলে যদি অর্ধাশন অভ্যাস করে, তবে প্রত্যহ সমগ্র রাজ্যে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হইত, তাহার একচতুর্থাংশ বাঁচিয়া যায়। জ্যোতির্বিদ মহাশয় বলিতে পারিবেন, এই কথা সত্য কি না।

জ্যোতির্বিদ কহিলেন, গণিতশাস্ত্র অনুসারে তাহাই হয় বটে।

মূর্খ কহিল, তবেই দেখুন, সেই উদ্বৃত্ত অন্ন যদি আমরা সঞ্চয় করিয়া রাখি, রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হইবে না, যুদ্ধের সময়ে খাদ্যের অভাব হইবে না। কিংবা যদি সেই উদ্বৃত্ত অন্নসামগ্রী আমরা দেশান্তরে বিক্রয় করি, তবে পরিবর্তে তাহাদের স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি হস্তগত করিয়া আমরা ধনী হইতে পারিব।

রাজস্ব-সচিব মৃদুস্বরে কহিলেন, সত্য কথা।

মূর্খ কহিল, আরও আছে মহারাজ। অধুনা গৌড়ের যুবকেরা অনেকে বিবাহপরাঙ্মুখ হইয়াছে। পত্নীকে কি খাওয়াইব—এই কথা বলিয়া তাহারা অবিবাহিত থাকিয়া যায়। ফলে বহু বিবাহযোগ্যা কুমারী বাধ্য হইয়া অনূঢ়া থাকিতেছে। রাজ্যে স্বাভাবিক গতিতে প্রজাবৃদ্ধি ঘটিতেছে না। পত্নীরা আহারবিমুখ হইবে ভরসা পাইলে যুবকেরা বিবাহ করিতে ভয় পাইবে না, যুবতীরা আর অনূঢ়া থাকিবে না, রাজ্যে প্রজাবল বৃদ্ধি পাইবে। তথাপি সেনাপতি বলিতেছেন, ইহাতে দেশের অনিষ্ট। আপনিই বিচার করুন মহারাজ, ইহাতে হাসি না পাইয়া পারে?

মহামন্ত্রী কহিলেন, তুমি কি যথার্থ বলিতেছ, না ইহা তোমার বক্রোক্তি?

মূর্খ কহিল, তবেই মুশকিলে পড়িলাম মহারাজ। আমি মূর্খ, ও সকল সূক্ষ্ম কথা আমার মস্তিষ্কে ঠিক প্রবেশ করে না।

সেনাপতি কহিলেন, মহারাজ, আমরা প্রলাপোক্তি শুনিবার জন্য সমবেত হই নাই। রসিকতা সময়বিশেষেই ভাল লাগে। এই সভা গুরুতর সমস্যার আলোচনা-ক্ষেত্র, লঘু রসিকতার স্থান নহে।

রাজা কহিলেন, আপনার বক্তব্য আমরা শুনিব। আপনি কোন্ বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন, প্রকাশ করিয়া বলুন।

সেনাপতি কহিলেন, মহারাজ, এইমাত্র সভাস্থলে যে অর্বাচীন উক্তি হইল, তাহার ফলে উপস্থিত জনগণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নহে। আমার মুখনিঃসৃত বাক্যে কেহ সংশয় প্রকাশ করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় আমি মহামান্য রাজবৈদ্য মহাশয়কে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিব। আশা করি, ইহাতে কাহারও আপত্তি হইবার কারণ নাই।

রাজা কহিলেন, না। আপনি স্বচ্ছন্দে রাজবৈদ্যকে আহ্বান করিতে পারেন।

বৃদ্ধ রাজবৈদ্য সিংহাসন-পাদস্থ পাদপীঠের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা কহিলেন, বৈদ্যরাজ, সমগ্র গৌড়-রাজ্যের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সেনাপতির কথার আপনি যথাযথ উত্তর দিবেন, এই আমার অনুরোধ।

রাজবৈদ্য কহিলেন, মহারাজ, আমি কখনই অযথার্থ কথা বলি না।

সেনাপতি কহিলেন, বৈদ্যরাজ, আমার প্রার্থনা, আমি আপনাকে এই সভাস্থলে সর্বজনসমক্ষে কয়েকটি প্রশ্ন করিব। আপনার মহাশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তাহার উত্তর দিলে আমি কৃতার্থ হইব।

রাজবৈদ্য কহিলেন, উত্তম, আপনি প্রশ্ন করুন।

সেনাপতি কহিলেন, আমার প্রথম প্রশ্ন, জীবদেহে খাদ্যের কার্য কি?

রাজবৈদ্য কহিলেন, খাদ্য দেহকে পোষণ করে, দেহের ক্ষয় পূরণ করিয়া তাহার জীবনশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে। শ্রীমৎ ভাবমিশ্র বলেন—

'সদ্রবং সকলং দেহং রসতীতি রসঃ স্মৃতঃ।'

খাদ্য জীর্ণ হইয়া তরল সার-পদার্থে পরিণত হয়, তাহার নাম রস।

'সম্যক্ পকস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতো রসঃ।'

এই রস শিরা ধমনী বহিয়া সর্বদেহে পরিব্যাপ্ত হয়, দেহকে সুস্থ রাখে।

'আকৃষ্য ধমনীর্গষ্বা ধাতূন্ সর্বানয়ং রসঃ।
পুষ্ণাতি তদস্য স্বীয়ৈর্ব্যাপ্নোতি চ তহুং গুণৈঃ॥'

এই রস অর্থাৎ ভুক্ত অন্ন হইতেই শরীরস্থ রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি গঠিত ও পুষ্ট হয়।

'রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥'

সেনাপতি কহিলেন, অনাহারের ফল কি?

রাজবৈদ্য কহিলেন, পুষ্টির অভাবে যাহা হয়। অনাহারে দেহ কৃশ হয়, রুক্ষ হয়, তাহার সর্ববিধ স্নিগ্ধতা ও শক্তি হ্রাস পায়। অধিকদিন অনাহারে থাকিলে ক্রমে রক্তাল্পতা, দৌর্বল্য, বিকলতা প্রভৃতি দেখা দেয়, এবং অবশেষে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে। সুশ্রুতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, রসক্ষয়ে হৃৎপীড়া-কম্প-শূন্যতাঃ তৃষ্ণা চ। আহারাভাব হইতেই রসাল্পতা ঘটে।

রসাল্পতা হইতে রক্তশূন্যতা—শোণিতক্ষয়ে ত্বক্‌পারুষ্যমম্লশীতপ্রার্থনা সিরাশৈথিল্যং চ। মাংসক্ষয়ে—

সেনাপতি কহিলেন, বুঝিলাম। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, দেহীর জীবনের কোন্ কোন্ সময়ে এবং অবস্থায় খাদ্যের প্রয়োজন অধিক?

রাজবৈদ্য কহিলেন, দেহস্থ ক্ষয়পূরণ ও দেহগঠনের কার্য সর্বদা ও সর্বত্র সমান গতিতে চলে না। যে যে সময়ে দেহগঠনের কার্য দ্রুত চলিয়া থাকে, স্বভাবতই সেই সেই সময়ে খাদ্যের প্রয়োজন অধিক অনুভূত হয়। বৃদ্ধ অপেক্ষা শিশু ও কিশোরবয়স্কের ভোজনস্পৃহা অধিক থাকে। রুগ্ন অপেক্ষা সুস্থ দেহে আহারের মাত্রা অধিক হয়। পুরুষ অপেক্ষা নারীর পক্ষে ভোজ্যবস্তুর, বিশেষত স্নেহপদার্থপ্রচুর ভোজ্যবস্তুর, প্রয়োজন অধিক। পুরুষের আহার শুধু তাহারই দেহধারণের জন্য।

নারীকে তাহার সন্তানের দেহগঠন ও খাদ্যসংস্থানের উপযোগী সবলও বীর্য দেহের অভ্যন্তরে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হয়।

'স্বদেহমাত্রপোষকমশ্নীয়াৎ পুরুষঃ সদা।
সন্ততিপুষ্টয়ে নার্যাং লক্ষ্যতে রসসঞ্চয়ঃ॥'

সেনাপতি কহিলেন, সাধু। আর একটিমাত্র প্রশ্ন আমি করিব। যদি কোন নারী যৌবনপ্রারম্ভে আপনাকে আহার-বঞ্চিত করিয়া রাখে?

রাজবৈদ্য কহিলেন, তাহার দেহ সম্যক পুষ্ট হইবে না। যৌবন সম্যকরূপে বিকাশলাভ করিবে না। দ্রুত স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া সেই নারী মাতৃত্বের অযোগ্যা হইয়া পড়িবে, এবং যদিও তাহার সন্তান জন্মে, সে সন্তান অপূর্ণদেহ, শীর্ণকায় ও ক্ষীণজীবী হইবে।

'যৌবনেহনশ্নবস্তী যা কার্শ্যং বার্ধক্যমাপ্নোতি।
কার্শ্যাজ্জায়তে বন্ধ্যত্বমবন্ধ্যায়াম্ ক্ষীণপ্রজা॥'

সেনাপতি কহিলেন, কৃতার্থ হইলাম। আপনাকে আর কষ্ট দিতে চাহি না। অনুগ্রহ করিয়া আসন গ্রহণ করুন।

রাজবৈদ্য আসন গ্রহণ করিলেন।

সেনাপতি কহিলেন, মহারাজ, মহাজ্ঞানী বৈদ্যরাজের অভিমত আপনারা শুনিলেন। ইহার পরে আমার আর অধিক কিছু বলার আবশ্যক করে না। বৈদ্যরাজ যাহা বলিলেন, তাহাতেই আমার বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুটরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথাপি যদি কেহ সম্যক না বুঝিয়া থাকেন, তাঁহার বোধার্থে আমি পুনর্বার এই কথার বিশদ উক্তি করিব।

গৌড়ের গৃহে গৃহে তরুণীরা আহার পরিত্যাগ করিয়াছে, করিতেছে। শুনিতে পাই, ইহা নাকি ব্রতবিশেষ। কি ব্রত, কি তাহার ফল, কিই বা তাহার প্রক্রিয়া, আমি জানি না। কে ইহার প্রচলন করিল তাহাও

আমার জ্ঞানাতীত। জনশ্রুতি, রাজ-অন্তঃপুর হইতেই নাকি ইহার উদ্ভব। কিন্তু সে আলোচনা একান্তই ব্যক্তিগত আলোচনা, তাহা লইয়া সময়ক্ষেপ আমি করিব না। ব্রতই হউক, আর যাহাই হউক, ইহার উৎপত্তি কোথায় সে বিচারে লাভ নাই। ইহার যে কুফল অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দিকেই আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বৈদ্যরাজ বলিলেন, বৃদ্ধ অপেক্ষা শিশু ও কিশোরের, পুরুষ অপেক্ষা নারীর আহারের প্রয়োজন অধিক। তিনি বলিয়াছেন, যৌবনপ্রারম্ভে নারী সন্তানের দেহগঠন ও খাদ্যসংস্থানের উপযোগী সম্বল দেহে সঞ্চয় করিয়া লয়। অতএব আহারের প্রয়োজন যদি মানুষের সত্যই থাকে, সে প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক হইবে কাহার বেলায়? কিশোরী ও তরুণী নারীর।

অথচ আশ্চর্যের কথা এই, গৌড়ে সেই তরুণীরাই আহার-বর্জনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। ইহার ফল কি হইবে, তাহা অনুমান করিতে কি আপনারা পারিতেছেন না?

বৃদ্ধারা এই উপবাসব্রত গ্রহণ করিলে আপত্তি করিতাম না। কিন্তু এই তরুণীরা শুধু আজিকার কন্যা ও প্রেয়সী নহে, উত্তরপুরুষের ভাবী জননীও ইহারাই। ক্ষণিক উত্তেজনায় ইহারা দেহ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে, দূর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া নিরস্ত হইবে, ততটুকু দায়িত্বজ্ঞান ও গাম্ভীর্য ইহাদের চপল স্বভাবে নাই। অনাহারে অর্ধাহারে বিশুষ্কযৌবনা এই তরুণীরা যাহাদের মাতা হইবে, সেই শীর্ণকায়, ভগ্নস্বাস্থ্য শিশুরাই হইবে গৌড়ের ভাবী প্রজা, ভাবী কর্মী, ভাবী সৈনিক। গৌড়ের প্রাচীন গৌরব তাহাদের হাতে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। গৌড়ের চতুর্দিকে প্রবল শত্রু। তাহাদের প্রতিহত করিতে, বিস্তীর্ণ গৌড়-সাম্রাজ্যের দূর-দূর-বিস্তৃত সীমান্তরেখা রক্ষা

করিতে যে দুর্ধর্ষ বাহুবলের প্রয়োজন, সেই শক্তি, সেই ধৈর্য কোথায় পাইবে তাহারা ?

মহারাজ, আমি জানি, আমার এই কথার প্রতিবাদ হইবে। আমি জানি, আমাদের মহামান্য বন্ধু মহামূর্খ মহাশয় এখনই বলিয়া উঠিবেন, কেন, তাহাদের নিজ হস্তেই অসি ধারণ করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে! তিনি হয়তো বলিবেন, নারীরা কম খাইবার ফলে যে অর্থ বাঁচিবে, তাহা দ্বারা শবরসেনা নিযুক্ত করা হউক, তাহারাই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবে। এরূপ প্রস্তাব শুনিতে মধুর, সন্দেহ নাই।

কিন্তু মহারাজ, আমি আজন্ম যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে। আমি জানি, আমি বলিতে পারি, সে কল্পনা মিথ্যা। বেতনভুক সেনা দিয়া যুদ্ধ হয় না। বেতনভুক শবরসেনা আর্যরাজের সহায় হইবে না। তাহার পঞ্জরে কণ্টকের মত তাহারা বিঁধিয়া থাকিবে, সুযোগ পাইলেই সেই রাজ্যকে বিধ্বস্ত, বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। বিজিত, পদানত জাতির লোককে বেতন দিয়া নিযুক্ত করাই যায়, কিন্তু জেতা প্রভুর সহিত একস্বার্থ হইয়া সে অকপটে যুদ্ধ করিবে, ইহা আশা করা শুধু মূর্খতা নহে, বাতুলতা।

মহারাজ, অমাত্যবর্গ, প্রধানগণ! আমার আর কিছু বলিবার নাই। লঘুচিত্ত বালিকারা খেলার ছলে সর্বনাশ আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আমি আকৃষ্ট করিয়া দিলাম। যদি সত্যই আপনারা গৌড়কে ভালবাসেন, যদি সত্যই চান পুণ্যস্মৃতি গোপালদেবের প্রতিষ্ঠিত এই সাম্রাজ্য এমনই অটুট গৌরবে জগতে বাঁচিয়া থাকুক, তবে এখনও অবহিত হউন, এখনও এই সর্বনাশী খেলার উচ্ছেদ করুন।

আর তাহা যদি না করিতে চান মহারাজ, আমাকে অবসর দিন।

এই লউন আমার রাজদত্ত অসি, এই লউন আমার পদলাঞ্ছন। স্বর্গীয় মহারাজ এই অসি ও এই লাঞ্ছনে আমাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। কৈলাসনাথ জানেন, আজীবন দেহের রক্ত, প্রাণের নিষ্ঠা ঢালিয়া গৌড়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি, কখনও তাহাকে এতটুকু মলিন হইতে দিই নাই। গৌড়ের সেই অম্লান গৌরবরবি মেঘাচ্ছন্ন হইতে চলিয়াছে, বৃদ্ধবয়সে আমি তাহা চাহিয়া দেখিতে পারিব না। আমাকে নিষ্কৃতি দিন মহারাজ, আমি কাশীবাসী হইব।

সেনাপতি ক্ষান্ত হইলেন। সিংহাসনপাদমূলে রক্ষিত তাঁহার সুউজ্জ্বল তরবারি, তাঁহার মণিখচিত পদলাঞ্ছন আলোকসম্পাতে ঝলসিতে লাগিল। সেই তরবারিতে কোনদিন একবিন্দু কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। সেই লাঞ্ছনে মহারাজ গোপালদেবের স্বহস্তে গঠিত গৌড়-সাম্রাজ্যের অমল যশঃদ্যুতি প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

সভা নীরব, নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নূপুর-নিক্বণ শ্রুত হইল। একটি তন্বী তরুণী লীলায়িত দেহচ্ছন্দে রূপের হিল্লোল ছড়াইয়া সিংহাসনসমীপে অগ্রসর হইল। মধুরস্বরে কহিল, মহারাজ, প্রিয়সখী সভার সমক্ষে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে চাহেন।

রাজা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় কহিলেন, রাজকন্যা? এই সভার মধ্যে? সে কি কথা!

সভায় মধ্যেও চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। মহামন্ত্রী কহিলেন, তাহাই ভাল মহারাজ, তাঁহাকে আসিবার অনুমতি দিন। খেলাই হউক আর ব্রতই হউক, ইহার আরম্ভ বস্তুত তিনিই করিয়াছেন। সেনাপতির বাক্যের মধ্যেও সেই ইঙ্গিত ছিল। সেনাপতি যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহার উত্তরে যদি রাজকুমারী কিছু বলিতে চাহেন, তাঁহাকে বলিতে না দেওয়া অন্যায় হইবে। আর যদি সেনাপতির কথাই সত্য হয়, তবে

রাজকুমারীর নিকটে ইহার উত্তর চাহিবার অধিকারও প্রজাদের আছে। সে উত্তর না পাইলে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে না।

রাজা কহিলেন, বেশ, রাজকুমারীকে আসিতে বল।

রাজকন্যা সভায় প্রবেশ করিলেন। উন্নত পাদপীঠের উপরে, সিংহাসনের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সভাস্থ সকল লোক নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিল।

অনশনে রাজকন্যার দেহ ক্ষীণ হইয়াছে। বসাবর্জিত মুখশ্রী ঈষৎ পাণ্ডুর, শীর্ণতর মুখের চারিপার্শ্বে স্ফীত কেশরাশিকে তুলনায় কৃষ্ণতর ও নিবিড়তর দেখাইতেছে, গণ্ডের মেদ কমিবার ফলে নয়নদ্বয় অধিকতর আয়ত ও নাসিকা তীক্ষ্ণতর মনে হইতেছে। এ যেন তপঃকৃশা পার্বতী কিংবা দুষ্মন্তধ্যানমগ্না শকুন্তলা, পৃথিবীতে থাকিয়াও সে রূপ এ জগতের নহে, ভূমিতে তাঁহার চরণপাত হয়, কিন্তু মৃত্তিকা তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

সমুন্নত গ্রীবা তুলিয়া রাজকন্যা সভার চতুর্দিকে একবার তাকাইলেন। স্নিগ্ধ আয়ত দুইটি চক্ষুর কোমল দৃষ্টি সভার সর্বত্র ঘুরিয়া আসিয়া সিংহাসনতলে ন্যস্ত হইল। মৃদুস্বরে রাজকন্যা কহিলেন, মহারাজ, সেনাপতি তাঁহার কল্পিত বিপদের জন্য প্রকারান্তরে আমাকে দায়ী করিয়াছেন। আমি তাঁহার সেই অভিযোগের উত্তর দিতে চাহি।

রাজা কহিলেন, দিতে পার। শুধু তাহাই নহে, সেনাপতির কথা যদি সত্য হয়, তবে উত্তর দিতে তুমি বাধ্যও।

রাজকন্যা সবিস্ময়ে কহিলেন, বাধ্য! আমি?

রাজা কহিলেন, হাঁ। মনে রাখিও, তুমি শুধু আমার কন্যা নহ, তুমি এই রাজ্যের রাজকন্যা, গৌড়-সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্রাজ্ঞী। তুমি যদি নিজের স্বাস্থ্যহানি কর, তুমি যদি আত্মহত্যা কর, তাহা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রদ্রোহ, কারণ তাহাতে সমগ্র গৌড়ের স্বার্থই আহত হয়। সেই আচরণের

সপক্ষে তোমার কি বলিবার আছে, তাহা গৌড়বাসী প্রজা শুনিতে চাহিবে।

রাজকন্যার মুখ রক্তাভ হইল। দন্তে অধর দংশন করিয়া তিনি কহিলেন, এতটা জানিতাম না। ইহা রাজত্ব, না দাসত্ব?

রাজা কহিলেন, রাজা সমগ্র রাজ্যের দাস মাত্র। রাজ্যের স্বার্থের বাহিরে তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

রাজকন্যার অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, কহিলেন, ধিক এই দাসত্বে। আমি এমন উত্তরাধিকার চাহি না।

মহামন্ত্রী কহিলেন, রাজকুমারি, চাহ বা না চাহ, তোমার ইচ্ছায় কিছু আসে যায় না। রাজকন্যা হইয়া জন্মিয়াছ, রাজকন্যার দায়িত্বকে তুমি অস্বীকার করিতে পার না।

রাজকন্যা কহিলেন, তাহার অর্থ? আমি চাই বা না চাই, এই রাজ্যের, রাজত্বের স্বর্ণশৃঙ্খলে আমাকে আবদ্ধ থাকিতে হইবে? আমার প্রতিটি আচরণ প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য রাজ্যের হীনতম দীনতম প্রজার নিকট আমাকে কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে?

মহামন্ত্রী গম্ভীরস্বরে কহিলেন, রাজকুমারি, চপলতা করিও না। প্রজা হীন নহে, প্রজা দীন নহে। প্রজার অনুগ্রহেই রাজার সম্পদ। সে কথা যাক, এক্ষণে উপস্থিত আমাদের যাহা আলোচ্য বিষয়, তাহার দিকে মনোযোগ দাও। সেনাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে তুমি কিছু বলিতে চাহ?

রাজকন্যা নয়নে অগ্নি ছড়াইয়া কহিলেন, না। মিথ্যা অভিযোগের কি উত্তর আমি দিব?

মিথ্যা? তুমি কি বলিতে চাহ, সেনাপতি যে আশঙ্কার কথা বলিলেন, বৈদ্যরাজ যে আশঙ্কার কথা বলিলেন, তাহা সত্য নয়?

তাহা আাম কি করিয়া জানিব! আমি সৈন্ত নই, সেনাপতিও নই।

তবে কোন্ যুক্তিতে তুমি বলিলে সেনাপতির অভিযোগ মিথ্যা? বৃদ্ধ সেনাপতিকে তুমি অসঙ্কোচে মিথ্যাবাদী বলিলে!

সেনাপতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, এই ব্রত রাজ-অন্তঃপুর হইতে রাজ্যে প্রচারিত হইয়াছে। রাজ-অন্তঃপুর অর্থ আমি, কারণ আমিই ইহা প্রথম গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু এই ব্রত আমি প্রচার করিয়াছি, এ কথা সত্য নহে। আমি নিজেই ইহার আচরণ করি, অন্ত কাহাকেও ইহার উপদেশ আমি দিই নাই।

তাহা হইলেও, তোমার দেখিয়া তাহারা শিখিয়াছে।

হইতে পারে। কিন্তু সেজন্যও কি আমি দায়ী হইব?

নিশ্চয়। বাক্যে হউক, আচরণে হউক, যাহাকে তুমি কোন পথের ইঙ্গিত দিলে, তাহার দায়িত্বও তোমারই। কিন্তু তোমাদের এই উপবাসের ব্যাপারটা কি? আমরা ইহা দেখিতেছি, ইহার অর্থ বুঝিতেছি না। ইহার প্রতিরোধও করিতে পারিতেছি না।

রাজকন্যা ঈষৎ হাসিলেন। কহিলেন, না পারিলে আমার কি দোষ! আপনার কন্যাও তো ইহার আচরণ করে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই পারেন।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফল হয় নাই। সে দেখিয়া অনুকরণ করিয়াছে। ইহার অর্থ বা তাৎপর্য সে জানে না। এক তুমিই জান।

আমি বলিব না। ইহা ব্রতবিশেষ। ব্রতের কথা প্রকাশ করিতে নাই।

এখন করিতে হইবে। সমস্ত গৌড় তাহাই চাহিতেছে।

চাহিতে থাকুক। আমি বলিব না।

কন্যা

রাজার কণ্ঠ সহসা ধ্বনিত হইয়া সভাস্থ জনগণকে সচকিত করিয়া দিল। সে কণ্ঠস্বর যেমন কঠোর, তেমনই গম্ভীর, বজ্রধ্বনির মত তাহার অন্তরালে সুকঠিন আঘাতের আসন্ন ইঙ্গিত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। র কহিলেন, কন্যা, অনেক প্রগল্‌ভতা করিয়াছ। অনেক সহ্য করিয়াছি আর করিব না। মহামন্ত্রী সমস্ত গৌড়ের নমস্ত ব্যক্তি, তোমার উপহাসে পাত্র নহেন। তিনি যাহা জিজ্ঞাসা করেন, ভদ্রভাষায় নম্রকণ্ঠে ত যথাযথ উত্তর দাও।

রাজকন্যা একমুহূর্ত নীরব রহিলেন। তাঁহার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল, দন্তে অধর চাপিয়া তিনি আত্মসংবরণ করিলেন। তারপর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ কষ্টে মুক্ত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, বলুন।

মহামন্ত্রী সদয়কণ্ঠে কহিলেন, বৎসে, ব্যস্ত হইও না, বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দাও। এই ব্রতের নাম কি? কি ইহার ফল?

রাজকন্যা ধীরস্বরে কহিলেন, ইহার নাম কৃশোদর ব্রত। এই ব্রত পালন করিলে দেহস্থিত মেদ ঝরিয়া যায়, কটিদেশ ক্ষীণ হয়।

সভাপণ্ডিত চক্ষু মুদিত করিয়া কহিলেন, মেদচ্ছেদকৃশো ভবত্যুত্থানযোগ্যং বপুঃ—

রাজকন্যা কহিলেন, ঠিক বলিয়াছেন। পুরুষের পক্ষে যেমন মৃগয়া, নারীর পক্ষে তেমনই এই কৃশোদর ব্রত। এই ব্রত পালন করিলে দে লঘু ও তনু শ্রীমণ্ডিত হয়। সেই নারী দয়িতের প্রিয়া হয়।

সভাকবি অস্ফুটস্বরে কহিলেন, আহা, তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী—

মূর্খ তেমনই অস্ফুটস্বরে কহিল, আরে, না না। বলুন, পর্ণবিম্বাধরোষ্ঠী। উপবাসের ঠেলায় পক্কবিম্ব কি আর আছে!

সভাকবি কহিলেন, তুমি চুপ কর।

মূর্খ চুপ করিল।

মহামন্ত্রী কহিলেন, এই ব্রতের পদ্ধতি কিরূপ? তোমরা উপবাসই কর দেখিতে পাই। পুরোহিতকে তো আহ্বান কর না?

রাজকন্যা কহিলেন, পুরোহিতের প্রয়োজন ইহাতে হয় না। ইহা শুধুই আচরণীয় ব্রত, অর্চনীয় নয়। এই ব্রতের পদ্ধতি আর কিছুই নহে, যথাসম্ভব মেদবৃদ্ধিকর আহার বিহার পরিহার করিয়া চলা। মৎস্য মাংস দুগ্ধ ডিম্ব প্রভৃতি বসাবহুল খাদ্য বর্জন করিতে হইবে। সুরা আসব প্রভৃতি পান করা নিষেধ। অতিমাত্রায় নিদ্রা, বিশেষত দিবানিদ্রা, বর্জনীয়। ভোজনকালে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে চলিবে না।

মহামন্ত্রী কহিলেন, সে কিরূপ?

রাজকন্যা কহিলেন, ক্ষুধার কয়েকটি বিশেষ স্তর আছে। ভোজনের পূর্বে, শূন্য উদরে একপ্রকার লঘু ক্ষুধার উদ্রেক হয়। সেই সময় কয়েক গ্রাস অন্ন পেটে পড়িলে ক্ষুধার দাহ তীব্র হইয়া উঠে। ইহার পর উদর পূর্ণ করিয়া ভোজনে হয় ক্ষুধার নিবৃত্তি। ভোজনে বসিয়া এই দ্বিতীয় স্তরের প্রারম্ভে, অর্থাৎ কয়েক গ্রাস অন্ন খাইবার ফলে যখন ক্ষুধা অত্যন্ত তীব্র হইয়া অনুভূত হইতেছে, ঠিক তখনই অন্ন ফেলিয়া উঠিয়া পড়িতে হইবে।

সেই তীব্র ক্ষুধাকে অতৃপ্ত রাখিয়া?

হাঁ, না হইলে আর কৃচ্ছ্রসাধন কিসের! ভয়ানক কঠিন কাজ কিছু নয়। প্রথম কয়েকটা দিনই একটু কষ্ট হয়। তারপর অভ্যাস হইয়া আসে। ক্ষুধা অসহ্য বোধ হইলে জল দ্বারা উদর পূরণ করিতে হইবে।

রাজবৈদ্য কহিলেন, হইল না, রাজকুমারি। অধিক জলেও শরীর স্থূল করে।

রাজকন্যা কহিলেন, জলের সহিত একটু লেবুর রস বা ফলশ্রুতক্ষার মিশাইয়া লইলে করে না।

মূর্খটা সহসা উচ্চহাস্য করিয়া লুটাইয়া পড়িল। চেঁচাইয়া কহিল, সাধু, রাজকুমারি, সাধু! এমন বুদ্ধি আমার বাবাও মাথা খেলাইয়া বাহির করিতে পারিত না।

রাজা কহিলেন, কি হইল তোমার? সংযত হইয়া কথা বল।

মূর্খ উঠিয়া বসিল। দুই বাহু প্রসারিত করিয়া কহিল, মহারাজ, সার্থক আপনার সন্তানভাগ্য। আপনি পুণ্যবান। কি অপরূপ কৌশলে রাজকুমারী ব্রতের কথা প্রচার করিলেন, দেখিলেন তো? রাজবুদ্ধি বটে!

সর্বনাশ! এ কথাটা তো কাহারও লক্ষ্য হয় নাই!

মূর্খ কহিল, মহারাজ, মূর্খবুদ্ধিতে যেটুকু বুঝিতেছি, ব্রতের প্রতিষ্ঠাকে আর ঠেকাইতে হইল না। গৌড়-নগরীর সমস্ত তরুণী ও কিশোরী আজিকার এই সভায় উপস্থিত আছে। তাহারা ব্রতের কথা যাও বা না জানিত, তাহা জানিয়া গেল। আর কাহাকে আপনি বাধা দিবেন?

রাজা গর্জন করিয়া কহিলেন, তুমি চুপ কর। সেনাপতি, আপনার অসি ও লাঞ্ছন উঠাইয়া লউন। আপনাকে পদত্যাগ করিতে হইবে না।

সেনাপতি নীরবে অভিবাদন করিলেন।

রাজা কহিলেন, গৌড়-সাম্রাজ্যে এই ব্রতের প্রচার ও অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইল। যে ইহার আচরণ করিবে, ভোজনান্তে যাহার পাত্রে একমুষ্টিও অন্ন পড়িয়া থাকিবে, রাজাদেশে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

রাজার কথা শেষ হইতে না হইতে সভার প্রান্তদেশ হইতে তীব্র নারীকণ্ঠের একটি চীৎকার শোনা গেল, ইস্‌!

তারপরই প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত কোলাহল। সভামণ্ডপের অর্ধেকেরও অধিক স্থান জুড়িয়া তরুণী নারীরা বসিয়া ছিল। তাহারা একযোগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে প্রলয়-কল্লোল আরম্ভ করিয়া দিল। কেহ হুলুধ্বনি করিতে লাগিল, কেহ শৃগালের ডাক ডাকিতে লাগিল, কেহ বিড়ালের ডাক ডাকিতে লাগিল। তারপর হুড়মুড় করিয়া তাহারা দ্বারের দিকে ছুটিল। সভাসদগণ যাহারা পারিল, দ্বারপথে বাতায়নপথে লাফাইয়া পলায়ন করিল। যাহারা পারিল না, তাহারা যথাসাধ্য আসন স্তম্ভ ইত্যাদির অন্তরালে আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিল। জাগ্রত নারীশক্তি যাইবার পথে ইহাদের পৃষ্ঠে মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত চপেটাঘাত করিয়া গেল, আসনগুলাকে সারিচ্যুত করিয়া ঠেলিয়া উল্টাইয়া আছড়াইয়া দিয়া গেল, প্রাচীরে প্রাচীরে বিলম্বিত চিত্রাবলী ও অংশু-কপট ছিঁড়িয়া ফালি ফালি করিয়া দিয়া গেল।

রাজা ভয়ে চক্ষু বুজিলেন। যখন চক্ষু মেলিলেন, তখন সভামণ্ডপ শূন্য, বিধ্বস্ত। প্রবল ঝটিকাবসানে বনপথের মত শুধু ভগ্ন ছিন্ন গৃহসজ্জায় কক্ষতল আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

রাজার পার্শ্বে কয়েকটি মাত্র লোক তখনও অপেক্ষা করিতেছেন—সেনাপতি, মহামন্ত্রী, রাজকন্যা ও মূর্খ।

সেনাপতি ললাটের ঘর্মধারা মুছিয়া কহিলেন, মহারাজ, আমারই ভুল হইয়াছিল। এই ব্যাঘ্রীরা বীরপ্রসবিনী না হইয়া যায় না।

রাজকন্যা অশ্রুসজলনয়নে কহিলেন, পিতা, আমাকে মার্জনা কর। আমি আর এমন কাজ করিব না।

মহামন্ত্রী কহিলেন, রাজকুমারি, আর একটি প্রশ্ন আমি তোমাকে করিব। তোমাকে এই ব্রতের কথা কে শিখাইয়াছে?

রাজকন্যা কহিলেন, এক নারী। বিদেশীয়া। কিন্তু অপূর্ব রূপসী।

রাজপুরীতে হস্তিদন্তের দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। বলিল, ব্রত্ করিলে তাহার মত উজ্জ্বল কান্তি পাইব।

মহামন্ত্রী সহসা উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, তাহার বাম চক্ষের নিম্নে একটি বড় তিল ছিল ?

রাজকন্যা কহিলেন, হাঁ।

মহামন্ত্রী কহিলেন, যা ভাবিয়াছি।

রাজা কহিলেন, কে সে ?

মহামন্ত্রী কহিলেন, চন্দ্রলেখা। মগধরাজের সর্বাপেক্ষা কুশলী গুপ্তচর।

উপরি-উক্ত ঘটনার পর পঁচিশটি বৎসর চলিয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধ রাজা বাঁচিয়া নাই। তাঁহার স্থান পূরণ করিয়াছেন রাজ-জামাতা। প্রাচীন অমাত্য সভাসদরাও প্রায় কেহই নাই। সেনাপতি মৃত, পাত্র মিত্র অমাত্যরা সকলেই মৃত। তাহাদের স্মৃতি বহন করিয়া বাঁচিয়া আছেন শুধু মহামন্ত্রী। স্থবির দেহকে কায়ক্লেশে টানিয়া এখনও তিনি যথাসাধ্য রাজ্যের মঙ্গলচিন্তা করেন। আর বাঁচিয়া আছে মূর্খ। তাহার বয়স হইয়াছে, কিন্তু বার্ধক্য আসে নাই; মস্তকের দুই-চারি গাছা কেশ পাকিয়াছে মাত্র। পূর্বের মতই সে প্রত্যহ সভার কোণে তাহার অভ্যস্ত স্থানটিতে বসে, উদ্ভট কার্যকলাপ ও বিকট মুখভঙ্গী করিয়া লোকের কৌতুক উৎপাদন করে, নবীন সেনাপতির বিশাল ভুঁড়িটিকে লইয়া রসিকতা করে, এবং কারণে অকারণে অকস্মাৎ অট্টহাস্য করিয়া সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে।

বৃদ্ধ রাজার রাজত্বের আরও একটি বস্তু বাঁচিয়া আছে, তাহা কৃশোদরী ব্রত। রাজা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন ইহার প্রচার রোধ করিতে

পারেন নাই। গৃহ হইতে গৃহে, নগর হইতে নগরে, জনপদ হইতে জনপদে, ভুক্তি হইতে ভুক্তিতে, দাবানলের মত এই ব্রত ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—কোন বাধা মানে নাই, কোন নিষেধকে গ্রাহ্য করে নাই, শাস্তি ভীতি প্রবোধ প্রলোভন পুরস্কার—কিছুতেই কিছু হয় নাই।

বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পরে রাজ-জামাতা রাজা হইয়াছেন। সিংহাসনে বসিয়াই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, প্রজার ধর্মকর্মে, ব্রতচর্যায় রাজা কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। নির্বিরোধ রাজনীতির মূলমন্ত্র তিনি বুঝেন। ব্রত যাহার করিবার সে করিবে, তাহার ফলাফল যাহা ভুগিবার সেই ভুগিবে। রাজা কেন মিথ্যা অশান্তি উৎপাদন করিয়া লোকের অপ্রিয় হইতে যান! সর্বোপরি রাজবয়স্য নবীন সভাকবি রাজাকে বুঝাইয়াছেন, এই ব্রতের আচরণই ধর্ম। নারীরা তন্বী হইবে ইহাই কবিপ্রসিদ্ধি, এবং নৃত্যাদি ললিতকলার দেশ বলিয়াই গৌড়ভূমির পরিচয়। উক্ত নৃত্যকলা ও ললিতকলা বৃষোচিত স্থূল দেহকে আশ্রয় করে না।

অতএব প্রজারা সুখে ধর্মচর্চা ও কলাচর্চা করিতেছে, রাজাও সুখে রাজত্ব করিতেছেন। রাজ্যের কোথাও অশান্তি নাই, বিক্ষোভ নাই। নারীদের আহার ব্যয়লেশহীন, এবং যুবকদের পরিচ্ছদে বস্ত্র কম লাগে, ইহাতেই সকলে আনন্দিত।

কিন্তু এই আনন্দ টিকিল না। অতর্কিতে একদিন গৌড়ের পশ্চিম সীমান্তে ঘোররবে তূরী ভেরী বাজিয়া উঠিল। শত্রুসৈন্য।

পঁচিশ বৎসর পূর্বে মগধ আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিল। গৌড়ের মেরুদণ্ড অনমনীয়, তাহাকে যে টানিয়া নোয়াইতে পারিবে, সেই বিষলতার বীজ ছড়াইয়া গিয়াছিল চন্দ্রলেখা। পঁচিশ বৎসর পরে মগধ-সেনা তাহার ফল চয়ন করিতে আসিয়াছে।

রাজা চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। কহিলেন, মহামন্ত্রী, এখন উপায় ?

মহামন্ত্রী কহিলেন, উপায় রণসজ্জা।

করণিককে কহিলেন, ঘোষণাপত্র প্রস্তুত কর। রাজ্যে পঞ্চদশ হইতে ত্রিংশবর্ষীয় যত পুরুষ আছে, সকলকেই সেনাদলে যোগ দিতে হইবে যে না আসিবে, তাহার শাস্তি মৃত্যু।

অচিরে সৈন্যবাহিনীর পদধ্বনিতে গৌড়রাজধানীর মাঠ পথ মুখরিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু রণসজ্জায় কেবলই বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। সেনানীরা জনে জনে আসিয়া জানাইলেন, মহা বিপদ।

সেনাপতি কহিলেন, কি ?

সেনানীরা কহিলেন, নূতন সৈনিকেরা ক্ষীণকায়, ক্ষুদ্রাকৃতি অস্ত্রাগারে যে সকল বর্ম শিরস্ত্রাণ ও যুদ্ধবেশ আছে, তাহা প্রাচীনকালের পদ্ধতি অনুযায়ী নির্মিত। ইহারা তাহা সামলাইয়া পরিতে পারে না গায়ে বড় হয়।

সেনাপতি কহিলেন, উহাই একটু কষ্ট করিয়া অভ্যাস করিয়া লইতে বল। এখন আর নূতন করিয়া বর্ম পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার সময় নাই।

সেনানীরা কহিলেন, আর সেই সকল গুরুভার অস্ত্র ও ঢাল লইয়া ইহারা নড়িতে পারিতেছে না।

সেনাপতি কহিলেন, অস্ত্র ভাঙিয়া লঘু করিয়া লও। অসির ফলা কাটিয়া ছোট কর। বর্শার হাতল অর্ধেক করিয়া দাও।

মূর্খ কহিল, বর্ম আর ঢালগুলা তো রাখিয়া গেলেও হয়। অমন সূক্ষ্ম তনু, দূর হইতে শত্রুরা ঠাহরই পাইবে না, শরসন্ধান আর করিবে কি করিয়া ?

সেনাপতি কহিলেন, তুমি চুপ কর। তোমাকে কথা বলিতে কে ডাকিয়াছে?

রাজার নিকট সেনাপতি নিবেদন করিলেন, মহারাজ, প্রচুরসংখ্যক অশ্বের ব্যবস্থা করুন। আমাদের সেনায় পদাতিকবাহিনী থাকিবে না। সমস্তই অশ্বারোহী।

রাজা কহিলেন, কিন্তু পদাতিক মোটেই না থাকিলে চলিবে কেন?

সেনাপতি কহিলেন, পদাতিক সেনা স্বভাবত মন্দগতি। শত্রুসৈন্য সীমান্ত পার হইয়াছে, অধিকদূর প্রবিষ্ট হইবার পূর্বেই তাহাদিগকে বাধা দিতে হইবে। সেনা অশ্বারোহী হইলে দ্রুত অগ্রসর হইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারিব। পদাতিক সেনা লইলে বিলম্ব ঘটিবে।

মূর্খ কহিল, ওসব কিছুই না মহারাজ, অভয় পাইলে আসল কথাটা বলি।

রাজা কহিলেন, কি?

মূর্খ কহিল, নবীন সেনারা ক্ষীণকায়। গুরুভার বর্ম ও অস্ত্র বহিয়া নড়িতে-চড়িতেই পারিতেছে না। ঘোড়ায় চড়িলে সেই বোঝাটা ঘোড়ার পিঠে চাপে, তাহাদের আর বহিয়া মরিতে হয় না। কথাটা এই।

সেনাপতি কহিলেন, তুমি চুপ কর।

মূর্খ চুপ করিল।

রাজা কহিলেন, ঘোড়া কেনা হউক। অর্থ রাজকোষ হইতে দেওয়া হইবে।

সীমান্ত পার হইয়া আম্রবনের মধ্যে শত্রুসেনা বিশ্রাম করিতেছিল। আম্রবনের সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া সেই প্রান্তরে আসিয়া গৌড়সেনা শিবির স্থাপন করিল। প্রত্যূষে যুদ্ধ।

মাগধ সেনাও বসিয়া নাই। তাহাদেরও শিবিরে রণসজ্জা চলিতেছে। আম্রবনের মধ্যে থাকিয়া তীর বর্ষণ করা চলে, হাতাহাতি যুদ্ধের পক্ষে উন্মুক্ত স্থানই প্রশস্ত। মাগধ সেনা স্থির করিয়াছে, প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বন হইতে বাহির হইয়া আক্রমণ করিবে।

উষার প্রথম আলোকপাতের সঙ্গে সঙ্গে মাগধ সেনা বন ছাড়িয়া বাহির হইল। বন হইতে অর্ধক্রোশ দূরে গৌড়সেনা অপেক্ষা করিতেছে। সেই দিকে মাগধ সেনা অগ্রসর হইল।

গৌড়সেনা একটু পশ্চাতে হটিয়া আসিল। মাগধ সেনাকে বন হইতে যতটা দূরে টানিয়া আনা যায়, ততই ভাল। দূরে আসিলে আর আক্রমণের মুখে তাহারা যাইয়া বনের আশ্রয় লইতে পারিবে না, বনের অন্তরালে লুকাইয়া তীর নিক্ষেপ করিতে পারিবে না।

গৌড়সেনার পশ্চাতে, নদীর অপর তীরে, উচ্চ দেউলের চূড়ায় আসন রচিত হইয়াছে। সেইখানে বসিয়া রাজা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্র দেখিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আছেন বৃদ্ধ মহামন্ত্রী ও মূর্খ, আর আছেন রাজগুরু। গৌড়ের কল্যাণ কামনা করিয়া তিনি তিন দিন তিন রাত্রি একাসনে বসিয়া স্বস্ত্যয়ন করিয়াছেন। অদ্যই শেষরাত্রে স্বস্ত্যয়ন সমাপ্ত হইয়াছে।

গৌড়সেনা একটু থামে, মাগধ সেনা অগ্রসর হইলেই আবার একটু পিছাইয়া আসে। এইরূপে গৌড়সেনা মাগধ সেনাকে টানিয়া বন হইতে বহু দূরে লইয়া আসিল। তারপর যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

মাগধ সেনা তখনও অগ্রসর হইতেছে। দুই দলের মধ্যবর্তী ব্যবধান ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ক্রমে দুই দলে তীর নিক্ষেপ আরম্ভ হইল। তারপর দুই সেনা আরও নিকটবর্তী হইল। দূরে থাকিয়া তীরনিক্ষেপ

মাগধের আগ্রহ নাই। তাহারা হাতাহাতি যুদ্ধ করিয়া গৌড়সেনাকে বিধ্বস্ত করিতে চাহে। গৌড়ীয় ধানুকির লক্ষ্য অব্যর্থ। শরযুদ্ধে তাহারা অপরাজেয়। মাগধ বীরেরা শারীরিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ, সম্মুখযুদ্ধে ক্ষীণদেহ দুর্বল গৌড়বীরেরা তাহাদের আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না।

মাগধ সেনা আরও অগ্রসর হইল। আরও। আরও। গৌড়সেনা তখনও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া।

আরও কাছে। আরও। আরও।

রাজার হাতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র, কাঁপিতেছে। যন্ত্র চক্ষে লাগাইয়া তিনি কহিলেন, আমাদের সেনা উহাদের আক্রমণ করিতেছে না কেন?

মহামন্ত্রী কহিলেন, সময় হইলেই করিবে।

আরও কাছে। আরও। আরও।

রাজা কহিলেন, কি হইবে কে জানে!

রাজগুরু কহিলেন, বৎস, বিচলিত হইও না। আমার স্বস্ত্যয়নের উপর আস্থা রাখ।

রাজা সহসা কহিলেন, এ কি!

মহামন্ত্রী কহিলেন, কি?

রাজা তাঁহার হাতে দূরবীক্ষণ দিয়া কহিলেন, দেখুন।

মহামন্ত্রী যন্ত্র তুলিয়া চক্ষে লাগাইলেন। ক্ষীণ দৃষ্টি, বেশি কিছু দেখিতে পাইলেন না। কহিলেন, ভাল ঠাহর পাই না। মাগধ সেনা যেন থামিয়া দাঁড়াইয়াছে মনে হইল। না?

রাজা কহিলেন, হাঁ। কিন্তু আক্রমণ করিতে আসিয়া এমন অকস্মাৎ থামিয়া দাঁড়াইল কেন?

মহামন্ত্রী রাজার হাতে যন্ত্র ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, তুমি দেখ। উহাদের মধ্যে যেন চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে মনে হয়।

রাজা দেখিলেন। তাঁহার মুখে বিস্ময়রেখা ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, হাঁ। উহাদের কি হইয়াছে ?

মহামন্ত্রী কহিলেন, কি দেখিতেছ ?

রাজা যন্ত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কহিলেন, মাগধ সেনা চঞ্চল। অগ্রসর হইতেছে না। পরস্পরে কি বলাবলি করিতেছে।

মহামন্ত্রী কহিলেন, বল, বল।

রাজা বলিতে লাগিলেন, মাগধ সৈনিকদিগকে দেখিয়া অসুস্থ বলিয়া মনে হয়।...অসুস্থতা ক্রমেই বাড়িতেছে। দুই হস্তে পার্শ্বদেশ চাপিয়া ধরিয়া উহারা একবার এ পার্শ্বে একবার ও পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িতেছে। চেষ্টা করিয়াও যেন খাড়া থাকিতে পারিতেছে না।...অশ্বপৃষ্ঠে একজন, সেনাপতি হইবে, উত্তেজিতভাবে উহাদিগকে কি বলিতেছে। সম্ভবত তিরস্কার করিয়া সংযত হইতে আদেশ করিতেছে। কিন্তু ফল কিছুই হইতেছে না।...মাগধ সেনা বিশৃঙ্খল। উহাদের দন্তপংক্তি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষু বিস্ফারিত। মনে হয় শ্বাস লইতে পারিতেছে না।...ওই, ওই কয়েকজন মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। ওই আরও কয়েকজন। আরও। মাটিতে গড়াইতেছে আর হাত পা ছুঁড়িতেছে।

মহামন্ত্রী কহিলেন, বুঝিয়াছি। বিরোধক কৃতকার্য হইয়াছে।

রাজা কহিলেন, কি ?

মহামন্ত্রী কহিলেন, তাহাকে ভার দিয়াছিলাম, ছদ্মবেশ ধরিয়া মাগধ সেনার সহিত মিলিত হইবে, কৌশলে তাহাদের পানীয় জলে বিষ মিশাইয়া দিবে। আর ভয় নাই মহারাজ। এইবার আমাদের সেনা আক্রমণ করিলেই হয়। তাহারা কি করিতেছে ?

তেমনই স্থির দাঁড়াইয়া আছে। এখনও আক্রমণ করিতেছে না কেন ?

এইবার করিবে। বিষের তেজ আরও একটু ধরুক।

রাজগুরু কহিলেন, বিষ কিসের, উহা স্বস্ত্যয়নের ক্রিয়া। মারণযজ্ঞ করিয়াছিলাম না? উহাদের উদরে শূলব্যথা ধরিয়াছে। কি বল হে!—বলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া মূর্খের স্কন্ধদেশ চাপড়াইয়া দিলেন।

মূর্খ এতক্ষণ আসনের প্রান্তে ঝুঁকিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। তাহার চক্ষে পলক নাই, নিশ্বাস স্তব্ধপ্রায়, একাগ্র অভিনিবেশে তাহার সমস্তখানি চৈতন্য চোখে মুখে আসিয়া একত্রিত হইয়াছে, মুখের, নাসিকার, ললাটের প্রতিটি রেখা তীক্ষ্ণ, ঋজু হইয়া উঠিয়াছে। রাজগুরুর চপেটাঘাত তাহার চেতনাকে স্পর্শও করিল না। যন্ত্রচালিতের মত সে না চাহিয়াই হাত বাড়াইয়া রাজার হাত হইতে দূরবীক্ষণটা টানিয়া লইল, একবার সেটাকে তুলিয়া চক্ষে লাগাইল, তারপর আবার সেটা রাজার হাতে ফিরাইয়া দিয়া তেমনই চাহিয়া রহিল।

রাজা যন্ত্রটি চক্ষে লাগাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বন্দী! বন্দী! মহামন্ত্রী, উহারা বন্দী হইয়াছে! জয় জয় গৌড়সেনার জয়!

রাজগুরু উল্লাসে লম্ফ দিয়া কহিলেন, স্বস্ত্যয়ন! আমার স্বস্ত্যয়ন!

মূর্খের এতক্ষণে যেন সংজ্ঞা ফিরিল। ধীরে মুখ ফিরাইয়া সে রাজার দিকে চাহিল। ম্লান হাসিয়া কহিল, স্বস্ত্যয়ন নহে মহারাজ, হাসি। উহারা হাসিতেছে। হাসিতে হাসিতে বলহীন হইয়া পড়িয়াছে।

রাজা সবিস্ময়ে কহিলেন, হাসিতেছে! কেন?

মূর্খ কহিল, গৌড়ীয় বীরদের চেহারা দেখিয়া।

রাজগুরু কহিলেন, তুমি চুপ কর।

গৌড়-সাম্রাজ্য জুড়িয়া মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছে। মাগধ সেনা গৌড় আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা অস্ত্রশস্ত্র রণসম্ভার সহ

আত্মসমর্পণ করিয়াছে। মাগধগণ শারীরিক বলে শ্রেষ্ঠ, অতএব এখ
হইতে ইহারাই গৌড়ের সৈনিক, প্রহরী, দ্বারবান, পরিচালক ও '
হইবে। মাগধ বন্দীগণ সাগ্রহে সম্মত হইয়াছে। ইহার পর
উৎসব হইবে না কেন?

রাজধানীতে আজ বিশেষ আনন্দসজ্জা। গৃহে গৃহে মঙ্গলকেতঃ
বিপণিতে বিপণিতে আলোকমালা, পথে পথে সুরার দানছত্র, নৎ
নূপুরশিঞ্জন।

রাজসভায় অমাত্য ও প্রধানবর্গ একত্রিত হইয়াছেন, সেনানীগণে
পুরস্কৃত করা হইতেছে, চারণেরা নবরচিত মগধজয়-কাহিনী গাহিতেছে
তাহারা গাহিতেছে—

আনন্দ কর, উৎসব কর,
আমাদের জয় হইয়াছে।
আলোকধারায় নগরীকে প্লাবিত কর,
গৃহে গৃহে সুরার স্রোত প্রবাহিত কর,
আমাদের জয় হইয়াছে।
দূর প্রান্তর পার হইয়া তাহারা আসিয়াছিল,
আমাদের শান্তিকে তাহারা বিধ্বস্ত করিতে আসিয়াছিল,—
তাহারা পরাজিত হইয়াছে।
অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বীরমদে তাহারা আসিয়াছিল,
তাহাদের পদভরে মেদিনী কম্পিতা হইয়াছিল,—
তাহারা পরাজিত হইয়াছে।
আমাদের সেনার সম্মুখে তাহারা আসিয়া দাঁড়াইল,
আমাদের সেনার দিকে একবারমাত্র দৃষ্টিপাত করিল,—
তাহারা বিহ্বল হইয়া গেল।

তাহাদের হাতের অস্ত্র স্খলিত হইয়া পড়িল,
তাহাদের মস্তকের উষ্ণীষ স্খলিত হইয়া পড়িল,
তাহারা হারিয়া গেল।
জয় করিতে আসিয়াছিল, তাহারা বিনাযুদ্ধে পরাজিত হইল,
আমাদের সেনার দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিতেই পারিল না,
তাহারা আত্মসমর্পণ করিল।
আনন্দ কর, উৎসব কর,
আমাদের জয় হইয়াছে।

নগরীর পথে পথে কাদম্বপানোন্মত্ত যুবার দল নৃত্যসহকারে গাহিয়া বেড়াইতেছে—

জয় হউক, জয় হউক, গৌড়ের জয়, জয়।
গৌড়ের প্রাচীন বীরত্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে,
জয়, গৌড়ের জয়, জয়।
আমাদের মাতারা কৌমার্যে ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন,
আমাদের ভগিনীরা বধূরা ব্রত আচরণ করিতেছেন,—
জয়, জয়, আমাদের জয়।
সেই ব্রতের বলে আমরা দুর্ধর্ষ হইয়াছি,
অজেয় হইয়াছি,
ভীমকান্তি হইয়াছি।
জয়, জয়, আমাদের জয়।
আমাদের আকৃতি দেখিবামাত্র শত্রুসেনা
বিহ্বল হইয়া পড়ে,
অভিভূত হইয়া পড়ে,

মূছিত হইয়া পড়ে,—

জয় জয়, ব্রতের জয়।

কৃশোদর ব্রত আমাদিগকে অজেয় করিয়াছে,

জয়, কৃশোদর ব্রতের জয়, জয়॥

চতুর্দিকে আনন্দ কোলাহল, হাসি উল্লাস। শুধু একজন আজ হসিতেছে না। সে মূর্খ। রাজসভার এক কোণে ম্লানমুখে মূর্খ বসিয়া কি ভাবিতেছে!

রাজা কহিলেন, মূর্খ, তোমার কি হইল? আজ এই আনন্দের দিনে তোমার হাসি একটু শুনাও, দুটা রসিকতা কর।

মূর্খ উঠিয়া দাঁড়াইল। করজোড়ে কহিল, আজ আর দন্তবিকাশ করিতে পারিব না, মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন।

রাজা রুষ্ট হইয়া কহিলেন, পারিবে না! জান, হাসিবার জন্যই তোমাকে বেতন দেওয়া হয়?

মূর্খ কহিল, জানি। কিন্তু জানিলে কি হইবে মহারাজ, আমি মূর্খ মূর্খ বলিয়াই জাতির গৌরব জাতির সম্মানের উপরে ললিতকলাকে বড় করিয়া দেখিতে শিখি নাই। জয়ের পরিহাস আমার কাছে পরিহাস বলিয়াই বোধ হয়, ইহাকে জয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

রাজা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, এ কথার অর্থ?

মূর্খ কহিল, আপনাকে কি বুঝাইব মহারাজ, আমি নিজেই ভাল বুঝিতেছি না। আধুনিক গৌড় কলাচর্চা বুঝে, আনন্দ বুঝে। আমার কথার অর্থ গৌড়বাসী আর বুঝিবে না। যাহারা বুঝিত তাহারা বহুদিন মরিয়া গিয়াছে।

রাজা কহিলেন, তুমি চুপ কর।

মূর্খ কহিল, আজ আমি চুপ করিব না। কেন আর চুপ করিব, কাহার জন্ত চুপ করিব?

রাজা গর্জন করিয়া কহিলেন, প্রলাপ বন্ধ কর। এখনও বলিতেছি, হাস। জান, এই আদেশ অমান্ত করিবার দণ্ড নির্বাসন?

মূর্খের মুখে করুণ হাস্তরেখা ফুটিয়া উঠিল। কহিল, কিছু প্রয়োজন হইবে না, আমি আপনিই যাইতেছি। গৌড়ের কল্যাণ হউক মহারাজ, গৌড়বাসীর কলাচর্চা অব্যাহত থাকুক। আমি চলিলাম।

বলিতে বলিতে মূর্খ সহসা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। হা-হা-হা-হা-হা-হা—অর্থহীন সেই উন্মত্ত হাসি তাহার কণ্ঠ চিরিয়া বক্ষ চিরিয়া বাহির হইয়া সভামণ্ডপের পাষাণ-প্রাচীরে মাথা খুঁড়িয়া ফিরিতে লাগিল। তারপর তেমনি করিয়া হাসিতে হাসিতেই সে সভা হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। দ্বারের প্রহরীরা শুধু বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রুর ধারা ঝরিতেছে।

গৌড়ে আর মূর্খ জন্মায় নাই।